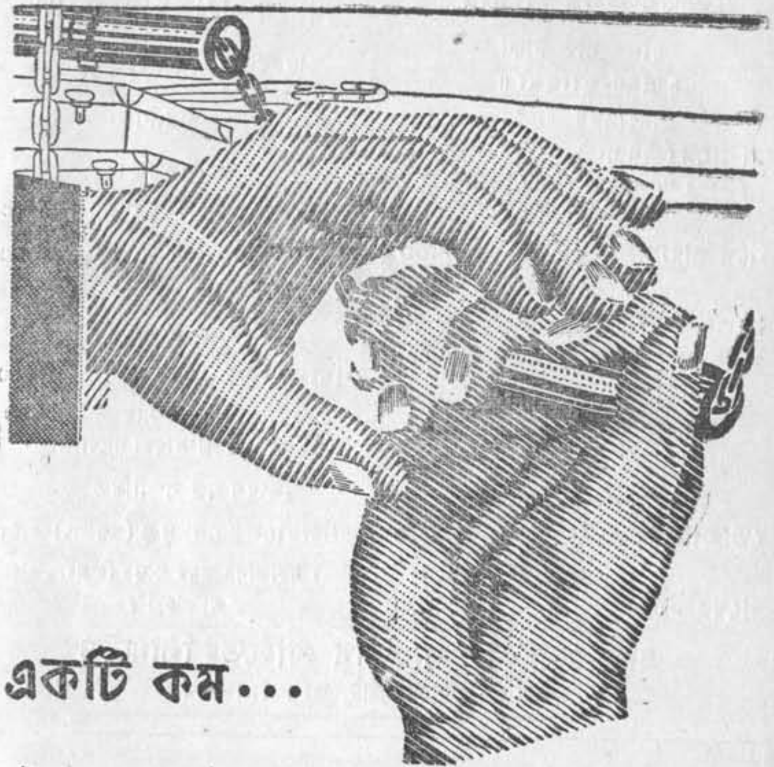


পরিচয়



শ্রাবণ • ১৩৭০

বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা



মানিক-গ্রন্থাবলী

ডঃ রথীন্দ্র রায় বলেন—'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীমানস অনুধাবন করলে চোখে পড়বে একটি বীক্ষণাগার—একজন প্রতিভাবান অস্থিরচিত্ত বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগার—সন্ধানী দৃষ্টির বিশ্লেষণ যন্ত্রণা-জর্জর জীবনের উত্তাপে দৃঢ়সংহত ও কেন্দ্রমুখী। ভ্যানগগের মতো হয়তো তিনি বলতে পারতেন : 'Life is not fulfilment but quest.'

মানিক-সাহিত্য বর্তমান জটিল যন্ত্রণার যুগের মহা দলিল। মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও অশেষ দরদে যে চরিত্রগুলি ফুটল আজকের সমস্যা-জর্জরিত সমাজে তাদের দেখতে পাওয়া যায় সর্বত্র। এই যুগ-সাহিত্যিকের গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছে। এতে আছে—

পদ্মানদীর মাঝি, দিবারাত্রির কাব্য, জীবনের জটিলতা—এই তিনখানি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস ও অতসী মামী প্রভৃতি দশটি বিশিষ্ট গল্প। তৎসহ আছে ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়ের মানিক-প্রতিভা সম্বন্ধে বিশেষ বিশ্লেষণ ও সুসাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীঅশোক গুহের তথ্যবহুল গ্রন্থ-সমালোচন ॥

মূল্য—১০·৫০

সদ্য প্রকাশিত আমাদের দু'খানি উপন্যাস

একাডেমী পুরস্কৃত গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

রাত্রির সীমানা ॥ মূল্য ৫৲

সুলেখিকা বাণী রায়ের রচনা-শৈলীর আরেকটি নিদর্শন

তনিমা জাতক ॥ মূল্য ৩·৫০

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকের তালিকার জন্য লিখুন।

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

১১এ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ সুপ্রকাশের সুগ্রন্থ ॥

অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ সরকার
ইংরেজী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ও মূল্যায়ন ৯·০০

ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়
দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১৩·৫০

অধ্যাপক সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
গল্পশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ৫·০০

অধ্যক্ষ শুদ্ধসত্ত্ব বসু
অলংকার জিজ্ঞাসা ৫·০০

অধ্যক্ষ শুদ্ধসত্ত্ব বসু
বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১·৭৫

॥ কথা সিরিজ ॥

ডক্টর গুরুদাস ভট্টাচার্য
সাহিত্যের কথা ৫·০০

অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ সরকার
কবিতার কথা ৫·০০

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ
নাটকের কথা ৫·০০

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য
উপন্যাসের কথা ৬·০০

ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়
ছোটগল্পের কথা ৫·০০

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সমালোচনার কথা ৬·০০

ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য
শিল্পতত্ত্বের কথা ৬·০০

॥ কবিতা ॥

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
রাত্রি ও আলো ১·০০

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
একটি নির্জন তারা ২·০০

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড

৯ রায়বাগান স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৬

রমেশচন্দ্র দত্ত

অনূদিত

ঋগ্বেদ-সংহিতা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : "ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথমে ইংরেজী প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয়, তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায় অনুবাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন।···কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে ইউরোপ উপধর্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশবাবুর এই অনুবাদে এদেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী ইঁহার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিবে না।"

F. MAX MUELLER : "Let me first tell you how delighted I was to see your translation of the Rig Veda . . . . I know enough of Bengali to make out your translation, and I hope to use it when i go on with my translation of Vedic Hymns."

এই যুগান্তকারী কার্যে রমেশচন্দ্রের সহায়ক ছিলেন : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রভৃতি।

একখণ্ডে রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা পুনঃপ্রকাশিত হল। বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য :—

১ ॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত ঋগ্বেদ-প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা।

২ ॥ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত বঙ্গসাহিত্যে রমেশচন্দ্রের স্থান প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা।

৩ ॥ যামিনী রায় অঙ্কিত ছয় বর্ণের প্রচ্ছদ।

৪ ॥ প্রবোধরাম চক্রবর্তী রচিত রমেশচন্দ্রের রচনাবলীর পূর্ণ বিবরণ।

৫। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রচিত বৈদিক সাহিত্যের সহজপাঠ্য পরিচিতি।

৬ ॥ চার বর্ণে মুদ্রিত বৈদিক ভারতের মানচিত্র। ইত্যাদি ॥

বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা করেছেন

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী

মূল্য : চল্লিশ টাকা (৪০.০০)

জ্ঞানভারতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৫৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা ১৪

পরিচয় **বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা**

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ১
শ্রাবণ, ১৩৭০

সূচীপত্র



সূচীপত্র

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।





নন্দলাল ব

…নর মেছো

…ন্দলাল বর্হ' থেকে

ভবানী সেন

মার্কসের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি

মার্কসের ১৮৪৪ সালের অর্থনীতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপিটি এতকাল ইংরেজি ভাষায় অপ্রকাশিত ছিল। কিছুকাল আগে তা প্রকাশিত হয়ে মার্কসবাদী দর্শনের মূল দৃষ্টিকোণের একটি স্বচ্ছ পরিচয় পাঠক সমাজের নিকট উপস্থিত করেছে। অনেকের ধারণা প্রথম জীবনের এই প্রাথমিক সৃষ্টির মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব আছে মনে করেই মার্কস কিংবা এঙ্গেলস এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করার কথা ভাবেন নি। আবার কোনো কোনো পাঠক মনে করেন তরুণ মার্কস যে প্রবীণ মার্কসের চেয়ে অনেক বিষয়ে বেশি পরিণত ছিলেন তারই পরিচয় এই গ্রন্থখানি বহন করছে। কিন্তু এ সবই নিছক জল্পনা-কল্পনা। অতি-কল্পনা ছেড়ে দিয়ে আসুন আমরা পুস্তকের বিষয়বস্তুর মধ্যেই প্রবেশ করি।

আলোচ্য গ্রন্থে দেখা যায় যে বহুস্থানে মার্কসের লেখা অসম্পূর্ণ। এরূপ অসম্পূর্ণতা "ক্যাপিটাল", তৃতীয় খণ্ডেরও স্থানে স্থানে আছে এবং তা পূরণ করেছেন এঙ্গেলস। কিন্তু মার্কস যা ব্যক্ত করেছেন তা এত সমৃদ্ধিশালী যে অব্যক্ত অংশ তাঁকে বুঝবার পথে কোনো অনতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করে না। অবশ্য, মার্কসের কোনো বিশেষ সময়ের বিশেষ লেখার অর্থ বুঝতে হলে তাঁর সমগ্র লেখার মধ্যে প্রকট সমগ্র চিন্তার কথা মনে রেখে বুঝতে হবে, আলোচ্য গ্রন্থখানিও তার ব্যতিক্রম নয়।

মার্কস এই পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করেছিলেন ১৮৪৪ সালে—অর্থাৎ, প্রথম যখন তিনি হেগেলীয় দর্শনের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে হেগেলকে পায়ের

Economic and Philosophic Manuscripts of 1844: K. Marx, Foreign Language Publishing House, Moscow.

উপর দাঁড় করিয়ে মার্কসবাদী দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কাঠামো তৈরী করতে আরম্ভ করেন। বলা যেতে পারে যে এই লেখাটি সমগ্র মার্কসবাদী দর্শনের একটি ভূমিকা। আলোচ্য পুস্তকে মার্কস তাঁর দার্শনিক বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে বসেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল দর্শনকে বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করা।

আলোচ্য গ্রন্থের শেষ দিকে তিনি হেগেলীয় দর্শনের যে সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু তার মধ্যেই তিনি ভাববাদের মূল দৃষ্টিকোণের আত্মবিরোধ প্রস্ফুটিত করেছেন। হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই তাঁদের পক্ষে এই অংশটি বোঝা কঠিন কিন্তু তবু এটা বুঝতে পারবেন যে 'আইডিয়াকে' সত্তার আদি রূপে কল্পনা করে হেগেল এমন এক স্ববিরোধিতার গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছেন যেখানে ভাববাদ চিরসমাধি লাভ করেছে। ভাববাদী চিন্তাধারার মধ্যে হেগেলের প্রণালীই সবচেয়ে সুগঠিত, সুতরাং তার মধ্যেই ভাববাদের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়েছে, বস্তুবাদকেও দিয়েছে বৈজ্ঞানিক ভূমিকা।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদকে মার্কস বস্তুবাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত করে দেন। কিন্তু মার্কস মনে করেছিলেন যে শুধুমাত্র বিমূর্ত ভাবে দর্শনকে উপস্থিত করলে পাঠকবর্গ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। প্রকৃত সামাজিক সমস্যা ও ইতিহাসের প্রকৃত শিক্ষা অবলম্বন করে দার্শনিক তত্ত্বকে মূর্তরূপে উপস্থিত করাই ছিল মার্কসের পদ্ধতি। সম্ভবত সেই জন্যই তিনি আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে একটি সাধারণ ছক তৈরী করে অপ্রকাশিত অবস্থায় নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন নিজেরই বৈজ্ঞানিক গবেষণার নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। তারপর তিনি সারাজীবন ধরে ইতিহাসের এক একটি বিশিষ্ট অধ্যায় ধরে ধরে সাধারণ তত্ত্বকে রূপায়িত করে গেছেন। আলোচ্য পুস্তকে আমরা পাই তাঁর অন্যান্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে নিহিত তত্ত্বমালার একটি ঘনীভূত নির্যাস। এর মধ্যে আছে মার্কস এবং এঙ্গেলসের দার্শনিক চিন্তাধারার সারাংশ। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর সমগ্র বক্তব্য জানা না থাকলে এই সদ্যপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি বোঝা যাবে না।

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদী দর্শনের মূল নিয়ম হল দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সত্তার পরিবর্তন। এক সত্তা পরিবর্তনসূত্রে অন্য সত্তায় পরিণত হয়, কেননা সত্তার মধ্যে আছে দ্বন্দ্বের সংঘাত এবং সমাবেশ। স্ববিরোধী সত্তা দ্বন্দ্বসংঘাতের ভিতর দিয়ে নিজেকে হারিয়ে অন্য সত্তায় পরিণত হচ্ছে, আবার এই নতুন

সত্তারও হচ্ছে পরিবর্তন অর্থাৎ হারানোকেও সে হারিয়ে ফেলেছে। এ নিয়মটি বোঝাবার জন্য এঙ্গেলস 'সোশালিজম—ইউটোপিয়ান ও সায়ান্টিফিক'-নামক পুস্তকে একটি সহজ উদাহরণ দিয়েছিলেন। উদাহরণটি এই : বীজের ভেতর যখন অঙ্কুর গজায়, বীজ তখন নিজ সত্তা হারাতে আরম্ভ করে অঙ্কুরের ভেতর। বীজের আবরণ ভেঙে যে চারা বেরোয় তার মধ্যে বীজের ঘটেছে আত্মবিলোপ (alienation)। চারাও নিজেকে হারায় অহরহ, চারা হয় গাছ, গাছে ধরে ফল, ফলের মধ্যে জন্মে আবার বীজ। যে বীজ নিজেকে হারিয়েছিল চারার মধ্যে, সেই হারানোটা এতক্ষণে হারিয়ে গেল, পাওয়া গেল নতুন বীজ, ঠিক আগেকার বীজটি নয়, নতুন বীজ, বহুতর সংখ্যায়। এমনিভাবে বহু পুনরাবর্তনের পর দেখা যায় আদি বীজের পরিবর্তন ঘটেছে পরিণত বীজের মধ্যে। এমনি ভাবেই এক উদ্ভিদ আর এক উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে। এই নিয়ম চলছে জীবজগৎসহ সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে।

অর্থাৎ, পরিবর্তন মানেই হল একের অবলুপ্তি অন্যের ভিতর, কিন্তু তারপরই আবার এই অবলুপ্তিরও ঘটেছে অবলুপ্তি। এমনিভাবেই নিত্য নতুনের আবির্ভাব ঘটছে। পুরাতনের গর্ভেই নতুনের জন্ম, আজ যা নতুন কাল আবার তাই পুরাতন, সেই পুরাতনের গর্ভে আবার জন্মাচ্ছে নতুন। অর্থাৎ স্থিতির ঘটছে নিরোধ, তারপর নিরোধেরও নিরোধ ঘটছে (negation of negation or alienation of alienation)।

হেগেলের দর্শন অনুসারে আইডিয়া থেকেই বস্তুর উদ্ভব, প্রথম নিরোধ (alienation) হল বস্তুর মধ্যে আইডিয়ার লয়। তারপর আবার আইডিয়ার মধ্যে ঘটছে বস্তুর লয়, এবার হচ্ছে নিরোধের নিরোধ (alienation of alienation)। অর্থাৎ, আইডিয়ার আত্মবলোপই বস্তুর বস্তুত্ব।

হেগেলের কাছে 'মানুষ' একটি আইডিয়া—যা কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয়, কোনো বিশেষ দেশের বা বিশেষ যুগের মানুষও নয়। বিশিষ্ট ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে নির্বিশিষ্ট 'মানুষের' নিরোধ ঘটেছে, অর্থাৎ মূর্ত মানুষের মধ্যে বিমূর্ত মানুষের সত্তা গেছে হারিয়ে। মার্কসের কাছে আদিম যুগের প্রাক্-মানবীয় জীব থেকে যে মানুষের উৎপত্তি ঘটেছে, সে হলো সত্যকার বিশিষ্ট মানুষ। তারই ক্রমবিবর্তনে বর্তমান যুগের বহু সংখ্যক ব্যক্তি-মানুষ দেখা দিয়েছে, সেই মানুষেরই চেতনার মধ্যে 'মানুষ' এই আইডিয়ার জন্ম। এই নির্বিশিষ্ট মানুষের কোনো স্বতন্ত্র বাস্তব সত্তা নেই, তার মধ্যে বিশিষ্ট মানুষের

স্বতন্ত্র সত্তা নিরুদ্ধ হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্কে 'মানুষ' সম্পর্কে আইডিয়া থেকে বাস্তবসমাজে প্রকৃত মানুষ নিজেকে বদলায়, বাস্তবের মধ্যে আইডিয়ার ঘটে নিরোধ, তার ফলে দেখা দেয় নতুন মানুষ। হেগেলের মতে মানুষের চেতনাই আসল মানুষ, চেতনার পরিহার ঘটলে থাকে শরীরী ব্যক্তি। মার্কসের মতে, শরীরী মানুষটাই আসল মানুষ, তার মূর্ত সত্তা পরিহৃত হয় 'মানুষ' এই বিমূর্ত ও নির্বিশিষ্ট আইডিয়ায়।

মানুষের মানবতা নিয়েই বিবিধ দার্শনিক সমস্যার সূত্রপাত। মার্কস তাই তাঁর এই প্রথম দার্শনিক ছকে মানবতার দার্শনিক সমস্যাকেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করেছেন। হেগেলের ভাববাদী নিরোধ তত্ত্বকে তিনি বস্তুবাদী নিরোধতত্ত্ব দিয়ে খণ্ডন করেছেন বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে।

মানবতার সমস্যা হল মানুষের স্বাধীনতার সমস্যা। আদিম যুগের প্রথম মানুষ তার অভাবের দাস, জীবনধারণের জন্য সে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার নিজ সত্তাকে হারাল প্রকৃতির কাছে, প্রকৃতির উপর আরোপ করল নিজ সত্তার নিয়ন্তা। জীবনধারণের সম্পদটাই হয়ে দাঁড়াল প্রকৃত জীবন। মানুষ তখন প্রকৃতির নিয়ন্তা নয় প্রকৃতিই তখন মানুষের নিয়ন্তা। সুতরাং মানুষের মানবতার নিরোধ ঘটছে প্রকৃতির মধ্যে।

অথচ মানুষ প্রকৃতিরই একটি অংশ। আদিমতম মানুষ নিজ সত্তাকে হারিয়েছে নিজ বহির্ভূত প্রকৃতির মধ্যে। এইখানেই ঘটেছে মানুষের নিজ সত্তার নিরোধ (alienation)।

মার্কসের বক্তব্য বুঝবার জন্য এই সূত্রে কমিউনিজম-এর তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ের তুলনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায় আদিম যুগের ট্রাইবাল কমিউনিজম বা বর্বরতা। এই সমাজে শ্রম সমষ্টিগত এবং আহৃত সম্পদ যৌথ। এই সমষ্টিগত জীবনে ব্যক্তির কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই, সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত। কারণ, যে প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে মানুষের নিজ সত্তা নিরুদ্ধ (alienated), তা এখন যৌথ সম্পদ, তাই যূথের মধ্যে ব্যক্তি-সত্তা বিলীন হয়ে রয়েছে। মানুষের নিজ সত্তা শ্রম, শ্রমও মানুষের ব্যক্তি-সত্তা থেকে পরিহৃত হয়ে যৌথ সত্তার মধ্যে বিলীন।

কমিউনিজম-এর দ্বিতীয় পর্যায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠিত সমাজ।

এই সমাজে উৎপাদনের উপকরণসমূহ সামূহিক, কিন্তু ভোগ্য সম্পদ এবং শ্রম ব্যক্তির নিজস্ব। এই সমাজেও সম্পত্তির ভিতর মানুষের নিজ সত্তার নিরোধ সম্পূর্ণ ঘোচে নি। প্রথম যুগে যে-সম্পত্তির মধ্যে মানুষ তার নিজ সত্তাকে হারিয়েছিল, সেই সম্পত্তি এখন সমাজের; ব্যক্তির শ্রম সমাজকে দিতে হয়, সমাজের সামূহিক সম্পদ থেকে সে পায় তার শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত সম্পদ। ব্যক্তিসত্তা এখানেও সমাজ কর্তৃক সীমিত, কারণ এই সমাজেও অভাব আছে। অভাবের প্রতিকার সম্পদ, সম্পদের মালিক সমাজ, মানুষের নিজ ব্যক্তিসত্তা এখানেও সীমিত। অভাবের ভিতর দিয়েই মানুষের ব্যক্তিসত্তার নিরোধ ঘটেছে, অভাবের সম্পূর্ণ অবসানেই ব্যক্তিসত্তার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা।

কমিউনিজম-এর তৃতীয় পর্যায় হল উচ্চতম স্তরের কমিউনিস্ট সমাজ, প্রাচুর্যের উপর যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, মানুষ যেখানে প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করবে। এই সমাজে যার যেমন সাধ্য সে তেমন কাজ করবে, যার যেমন প্রয়োজন সে তেমন পাবে। এই সমাজেই দেখব যে মানুষের নিজ সত্তা সে নিজের মধ্যে ফিরে পেয়েছে, নিরোধের ঘটেছে নিরোধ। এঙ্গেলস এই যুগের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে এই অবস্থায় মানুষ বাধ্যবাধকতার রাজ্য ছেড়ে স্বাধীনতার রাজ্যে প্রবেশ করবে। আলোচ্য পুস্তকে মার্কস তাই ঘোষণা করলেন যে কমিউনিজম হল মানবতাবাদ; ব্যক্তিমানুষের সত্তার লয় নয়, তার প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য, কমিউনিজম সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার পন্থা।

আদিম ট্রাইবাল কমিউনিজম এবং সমাজতন্ত্র এই দুই যুগের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ বিভিন্ন যুগে বিভক্ত, কিন্তু তার সাধারণ চরিত্র হল এই যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে সম্পত্তিবিহীন শ্রেণীর অবস্থানের ওপর। দাসযুগের দাস, সামন্ত যুগের ভূমিদাস এবং ধনতান্ত্রিক যুগের সর্বহারা শ্রমিক নিজেকে অন্য মানুষের মধ্যে হারিয়েছে; যে মানুষ প্রথম নিজেকে হারিয়েছিল বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে, এখন অন্য মানুষ তার হারানো সত্তার অধিকারী। এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীর শ্রমশক্তির অপহরণই এই সমাজের মেরুদণ্ড।

আদিম সমাজে মানুষ ছিল প্রকৃতির দাস, ব্যক্তিগত সম্পত্তির যুগে মানুষ

মানুষের দাস। দাসত্বই মানুষের নিরুদ্ধ সত্তা (alienated self)। এক ব্যক্তির সত্তা তখন অন্য ব্যক্তির মধ্যে সাযুজ্য লাভ করেছে।

কমিউনিজমের দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ আমরা বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাকে বলি সমাজতান্ত্রিক সমাজ, সেই সমাজে মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্ব ঘুচেছে, প্রাক্তন সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামূহিক হয়েছে, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা তবু ঘটেনি। এই সমাজের যৌথসম্পত্তি হল প্রাক্তন সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরোধ অর্থাৎ শ্রমসম্পদ অপহরণকারীর ঘরে সঞ্চিত হৃতসম্পদের অপহরণ। একে অপহরণের অপহরণ বলা যেতে পারে। মানুষের পরিহৃত সত্তা (alienated self) এই অবস্থায় ফিরে আসতে আরম্ভ করেছে তার স্বস্থানে।

প্রাগ্‌ঐতিহাসিক মানুষ সম্পত্তির মধ্যে নিজেকে হারিয়েছিল ; এই সম্পত্তি প্রথম হল ব্যক্তির, পরে হলো সমাজের, কিন্তু সম্পত্তি তবু সম্পত্তিই রইল ; মানুষের পরিহৃত বা অপসৃত সত্তার বিগ্রহরূপেই সম্পত্তি বিরাজিত। সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে (কমিউনিজম এর দ্বিতীয় পর্যায়) ব্যক্তির মধ্যে সেই হারানো সত্তার পুনঃপ্রবেশ ঘটছে, নিরোধ এখন অপস্রিয়মান (transendence of alienation)। শেষ পর্যায়ের কমিউনিস্ট সমাজে নিরোধ হল নিরুদ্ধ (alienation is alienated), মানুষ ফিরে পেল তার নিজ সত্তা অথবা বলা যায় মানুষের ঘটল মুক্তি। ব্যক্তির জীবন এখানে প্রস্ফুটিত, মানবতার নিয়মেই মানুষ পরিচালিত ; ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতির, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের বিরোধের হল অবসান। এখন থেকে মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ !

প্রথম যখন মানুষ হল তখন মানুষ বলতে কোনো আইডিয়া ছিলনা। তারপর মানুষ বলতে একটা আইডিয়া হল কিন্তু আসল মানুষ সেই আইডিয়ার মধ্যে নেই। প্রকৃত মানুষের নিরোধ ঘটেছিল আইডিয়ার মানুষের মধ্যে, তখন আইডিয়ার মানুষ এল প্রকৃত মানুষের মধ্যে।

হেগেল ঠিক এই পদ্ধতিকেই উল্টো করে দেখিয়েছেন।

হেগেলের পদ্ধতি অনুসরণ করলে দাঁড়ায় এই যে প্রকৃত মানুষের আগে আছে আইডিয়ার মানুষ বা সুপারম্যান্। আসল মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে ও ধর্মের মধ্যে। সুপারম্যানের নিরুদ্ধ সত্তাই বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রের ও বিশেষ বিশেষ ধর্মের মানুষের বিশেষ বিশেষ

পরিচয় বহন করে। এই সমস্ত পৃথক পৃথক ব্যক্তিসত্তার অবলোপ ঘটবে আবার সেই সুপারম্যানের মধ্যে। এক কথায় শেষ পর্যন্ত ধর্মেই মানুষের মুক্তি। বিশিষ্ট ধর্ম নিরুদ্ধ হবে নির্বিশিষ্ট ধর্মে।

মার্কসের পদ্ধতি অনুসারে ধর্ম মানুষেরই নিরুদ্ধ সত্তা। ধর্ম নিরুদ্ধ হবে মানুষের মধ্যে মানবতার প্রতিষ্ঠায়। হেগেল ধর্মকে মানবতার নিরুদ্ধ সত্তা ঘোষণা করে ধর্মেই এসে পৌছচ্ছেন, মার্কস পৌছলেন মানবতায়।

এই সূত্রে মার্কস জনমানবের বা মনস্তত্ত্বের মর্ম উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন, যে-কোনো যুগের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার মূলে আছে মানুষের নিজ সত্তার নিরোধের বিশিষ্টতা। এ বিষয়ে সংক্ষেপে যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তার ভাবার্থ ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় এই :

একদা যে মানুষ প্রকৃতির দাস ছিল, প্রকৃতিই তার নিয়ন্তা। প্রকৃতির মধ্যে সে নিজেকে হারিয়েছে তাই সে নিজেকে চেনে না। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি তার সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের আকর। এই আত্মবিস্মৃত মানুষই ট্রাইবাল সমাজে প্রথাগত অনুশাসনকেই তার জীবনের নিয়ন্তা বলে মেনে নিয়েছে। সম্পত্তি ব্যক্তিগত হবার পর ব্যক্তিপূজার সূত্রপাত ; সেই ব্যক্তি যখন অলক্ষ্যে অর্থের মাধ্যমে শ্রমশক্তি অপহরণ করে, তখন অর্থের ভিতরই মানুষ সবকিছুর মূল্যায়ণ করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমাজে অপহরণ এবং প্রত্যাপহরণই জীবনধর্মের নিয়ন্তাস্বরূপ। কি দিলাম আর কি পেলাম, কি নিলাম আর কি নিতে পারি—এই মনস্তত্ত্বই মানুষকে তখন পেয়ে বসে। তখন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ শুধু দেনা-পাওনার।

আত্মবিস্মৃতি থেকেই ব্যক্তিপূজা ও দেনা-পাওনার সম্বন্ধ, আত্মনিরোধই মানুষকে নিজ থেকে, সুতরাং মানুষকে মানুষ থেকে তফাৎ করে ফেলে। সম্পত্তির ভিতরই মানুষ নিজেকে হারিয়েছে, তাই সম্পত্তির মনস্তত্ত্বই মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। তখন এক মানুষের কাছে অন্য মানুষের মূল্য খাদকের কাছে খাদ্যের মতো, শিকারীর কাছে শিকারের মতো।

প্রথম সমাজতান্ত্রিক সমাজ মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান ঘটায়, সম্পত্তিকে করে সামূহিক। কিন্তু মানুষের নিজ সত্তা তখনও সম্পত্তির মধ্যে নিরুদ্ধ। কি দেব আর কি পাব এই মনস্তত্ত্ব তখনও বলবৎ। অতীতে জীবনের যে মূল্যবোধ সৃষ্ট হয়েছিল তার মধ্যে যেমন ছিল সম্পত্তির মধ্যে ব্যক্তির বিলুপ্তি, তেমনি ছিল একব্যক্তির বিলুপ্তি অন্য ব্যক্তির মধ্যে।

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর দ্বিতীয়টা গেল কিন্তু প্রথমটা কিছু পরিমাণে রয়ে গেল। তাই তখনও মানুষের মনস্তত্ত্বের মধ্যে দেনা-পাওনার স্বভাব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত নয়। মানুষের মধ্যে মানবতার পূর্ণতা এই দেনা-পাওনা দ্বারা সীমিত।

সর্বোচ্চ কমিউনিস্ট সমাজের নতুন মনস্তত্ত্ব, নতুন মূল্যবোধ এবং নতুন সম্পর্ক এই সবকিছুর মূলে সম্পত্তির অবসান। উৎপাদনের প্রাচুর্য, প্রকৃতির ওপর মানুষের অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ: এরই মানে হল মানুষের মধ্যে মানবতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। মানুষ মানেই পূর্ণ মানুষ, আসল মানুষ, ব্যক্তি-মানুষ। সমাজ এখানে ব্যক্তির বহির্ভূত কোনো বহিঃশক্তি নয়। সমাজ এখানে সমস্ত ব্যক্তির স্বেচ্ছামিলনাত্মক স্বাভাবিক সত্তা। তাই এই সমাজে মানুষের মনস্তত্ত্বের ভিতর দেনা-পাওনার সংকীর্ণতা থাকতে পারেনা, থাকতে পারেনা ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে জনস্বার্থের বিরোধ। তাই অপহরণ এবং প্রত্যপহরণের যে মনোবৃত্তি শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবদান তার জড় তখন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। হেগেলের আইডিয়ার মানুষ তখন আর আইডিয়ার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বাস্তবজীবনে সমুজ্জ্বল।

সুতরাং হেগেলের আইডিয়ার মধ্যে মানবতার মুক্তি নেই, মানবতার মধ্যেই হেগেলের আইডিয়ার মুক্তি।

আলোচ্য পুস্তকে মার্কস দেখিয়েছেন যে মানুষের ভাবধারার মধ্যেই হেগেলের প্রথম-আইডিয়ার জন্ম। এই উপলক্ষে মার্কস কার্য-কারণ তত্ত্বেরও কিছুটা আলোচনা করেছেন। কার্য-কারণ তত্ত্বের দোহাই পেড়ে ভাববাদীরাও প্রশ্ন তোলেন—যদি সুপারম্যান্ বা সুপ্রীম্ আইডিয়া বলে কিছু নাই থাকে তবে এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণটি কি? প্রথম মানুষের সৃষ্টিকর্তা কে?

এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কস পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তোমার অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মানে কি? ব্রহ্মাণ্ডে বস্তুর গতি ও পরিণতি চলছে অহরহ: কার্য-কারণতত্ত্ব অনুসারে পূর্ব অবস্থা তার পরবর্তী অবস্থার কারণ। এই গতিধারা অনন্তকাল ধরে অনুসরণ করতে পার। কিন্তু যখনই জিজ্ঞাসা কর যে এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কারণ কি, তখনই বিশিষ্ট ও মূর্ত গতিশীল বস্তুজগতের সর্ববিধ মূর্ত সত্তাকে মনে মনে বর্জন করে তার একটা নির্বিশিষ্ট ও বিমূর্ত আইডিয়ার কারণ জানতে চাও, অর্থাৎ জানতে চাও যা নেই তার আদি কারণ। জিজ্ঞাসা করাটাই চিন্তার ক্ষেত্রে একটি স্ববিরোধ। বিজ্ঞান বলে

এক বিশিষ্ট সত্তা থেকে অন্য বিশিষ্ট সত্তার উদ্ভব, নির্দিষ্ট বিমূর্ত সত্তার উদ্ভব বিশিষ্ট মানুষের মনে, আইডিয়ারূপে।

মার্কস দার্শনিকভাবে এই প্রশ্নের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করেছেন হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনায়। যাঁরা মার্কসবাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর গবেষণায় নিযুক্ত, তাঁদের কাছে আলোচ্য পুস্তকটি অপরিহার্য। মার্কসবাদের সাধারণ পাঠকগণ কে কতটা বুঝতে পারবেন তা বলতে পারি না।

হেগেলের নিকট মানুষ মানেই মানুষের আত্মচেতনা। এই আত্মচেতনা নিরুদ্ধ হলেই দেখা দেয় বাস্তব মানুষের মূর্ত সত্তা। মানুষের এই বাস্তব সত্তা নিরুদ্ধ হলেই আবার ফিরে আসে আত্মচেতনা। সুতরাং হেগেলের মানুষ নির্বিশিষ্ট আত্মচেতনা, যে আত্মচেতনার কোনো আধার নেই, যা নিজেতেই নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ; অর্থাৎ, স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মচেতনা। মানুষ বলতে কি বোঝায়? রক্তমাংসের শরীরটি নয়, একটি চেতনা মাত্র। তবে শরীরটি কি? চেতনা যখন অন্তর্হিত (negated), তার ফল হল মানুষ বলতে একটি সশরীরী সত্তা। জ্ঞানের মধ্যে যখন এই সত্যের উপলব্ধি হবে তখন সশরীরী সত্তাটি অন্তর্হিত হয়ে গেল, রয়ে গেল একটি চেতনা—নিজের সম্বন্ধে নিজের জ্ঞান।

মানুষকে যদি এরকম ভাবে ধরা হয় তাহলে বাস্তব জগতকেই অস্বীকার করতে হয়। কারণ আমি যদি স্বীকার করি যে আমি ছাড়াও মানুষ আছে, তাহলে সেই অন্য মানুষের কাছে আমি হচ্ছি একটি বাস্তব সত্তা অর্থাৎ আমি ছাড়া আর কেউ যদি মানুষ থাকে তাহলে আত্মচেতনা সর্বস্ব আমিও একটি বাস্তব পদার্থ, আর একজনের "তুমি"। তা যদি হয় তাহলে হেগেলের দর্শনে আত্মচেতনা দ্বারা বাস্তব আমিকে সত্য সত্যই অন্তর্হিত করা গেল না, আমার চেতনায় বাস্তব আমি না থাকলেও অন্যের চেতনায় আমি একটি বস্তু,—যদি না মেনে নিই যে শুধু আমি ছাড়া বাস্তব জগতের আর কিছুরই কোনো অস্তিত্বই নেই, শুধু আমি আছি, আর কিছু নেই। অথচ আমার আমি যখন আত্মচেতনার নিরোধদ্বারা বাস্তব আমিতে পরিণত হচ্ছি তখন সেই আমি হচ্ছি প্রকৃতির একটি অংশ। অর্থাৎ আমি ছাড়া তখন আরও সত্তা আছে। আমার আমিকে যখন আমার বস্তুসত্তার নিরোধদ্বারা ফিরে পাই তখন আমার বহির্ভূত অন্য সত্তাগুলির কি হল? তারা যদি রইল তাহলে নিরোধের নিরোধ হল আংশিক সফল, অর্থাৎ আত্মচেতনায় আমার

আমিকে ফিরে পেলাম, আমার বস্তুসত্তা চলে গেল, কিন্তু বস্তুজগৎ তো রয়েই গেল। হেগেলের এই আত্মবিরোধ নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা দ্বারা মার্কস দেখিয়েছেন যে বস্তুকে আদি এবং সত্য বলে মেনে না নিলে হেগেলীয় নিরোধের নিরোধ (negation of negation) অর্থহীন হয়ে পড়ে। হেগেল এই তত্ত্বটিকে আবিষ্কার করে এক মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন কিন্তু ভাববাদী দর্শনের মধ্যে এ তত্ত্ব একেবারেই বন্ধ্যা।

মার্কসের মূল বক্তব্য এই যে হেগেলীয় দর্শনের নিরোধ এবং তার প্রতিনিরোধ (negation of negation) সৃষ্টির একটি মহানিয়ম, কিন্তু বস্তুকে আদি এবং সত্য বলে স্বীকার না করলে এ তত্ত্ব সফলভাবে প্রয়োগ করা যায় না। ভাববাদের সীমারেখার মধ্যে এ তত্ত্ব অচল। এই তত্ত্বই ভাববাদের অসারতা প্রতিপন্ন করে।

মার্কস এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যায়। আলোচ্য পুস্তকে এই উপলক্ষে কয়েকটি অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ আছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রম, মজুরী ও মূলধন সম্বন্ধে তাঁর প্রাথমিক বিশ্লেষণ এই পাণ্ডুলিপিতেই লিপিবদ্ধ হয়। শ্রমিক থেকে শ্রমশক্তির অন্তর্ধান এবং অপরের মালিকানায় তার পণ্যে রূপান্তর যে মূলধন তথা তার গতি ও প্রকৃতির প্রাথমিক ভিত্তি—এই তত্ত্বই পরবর্তীকালে ক্যাপিটাল-এর ভেতর তিনি বিশদভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তারই প্রাথমিক আলোচনা পাওয়া যায়। বুর্জোআ সমাজে অর্থের ক্ষমতা নামক অধ্যায়টি খুবই মূল্যবান। এই অধ্যায়ে মার্কস অর্থের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর দার্শনিক তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন : রীতি, প্রবৃত্তি ও সম্পর্ক অর্থ-প্রধান সমাজে অর্থ-দ্বারাই নির্ধারিত হয়। আমার প্রয়োজনবোধও অর্থের ওপর নির্ভরশীল। যেমন—আমার যদি রেলগাড়ি চড়ে বেড়াবার মতো অর্থ না থাকে তাহা হলে আমার ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা নেই। কার কি দরকার তা বুঝতে তার কোনো আসল দরকারের হদিস নেই। টাকা যদি থাকে তো দরকার আছে, টাকা না থাকলে দরকার নেই। মার্কসের কথায়—"যে সাহসিকতা খরিদ করতে সক্ষম সে ভীরু হলেও সাহসী।" বুর্জোআ সমাজে অর্থ সমস্ত সত্তা, সমস্ত মূল্যবোধ, সমস্ত সম্পর্ক একেবারে উল্টেপাল্টে আর একরকম করে দেয়। অর্থের মধ্যে সমস্ত সত্তার সমস্ত মূল্য নিরুদ্ধ।

আলোচ্য গ্রন্থে মার্কসের লেখা ছাড়াও এঙ্গেলসের অর্থনীতি বিষয়ক সর্বপ্রথম

লেখাটি সন্নিবেশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধের নাম "অর্থনৈতিক সমালোচনার ছক" (Outlines of a Critique of Political Economy)। পাদটীকায় সম্পাদকমণ্ডলী লিখেছেন যে এই পুস্তকে এঙ্গেলস্ ভাববাদ থেকে বস্তুবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছেন কিন্তু তবু তিনি ধনতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন কতকটা নৈতিক মানদণ্ড দ্বারা। এই প্রবন্ধে সর্বজনীন্ নীতিবোধ অনুসারে ধনতন্ত্রের সমালোচনা কোনো কোনো অধ্যায়ে পাওয়া যায়। অবশ্য মার্কস ১৮৫৯ সালেও এই পুস্তকখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি মার্কসবাদের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে দুরূহ হবে কিন্তু মার্কসবাদের গবেষণার ক্ষেত্রে এটি একটি অপরিহার্য দলিল। প্রথম পাঠে মার্কসবাদ খুবই অস্পষ্ট মনে হবে, কিন্তু মার্কস এবং এঙ্গেলসের সমস্ত লেখা পড়ার পর আবার এই গ্রন্থখানি পাঠ করলে মার্কসবাদের মূলমর্ম অনুধাবন স্পষ্টতর হবে।

কিন্তু প্রাথমিক পাঠকবর্গের একেবারে হতাশ হতে হবে না। অন্তত দুটি অধ্যায় আছে যা সহজবোধ্য। একটি মার্কস কর্তৃক লিখিত ('ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও কমিউনিজম') ৯৮ পৃষ্ঠায় এবং অপরটি এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত ('অর্থনীতির সমালোচনা') ১৭৫ পৃষ্ঠায়।

'ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও কমিউনিজম'-এর অধ্যায়ে মার্কস ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে মানবতার সম্পর্ক নিরূপণ করে দেখিয়েছেন যে :

"ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে যে ব্যক্তিনিষ্ঠ সত্তাটি আছে তা হল শ্রম। শ্রম ছাড়া সম্পদ হয় না, সম্পত্তি সম্পদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু সম্পত্তি যখনি ব্যক্তিগত হল তখনই তার ভিতর থেকে তার শ্রমসত্তা অন্তর্হিত হয়ে গেল, কেন না শ্রম যার, সম্পত্তি তার নয়। শ্রমের এই আত্মপরিহার থেকে সম্পত্তি পরিণত হয় মূলধনে। মূলধন শ্রমেরই সৃষ্টি কিন্তু শ্রম-রহিত এবং শ্রমের বিপরীত শক্তি হিসেবেই মূলধনের আত্মপ্রকাশ। সমাজ যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটাবে তখনই শ্রম ও মূলধনের বৈপরীত্য দূর হবে, মানুষ ফিরে আসবে তার নিজ সত্তায়।'

এই অবস্থায় ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের কোনো বিরোধ থাকে না। ব্যক্তি তৈরি করছে সমাজ, সমাজ তৈরি করছে ব্যক্তিকে—ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এখানে সমাজের সামাজিক অস্তিত্বের বিরোধী নয়।

মার্কস আরও বলেন: প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল মানুষ, কিন্তু মানুষের বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল প্রকৃতি। মানুষের সম্ভোগের জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কিন্তু মানুষকে বিজ্ঞান নিয়ে বিচার করতে হয় প্রকৃতিকে। এই মানুষ যখন স্বপ্রতিষ্ঠিত, নিজেতে নিজে ফিরে এসেছে—তখন সমস্ত মানুষ আর সমগ্র প্রকৃতি মিলে একটি সামূহিক সত্তা মানুষের চেতনায় ধরা পড়ে।

এই আলোচনার মধ্যে মার্কসের একত্ববাদ (monism) প্রকট হয়ে উঠেছে।

শেষ অধ্যায়ে এঙ্গেলস্ অর্থনীতি সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা ক্যাপিটাল-এর পাঠকবর্গের নিকট খুবই সহজবোধ্য। এই অধ্যায়ে সর্বপ্রথম তিনি ফিজিওক্রাট্ থেকে আরম্ভ করে ক্লাসিকাল স্কুল পর্যন্ত সমস্ত অর্থনীতির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন। মূলধন, মুনাফা, খাজনা ও সুদ বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ধরিয়ে দিয়ে মার্কসবাদী অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক সারমর্ম উদ্ঘাটিত করেছেন। ম্যালথুসের তত্ত্বকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির কোনো সীমা নেই—তা সে কৃষিতেই হোক আর শিল্পেই হোক। কাজেই জনসংখ্যাটা সমস্যা নয়, সমস্যা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ। ধনতান্ত্রিক যুগের "স্বাধীন প্রতিযোগিতাকে" ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির স্বর্গ থেকে টেনে নামিয়ে এঙ্গেলস তার অন্তর্নিহিত সম্পত্তির একচেটিয়া চরিত্রের নির্যাসটি তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে 'অর্থনীতিক সমালোচনার ভূমিকা' নামক গ্রন্থে তিনি এই বিষয়টিই সবিস্তারে বিবৃত করেন। এই গ্রন্থেরই মুখবন্ধে মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সারমর্ম ব্যাখ্যা করে যে তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তাকে বলা যেতে পারে মার্কসবাদের ঘনীভূত নির্যাস। তাতে তিনি ঘোষণা করেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কের যে বিরোধ তাই পরিণত অবস্থায় সমাজবিপ্লব সৃষ্টি করবে, তখন হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ।

অর্থাৎ মানুষের আত্মনিরোধের অবসান ঘটবে, মানবতা হবে নিজ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত।

অশোক রুদ্র

তরুণ মার্কস

ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার প্রচার ও ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখার সমর্থনে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি বোধহয় এই যে ইংরেজি ভাষাই আমাদের সেই জানালা যা দিয়ে বহির্জগৎ আমাদের গোচরে আসে কিন্তু এই জানালায় যে বহির্জগতের সবটা উন্মুক্ত নয় তা আমরা সর্বদা খেয়ালে রাখি না। ইংরেজি সাহিত্যের চশমার মারফৎ পশ্চিম দুনিয়াটা দেখতে হয় বলে আমাদের চোখ যে কতদূর একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে তা সব সময়ে বোধে আসে না, কারণ চশমা পাল্টে অন্য চশমা পরার উপায় তো নেই। কিন্তু এক এক সময় অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ইংরেজির উপর নির্ভরতার দরুণ আমাদের অবস্থা কতটা দীন তা ধরা পড়ে যায়। দেশে বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি জানা লোকের শ্রেণী আছে বলেই বোধহয় আমাদের সাহিত্যে অনুবাদের স্থান এত নগণ্য। ইংরেজিভাষীদের রুচি নেই বা তাদের কাছে মূল্যহীন কিন্তু আমাদের কাছে আকর্ষণীয় বা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত এমন অনেক সাংস্কৃতিক ও তাত্ত্বিক ঘটনা ঘটে যায় যার কোনো খবরও আমরা পাইনা, পেলেও অনেক বিলম্বে পাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক মাত্রই যদি ইংরেজি না জানত, কিছু ইংরেজি-জর্মন-ফরাসী-রুশ প্রভৃতি ভাষাবিদ অনুবাদকেরা যদি চোখ-কান খোলা রাখতেন কোথায় কি হচ্ছে তার দিকে, তাহলে হয়তো আমাদের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে অনুবাদ হত এবং বিশ্বমনীষার সঙ্গে আমাদের যোগটা অনেক বেশি সরস ও সতেজ হত।

ইংরেজির উপর নির্ভরশীলতার জন্য আমাদের ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ হতে পারে তার একটা প্রমাণ পেয়েছিলাম ১৯৫৬ সালে ফ্রান্সে গিয়ে। দেখলাম ফ্রান্স জর্মনি স্যুইট্সারল্যাণ্ডে, বস্তুত গোটা ইউরোপীয় ভূখণ্ডে একমাত্র নাট্যাধিপতির স্থান নিয়েছেন বেরটোল্ট ব্রেখট্। অথচ কি লজ্জার বিষয়,

---

Le June Marx : Recherche Internationale a la Lumiere du Marxisme. No. 19, 1960.

আমি তাঁর নাম পর্যন্ত শুনিনি। শুধু আমি নয়, বাংলাদেশের খুব কম লোকই যে তখন পর্যন্ত ব্রেখটের নাম শুনেছিলেন তা বললে বোধহয় ভুল করব না। কারণ খুঁজতে বেশিদূর যেতে হয়না। তখন পর্যন্ত ব্রেখট-এর কোনো বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়নি। পত্রপত্রিকায় এক আধটা লেখার অনুবাদ এদিক-ওদিক বেরিয়েছে মাত্র। লণ্ডনের থিয়েটারে ব্রেখটের কোনো অভিনয় তখনো পর্যন্ত ইংরেজ কোনো পেশাদারী দল থেকে হয়নি। একবার শুনেছি Berliner Ensemble লণ্ডনে ঘুরে গেছিল, কিন্তু ইংরেজ দর্শকদের মনে সাড়া জাগাতে পারেনি। তারপর অবস্থা ধীরে ধীরে বদলেছে। ব্রেখটের সব নাটক এখনও ইংরেজিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বেশ গোটা কয়েক পাওয়া যায়। গত বছরের শীতে লণ্ডনে ব্রেখটের Mahogonny মঞ্চস্থ হল, সমালোচক ও দর্শক মহলে হৈ চৈ পড়ে গেল। মুকুরে প্রতিবিম্ববৎ বাংলাদেশেও পরিবর্তন এসেছে। এখন ব্রেখটের উল্লেখ চতুর্দিকেই পাওয়া যায় বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে। কিন্তু ইংরেজদের চেয়ে ব্রেখটের প্রয়োজন অনেক বেশি আমাদের। অনেক আগেই তাঁর প্রভাব আসার প্রয়োজন ছিল।

এতো গেল একটা উদাহরণ। কিন্তু ইংরেজি ভাষার উপর নির্ভরতার দরুণ খুব বেশি রকম যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা আমাদের দেশে মার্কসবাদের চর্চা। ইংরেজের দেশে মার্কসবাদের প্রভাব কম, চর্চাও কম। কিন্তু আমাদের দেশে চর্চার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী রকমের। সে তুলনায় চর্চা হয় খুব কম। তার জন্য আমাদের সামাজিক পরিবেশ অবশ্যই দায়ী, কিন্তু সমস্যাটাকে কম জটিল করে তোলেনি ইংরেজি ভাষার উপর আমাদের অসহায় নির্ভরতা। মার্কসের সম্পূর্ণ রচনাবলীর সঙ্গে পর্যন্ত পরিচিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ আমাদের জোটেনি। এই কবছর আগে পর্যন্ত Capital-এর মাত্র প্রথম খণ্ডটি বাজারে মিলত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের কোনো ইংরেজি বা আমেরিকান সংস্করণ বাজারে ছিল না। সোভিয়েত সংস্করণ তো বের হল মাত্র এই সেদিন। Theories of Surplus Value বা Capital-এর চতুর্থ খণ্ডের তো সোভিয়েত সংস্করণও এখনও বের হয়নি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে ইংরেজি সংস্করণ (Lawrence and Wishart-এর ?) পাওয়া যেত তা সংক্ষেপিত, মূলের থেকে অনেক ভাগ ছোট। গত কয়েক বছরে অবশ্য সোভিয়েত Foreign Language Publishing House-এর দাক্ষিণ্যে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। নতুন নতুন অনেকগুলি বইয়ের নতুন সংস্করণ আমরা একের পর এক পেয়েছি কিন্তু

মার্কসের সম্পূর্ণ রচনাবলী এখনও তাঁরা প্রকাশ করে উঠতে পারেন নি। ফরাসী জর্মন বা রুশ ভাষার সঙ্গে যদি আমাদের সরাসরি যোগ থাকত তো এই দৈন্যদশা এড়াতে পারতাম, কারণ আশা করা যায় এসব ভাষায় মার্কসের সমগ্র গ্রন্থাবলী সর্বদাই বাজারে সুলভ থেকেছে। অন্তত ফরাসী ভাষায় যে থেকেছে তা নিশ্চয় জানি। হয়তো বলা হবে যে বাজারে না মিললেও গ্রন্থাগারের মারফৎ মার্কসের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ছিল—কারণ কিছু-না-কিছু সংস্করণ অতীতে কখনও-না-কখনও নিশ্চয়ই বেরিয়েছে। কিন্তু একথাও মার্কসের সব লেখা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। একথা প্রযোজ্য নয় মার্কসের দার্শনিক চিন্তার অন্যতম প্রধান আধার, তাঁর জীবৎকালে অপ্রকাশিত ১৮৪৪ সনের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে। একথা বোধহয় আমাদের অনেকের কাছেই অজানা ছিল যে ১৯৩২ সালে এই পাণ্ডুলিপির প্রথম প্রকাশের পর থেকে ইউরোপীয় মার্কসবাদী চিন্তাধারায় এক প্রবল আলোড়নের সূত্রপাত হয়েছে। ইংরেজি পাঠকের এই পাণ্ডুলিপির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছে মাত্র ১৯৫৯ সনে, মস্কোর Foreign Language Publishing House-এর সৌজন্যে। (তারপর, খুব সম্প্রতি, একটি নতুন ও স্বতন্ত্র অনুবাদ প্রকাশ করেছিল লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের T. B. Bottomore। এই অনুবাদের একটি মার্কিন সংস্করণও বার করেছেন Erich Fromm)। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের ঝড় আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ অপ্রশমিত রয়েছে তার দরুণ কোনো আন্দোলন আমাদের চিন্তায় বিক্ষোভ ঘটায়নি, কারণ ইংরেজি ভাষায় এই বিতর্ক খুব বেশি প্রকাশ পায়নি। ইংরেজিতে যেটুকু বা আভাস পেয়েছি তার অধিকাংশই এক দেশে, সরকারী কমিউনিস্ট পার্টির দার্শনিকদের মতামতটাই তাতে প্রাধান্য পেয়েছে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির বাইরের মার্কসবাদী ও অমার্কসবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর দার্শনিকেরা, যাঁরা এই বিতর্কের মূল প্রবক্তা, তাঁদের মতামতের পরিষ্কার ধারণা পাইনি। যেমন ধরুন গত সনে Marxism Today-তে মার্কসবাদ ও অস্তিত্ববাদের মধ্যে মিল-বেমিল নিয়ে পোল্যাণ্ডে যে প্রচণ্ড বিতর্ক চলেছে সে প্রসঙ্গে Adam Schaff তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন, কিন্তু Adam Schaff কমিউনিস্ট পার্টির প্রবক্তা দার্শনিক। তাঁর মতামত যত মূল্যবানই হোক তাঁর প্রতিপক্ষস্থানীয় দার্শনিকদের মতামতকে তাঁদের নিজস্ব জবানীতে না পাওয়ায় আমাদের তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা মেটেনা। অথচ বিতর্কটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তার আভাস পাই যখন দেখি কত বিভিন্ন

দৃষ্টিভঙ্গীর চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিক কত অপ্রত্যাশিত ও বিভিন্ন ভাষ্য দিচ্ছেন ঐ একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির উপর। ফ্রান্সের ক্যাথলিক দার্শনিকেরা (যাঁদের মধ্যে J. Y. Calvez এবং R. P. Bigo উল্লেখযোগ্য) যে নতুন করে মার্কসবাদের সহানুভূতিশীল সমালোচনায় রত হয়েছেন, সার্ত্র্ প্রমুখ অস্তিত্ববাদী অনেক দার্শনিক যে মার্কসবাদের সঙ্গে মোকাবিলায় প্রবৃত্ত হয়েছেন (সম্প্রতি সার্ত্রের গত একদশকের দর্শনচিন্তা "Critique de la Raison Dialectique" নামক বৃহৎ গ্রন্থে প্রকাশলাভ করেছে), আপাতত পার্টির বহির্ভূত লভ্যাভ্র (Lefebvre)-এর মত ফরাসী কমিউনিস্ট দার্শনিকের মত যে Garaudy প্রমুখ অন্যান্য কমিউনিস্ট দার্শনিকদের থেকে ভিন্নতা অর্জন করেছে, এসবেরই মূলে ঐ পাণ্ডুলিপিটির বিভিন্ন মর্মোদ্ধার ও সামগ্রিক মার্কসীয় চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মূল্যায়ণ। ফ্রান্সের বাইরের আলোচনার ধারা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, কিন্তু পরোক্ষ সূত্রে জানতে পারি পশ্চিম জর্মনীতে Their ১৮৪৪ সনের পাণ্ডুলিপির একটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশ করে এবং তার সঙ্গে তাঁর নিজ ভাষ্য সংযোগ করে আধ্যাত্মিক অস্তিত্ববাদী চিন্তার সঙ্গে মার্কসবাদের সেতুবন্ধনে প্রয়াসী হয়েছেন, পূর্ব জর্মনীর বিখ্যাত মার্কসবাদী দার্শনিক Ernst Bloch এই পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে যে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছেন তার জন্য তিনি অন্যান্য কমিউনিস্ট দার্শনিকদের বিরাগভাজন হয়েছেন এবং মার্কসবাদ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন বলে অভিযুক্ত হয়েছেন। পোল্যাণ্ডের দার্শনিক বিতর্কের কেন্দ্রেও এই পাণ্ডুলিপি এবং খুব সম্ভবত ভুল করব না যদি বলি লুকাচ-এর (Lukac) চিন্তাও মার্কসের এই তরুণ বয়সের চিন্তা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত, যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই মুহূর্তে কোনো বিতর্কের উপলক্ষ নন।

বিতর্কের পরোক্ষ এবং অনিবার্যভাবেই একদেশদর্শী আভাস পাই একটি ফরাসী প্রবন্ধ সংকলন থেকে। ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান ও শিক্ষাপ্রদ যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা হয় তাদের অন্যতম হল একটি দ্বিমাসিক প্রবন্ধ সংকলন : মার্কসবাদের ভিত্তিতে নানান তাত্ত্বিক গবেষণা ও আলোচনা নানান ভাষা থেকে অনুবাদ করে এক সঙ্গে এতে প্রকাশ করা হয়। উল্লিখিত সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে রুশ, জর্মন, ইতালীয় ও পোলিশ থেকে ভাষান্তরিত দশটি প্রবন্ধ। তাদের মধ্যে কয়েকটি বিতর্কমূলক, কয়েকটি নিছকই গবেষণামূলক। গবেষণার বিষয় হেগেল থেকে মার্কসবাদে

পৌছনর রাস্তা এবং তরুণ মার্কসের বিভিন্ন লেখায় এই পরিক্রমার চিহ্ন। বিতর্কমূলক প্রবন্ধগুলিই বেশি চিত্তাকর্ষক। তাদের একটিতে (Adam Schaff-এর "তরুণ মার্কসের প্রকৃত চেহারা") Kalakowski নামক পোলিশ দার্শনিককে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে কারণ তিনি নাকি দেখাতে চেয়েছেন মার্কসের epistemology-র মূল সূত্র তাঁর ১৮৪৪ সনের পাণ্ডুলিপিতে আবিষ্কার করা যায় এবং এই সূত্র অনুসারে মার্কসের ধারণা এঙ্গেলস্ ও লেনিন-এর ধারণা থেকে সামগ্রিকভাবে ভিন্ন। অপর একটি প্রবন্ধে একজন জর্মন সমালোচক (Hoeppner) অপর এক জর্মন দার্শনিকের (Fetscher) দোষ ধরেন কারণ দ্বিতীয়জন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন মার্কসের দ্বন্দ্ববাদ ও হেগেলের দ্বন্দ্ববাদে মূলত কোনো ভেদ নেই। একই প্রবন্ধে Ernst Bloch-কে সমালোচনা করা হয় এই বলে যে Bloch মনে করেন মার্কসের অন্তিম লক্ষ্য সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম ছিল না, ছিল মানুষের প্রকৃতি থেকে alienation এর অবসান, এমন এক অবস্থা যাকে মার্কস মানুষের ও প্রকৃতির পরস্পরের সঙ্গে একীভবন বলে বর্ণনা করেছেন। Jalm নামক জর্মন সমালোচক Ernst Bloch ও Thier এর সমালোচনা করতে গিয়ে গোটা alienation-এর তত্ত্বকেই নস্যাৎ করতে চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তব্য মার্কসের চিন্তায় এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে Surplus Value-র তত্ত্বের কাছে আসন ছেড়ে দেয়। অন্যান্য প্রবন্ধে alienation-কে নস্যাৎ করার চেষ্টা করা হয় না, "what Marx really meant" এই সুরে নানান ভাষ্য দেওয়া হয়। সোভিয়েত প্রবন্ধকার Brouchlinski-র প্রবন্ধটি থেকে জানতে পারি যে বিভিন্ন ভাষ্যকারদের মধ্যে মতভেদ হওয়ার মূলে পাঠগত কারণও একটা আছে। ১৮৪৪ সনের পাণ্ডুলিপির দুটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন একটি জর্মন প্রকাশনা সংস্থা, Landshut und Mayer ; কয়েকমাসের মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রকাশ করেন মস্কোর Marx-Engels institute. প্রবন্ধকারের মতে মস্কো সংস্করণই প্রামাণ্য, অপরটি নানাবিধ প্রমাদে পরিপূর্ণ।

নানান প্রবন্ধের নানান আলোচনা থেকে এই গত ত্রিশ বৎসরের বিতর্কের মূল বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণা পাওয়া যায় সরলীকরণ করলে তা দাঁড়ায় এই : একদল বলছেন এই পাণ্ডুলিপি মার্কসের চিন্তার এক নতুন দিগন্ত প্রকাশ করে ; অপর দল বলেন এতে নতুন কোনো কথাই নেই, মার্কসের চিন্তার

উন্মেষে এ এক সোপান মাত্র। অধিকতর পরিণত আকারে এই চিন্তার ছাপ পরবর্তী লেখাতেও আছে। প্রথম দলের মতে এই পাণ্ডুলিপির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলেই মার্কসের পরবর্তী জীবনের চিন্তাধারার সম্যক অর্থোদ্ধার করা যায়; দ্বিতীয় দল বলেন, পরবর্তী জীবনের লেখার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেই এই পাণ্ডুলিপির যথার্থ মর্মোদ্ধার সম্ভব। শাস্ত্রচর্চার দিক থেকে দেখলে অবশ্য উপরোক্ত উভয় মতই ভ্রান্ত। কারণ মার্কসের পরবর্তী কালের আর সব চিন্তার চাবিকাঠি তাঁর তরুণ বয়সের এই একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে আছে, তাঁর পরিণত বয়সের কোন ধারণা যদি এই পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশিত ধারণার সঙ্গে না মেলে তো ধরে নিতে হবে পরবর্তী কালের ধারণাটা মার্কসের চিন্তার প্রতিনিধি হিসেবে গ্রাহ্য নয়, এও যেমন অবৈজ্ঞানিক মনোভাব সূচিত করে, তেমনি এই পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হওয়ার আগে মার্কসবাদ সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তার মধ্যে অধিকতর গভীরতা বা প্রসার এই পাণ্ডুলিপি আনে না এই মতের মধ্যেও গোঁড়ামির গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু বিতর্কটা শুধুই শাস্ত্রীয় আলোচনার ব্যাকরণগত নয়। প্রথম দলের প্রবক্তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সরকারী কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে যুক্ত নয়, দ্বিতীয় দলের বেশির ভাগই তাই বটে, যদিও সবাই নন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রথম পক্ষে মত দিচ্ছেন যাঁরা তাঁরা প্রায়ই মার্কসের চিন্তায় শ্রেণীসংগ্রাম ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ যে স্থান অধিকার করে তাকে একটু কম করে দেখান, তাঁর চিন্তায় মানুষের অবস্থা ও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তারই ব্যাখ্যানে নিজেদের ব্যস্ত রাখেন। এই কারণেই তরুণ মার্কসের লেখাকে তাঁরা পরবর্তী যুগের মার্কসের লেখার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। অপরদিকে সরকারী কমিউনিস্ট প্রবক্তারা তরুণ মার্কসের লেখায় যে শ্রেণীযুদ্ধ ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ কম আছে তাতে স্পষ্টতই অস্বস্তি বোধ করেন এবং বারবারই বলার চেষ্টা করেন শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বই, শ্রমিক শ্রেণীর ধনিকশ্রেণী কর্তৃক অর্থনীতিক শোষণের তত্ত্বই মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব, alienation-এর তত্ত্ব নয়। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় এই দুই তত্ত্বের মধ্যে বাস্তবিকই কোন দ্বন্দ্ব নেই। শুধু alienation এর কথা বলে শ্রেণীসংগ্রামের কথা যদি চেপে যাওয়া হয় তো ধরে নেওয়া যেতে পারে যে প্রবক্তারা শ্রেণীসংগ্রাম বিনাই মানুষের alienation এর হাত থেকে মুক্তি খুঁজছেন অতএব তাঁরা মূলত মার্কসবাদ-বিরোধী। কিন্তু শুধু শ্রেণীসংগ্রামের উপর জোর দিয়ে alienation-এর তত্ত্বকে লঘু করে দেখাবার মনোবৃত্তিতেও কি সংশয়ের কোনো কারণ নেই? আমি দেখবার চেষ্টা করব যে আছে।

তার আগে কমিউনিস্ট প্রবক্তাদের যুক্তিধারার মধ্যে যে রক্ষণশীলতা রয়েছে এবং তার দরুণ কিছু চিন্তাগত দুর্বলতা, এমন কি মার্কসের বক্তব্যকে বিকৃত করার প্রবণতাকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তার কিছু নজির দেব। Hoeppner বলেন, মার্কসের তরুণ বয়সের লেখার থেকে পালিয়ে দূরে সরে যাওয়ার কোন কারণ মার্কসবাদের নেই। এ একটা স্বীকৃতি যে এরকম পলায়ণপর মনোভাব অনেক মার্কসবাদী দেখিয়েছেন। ১৯৩২ সাল থেকে এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে আলোচনা ও নতুন ধারণার প্রচারে যে অপরপক্ষই অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে তাও অনেক প্রবন্ধকার স্বীকার করেছেন। সংকলনটির ভূমিকাতেও সম্পাদকীয় বক্তব্যে বলা হয়েছে "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর পূর্ববর্তী মার্কসের রচনাবলী (যদিও তা আগেও ফরাসী পাঠকদের কাছে সাধারণত ভুলপ্রমাদ-যুক্ত অনুবাদে সুলভ ছিল) অসাধারণ প্রচারলাভ করছে এবং নানাবিধ আতিশয্যের উপলক্ষ হচ্ছে। মনে হয় ঘটনাটা এই যে নিজেদের মার্কস-তাত্ত্বিক (Marxologue) মনে করেন এমন ব্যক্তিরা মার্কসবাদীদের দ্বারা উপেক্ষিত রচনাবলীর পুনর্বাসনের উদ্যমে রত হয়েছেন। একথা অনস্বীকার্য যে মার্কসের প্রথম যুগের কাজের সম্পর্কে ফরাসী মনোভাব কিছুকাল উপেক্ষার মত দেখিয়েছে। মনে হয় অজানা এক ক্ষেত্র সম্পর্কে এক অবিশ্বাসের reflex-এ তাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন…।" আরও একটা কারণ বোধহয় ছিল। যতদিনে পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হয় ততদিনে কমিউনিস্ট দুনিয়ায় ঘোরতর রকমে গুরুবাদের যুগ শুরু হয়ে গেছে। লেনিন ও পরে স্তালিনের ভাষ্য ছাড়া মার্কস পড়ার সাহসই বোধহয় কারও ছিল না। লেনিন এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপির অস্তিত্বই জানতেন না, স্তালিনও হয়তো এর উপর কোন টীকা কাটেননি। সুতরাং গুরুবাক্যের অভাবে এর দিকে চোখ বুজে থাকাই হয়তো অনেক প্রকৃষ্ট বিবেচনা করেছিলেন।

এখন আলোচনায় যোগ দেওয়া হলেও সমালোচকেরা জায়গায় জায়গায় প্রতিপক্ষদের যুক্তিতে এমন অহেতুক আপত্তি এমন কি আতঙ্ক প্রকাশ করেন যে আশ্চর্য হতে হয়। আগেই উল্লেখ করেছি, Hoeppner নামক একজন সমালোচক গোটা alienation-এর তত্ত্বকেই উড়িয়ে দিতে চান এই বলে যে পরবর্তী যুগের অধিকতর গভীরতা প্রাপ্ত Surplus Value-র তত্ত্বে এই তত্ত্ব

হারিয়ে যায়। কিন্তু alienation মানুষের অবস্থা বর্ণনা করে মাত্র ; শোষণ এবং Surplus Value-র তত্ত্ব এই অবস্থার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই ; এবং প্রথম বয়সে মার্কস মানুষের অবস্থার যে সংকট আবিষ্কার করেন পরবর্তী যুগে শ্রেণীসংগ্রাম ও শোষণের তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে তাঁর একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন বললে বোঝা যায়। সে ভাবে দেখলে alienation ও শোষণের তত্ত্বের মধ্যে কোনোই দ্বন্দ্ব চোখে পড়েনা, উভয় উভয়ের সম্পূরক প্রতীয়মান হয়। কিন্তু Hoeppner বলেন, "এইভাবে শ্রমের alienation-এর তত্ত্ব পরিশেষে Value ও Surplus Value-র অধিকতর উন্নত তত্ত্বের দ্বারা অতিক্রান্ত হয়।" Hoeppner লেখেন যেন alienation-এর তত্ত্বটা একটা অর্থনীতিক তত্ত্ব মাত্র! Hoeppner এবং আরও অনেকেই আপত্তি প্রকাশ করেন পাণ্ডুলিপির অন্যতম প্রথম প্রকাশক Landshut-এর এই উক্তিতে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রথম লাইনকে এভাবেও লেখা চলত, "অদ্যাবধি ইতিহাস মানুষের auto-alienation-এর ইতিহাস মাত্র"। কেন, আপত্তি কেন? সোভিয়েত প্রবন্ধকার Pajitnov আপত্তি করেন Landshut ও Mayer-এর অন্য এক উক্তিতে যার মর্ম মার্কসের মতে ইতিহাসের অন্তিম লক্ষ্য নিছক উৎপাদন ব্যবস্থার সমাজীকরণে এবং শোষক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদের মারফৎ শোষণের অবসানেই নয়, অন্তিম লক্ষ্য মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ও সঙ্গতিপূর্ণ আত্ম-উপলব্ধি। কিন্তু এতেই বা আপত্তি কেন? শোষণের অবসানের যে প্রয়োজন নেই তাতো বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্যই শোষণের অবসানের প্রয়োজন। তেমনি Ernst Bloch কে সমালোচনা করা হচ্ছে এই জন্য যে তাঁর মতে সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা ও কমিউনিস্ট ব্যবস্থা ইতিহাসের যুগ বিশেষ, তারও পরে আসবে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসানের যুগ। এতেই বা আপত্তির কি আছে?

বস্তুত প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই লক্ষ্য করা যায়, মার্কসের alienation-এর তত্ত্বকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ-তত্ত্বকে মার্কসের নাবালক বয়সের অপরিণত চিন্তার প্রকাশ বলে যাঁরা উড়িয়ে না দিয়েছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই alienation-কে শুধু মাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকের অবস্থার বর্ণনা বলে গ্রহণ করেছেন। শ্রমিকের শ্রমের ফল যেহেতু শ্রমিক পায় না ধনিক পায় সেহেতু উৎপন্ন দ্রব্য ও শ্রমিকের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়, এই হল এদের মতে alienation-এর সার। অবশ্যই এই অবস্থাটা alienation-

এর একটি অঙ্গবিশেষ। কিন্তু alienation-এর তত্ত্বে আর কিছু নেই বললে তা ইচ্ছাপূর্বক ভ্রান্তি সৃষ্টির অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। একথা একেবারেই সত্য নয় যে মার্কসের দর্শন শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, মার্কসের দর্শন একটি বিশ্ববীক্ষা, মানুষের সমগ্র অস্তিত্ব ঐতিহ্য ও ইতিহাস তাতে বিধৃত। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কলকব্জা, তার উত্থান ও পতনের অন্তরীণ নিয়মের বিশ্লেষণেই মার্কস তাঁর জীবনের অধিক সময় ব্যয় করেছিলেন সত্য কিন্তু তার একমাত্র কারণ কার্ল মার্কস ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমসাময়িক। alienation-এর তত্ত্ব অবশ্যই শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষক শোষিতের সম্পর্কের মধ্যে নিঃশেষিত নয়; উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির (capital) অস্তিত্ব alienation-এর অনেক দূর পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তা বললেও সব বলা হয় না। alienation-এর তত্ত্ব আরও অনেক গভীরের তত্ত্ব, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের (অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে সমাজের) তথা মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের সর্ববিধ দ্বন্দ্বের ধারণাই এই একটি বাক্যে বিধৃত। একে সংকীর্ণ করে শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে দেখালে মার্কসবাদী দর্শনের মাহাত্ম্য খর্ব করা হয়। আর শুধু মাহাত্ম্য খর্ব করাই না, তাতে মার্কসবাদীদের নিজেদের দৃষ্টিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অস্বচ্ছ করে রাখা হয়।

অথচ এই স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতির দোষ যে শুধু গোটা কয়েক প্রবন্ধকারের লেখাতেই পাওয়া যায় তা নয়, স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় যে মস্কো থেকে ইংরেজিতে যে Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 প্রকাশিত হয়েছে তার ভূমিকায় Institute of Marxism-Leninism-এর তরফ থেকে বলা হয়েছে, By "estrangement" or "alienation" Marx means the forced labour of the labourer for the capitalist, the appropriation by the capitalist of the product of a worker's labour and the seperation of the labourer from the means of production…" (পৃষ্ঠা ৮)

এই ব্যাখ্যার সঙ্গে পাঠক নিজেই বইটির ভিতরে মার্কসের নিজের আলোচনা তুলনা করে দেখুন। "Estranged Labour" শীর্ষক অধ্যায়টি (পৃষ্ঠা ৬৭-৮৩) এ-প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে পাঠ্য। গোটা অধ্যায়টি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় কিন্তু নিচের লাইন কটি দেখুন :

What, then, constitutes the alienation of labour ?

First, the fact that labour is external to the worker, i. e. it does not belong to his essential being ; that in his work, therefore, he does not affirm himself but denies himself, does not feel content but unhappy, does not develop freely his physical and mental energy but mortifies his body and ruins his mind. The worker, therefore, only feels himself outside his work and in his work feels outside himself. (পৃষ্ঠা ৭২) As a result, therefore, man (the worker) no longer feels himself to be freely active in any but his animal functions... What is animal becomes human and what is human animal. (পৃষ্ঠা ৭৩) We have considered the act of estranging practical human activity, labour, in two of its aspects. (1) The relation of the worker to *the product of labour* as an alien object exercising power over him. This relation is at the same time the relation to the sensuous external world, to the objects of nature as an alien world antagonistically opposed to him. (2) The relation of labour to the act of production within the process of labour....(পৃষ্ঠা ৭৩) In estranging from man (1) nature and (2) himself, his own active functions, his life activity, estranged labour estranges the species from man. (পৃষ্ঠা ৭৪)

উধৃতি কয়টি প্রত্যেকটিই শ্রমসংক্রান্ত কিন্তু কোথাও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখ নেই, তাছাড়া শ্রমিক, শ্রম, উৎপন্ন দ্রব্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়া এদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়েছে তার মধ্যে কি এমন কিছু আছে যা শুধুমাত্র ধনিক ব্যবস্থাতে প্রযোজ্য, তার আগেকার কোনো ব্যবস্থাতে প্রযোজ্য নয় ? শুধু তাই নয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও কি শ্রমিকের অবস্থা মোটামুটি এরকমই হতে পারে না ? এখানে বলে রাখি, উধৃতিগুলি ইচ্ছা করেই এমন জায়গা থেকে দিলাম যেখানে শ্রমেরই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু জীবনের অন্যান্য অংশেও যে alienation-এর ধারণা প্রযোজ্য তার সমর্থনেও অন্য অনেক উধৃতি দেওয়া যায়।

কেন এই ভীতি এই দার্শনিক ধারণাটা সম্বন্ধে ? কেন এই প্রবণতা তাকে খর্ব করার, তার গণ্ডী সীমাবদ্ধ করার ? alienation এমন একটি ধারণা যা দিয়ে ইতিহাসের যে কোনো যুগের, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের যে কোনো সমাজব্যবস্থার মানবিক সমস্যাবলীর বর্ণন ও বিশ্লেষণ সম্ভব। alienation-এর মূলে শুধুমাত্র সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, যদিও তা অন্যতম প্রধান উৎস বটে। অন্য একটি প্রধান উৎস হল শ্রমের বিভাজন (division of labour)। উৎপাদন শক্তিদের বিকাশের সঙ্গে শ্রমের বিভাজন উত্তরোত্তর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে ওঠে, শ্রমিক ও শ্রমের ফল যে উৎপন্ন দ্রব্য তার মধ্যে দূরত্বও বাড়তে থাকে। এই ভাবে যে alienation-এর সৃষ্টি তার অবসান সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটলেই হবে না। শুধু তাই না, শ্রমের বিভাজন আরও এক ভাবে মানুষকে alienated করে। মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ক্রমেই কোনো একটি বিশেষ বৃত্তিশীল খণ্ড মানুষে পরিণত হয়। এই সমস্যাটির সম্পর্কে মার্কস্ ও এঙ্গেল্স্ 'জর্মন ইডিয়োলজি'তে বলেছেন : "শ্রমের বিভাজনের সূচনা যেই হল, প্রত্যেকের উপর কোনো একটি বিশেষ ও একক শ্রমের এলাকা চাপান হল যার গণ্ডীর বাইরে সে যেতে পারে না : সে হয় শিকারোপজীবী নয় মৎস্যজীবী, মেষপালক নয় সমালোচক, এবং তাই তাকে থাকতে হয় যদি না সে জীবিকা হারাতে চায়।" এবং পরে "কমিউনিস্ট সমাজে যেখানে প্রত্যেকের জন্য একটি করে বিশেষ শ্রমের এলাকা নির্দিষ্ট করা থাকবে না, যেখানে যে কোনো ব্যক্তি যা ভাল লাগে সেই কাজেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে সামাজিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হবে যাতে করে আমার পক্ষে আজ এটা করা ও কাল অন্য কিছু করা সম্ভব হবে, সকাল বেলা শিকার করতে পারব, দুপুর বেলা মাছ ধরতে, সন্ধ্যেবেলা মেষ চড়াতে পারব এবং নৈশভোজনের পর সমালোচনার কলম ধরতে পারব, আপন খুশীমত, কদাপিও শিকারোপজীবী, মৎস্যজীবী, মেষপালক বা সমালোচকে পরিণত না হয়ে গিয়ে।" এই সম্ভাবনাকেও নিশ্চয়ই শুধুমাত্র সম্পত্তির সমাজীকরণের মারফৎ হাতের মুঠোয় পাওয়া যাবে না। alienation-এর অপর ভিত্তি অবশ্য ব্যক্তির রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এবং রাষ্ট্রের অবসানও নিশ্চয়ই শুধুমাত্র সম্পত্তির সমাজীকরণ মারফৎ আসে না।

সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানের গুরুত্ব লাঘব করা আমার

মোটেই উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু alienation-এর তত্ত্বকে সংকীর্ণ করে কেবলমাত্র শ্রেণী বিভাজিত সমাজে বা সংকীর্ণতর করে কেবলমাত্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রযোজ্য মনে করলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরও সমাজে যে সব সমস্যা থাকবে তাদের বিচারে কোনো সাহায্য মার্কসবাদী তত্ত্বে পাওয়া যাবে না। বিপ্লব করে বা আইন করে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটালেই মানুষের সর্ববিধ সমস্যার অবসান হয় না, আজকের সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতেও সব সমস্যার অবসান হয় নি। মার্কসবাদী তত্ত্বের সমর্থনে এই সমালোচনা আরও জোরালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে, এই নয় কি alienation-এর তত্ত্বকে কোণঠাসা করে রাখার পিছনে ভীতির কারণ? আমি কি কাল্পনিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করছি? তাই কি? কমিউনিজমে মানুষের মুক্তির অবস্থা বিষয়ে মার্কসের ধারণা সম্বন্ধে সোভিয়েত নেতারা যদি অবহিত থাকতেন, তো পারতেন কি তারা এই তাজ্জব ঘোষণা করে দিতে যে আর বিশ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েত দেশে কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা হবে? মার্কসের কমিউনিস্ট সমাজে কল্পনা করা হয়েছে কারখানার শ্রমিকরাও শ্রম করবে সেই ভালবাসা ও স্বতঃস্ফূর্তি নিয়ে যা শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিকে চিহ্নিত করে। আজকের সোভিয়েত সমাজে দেখছি তার উল্টো অবস্থা। শিল্পীকে চালিত করার চেষ্টা করছেন রাষ্ট্র ও পার্টির নেতারা। বলাই বাহুল্য রাষ্ট্র বা পার্টির এতো দাপট যে সমাজে তাতে মানুষের alienation এখনও ভালভাবেই বিদ্যমান, এবং সেই নিরিখে বিচার করলে কমিউনিজম এখনও সে সমাজ থেকে অনেক অনেক দূরে।

চিন্মোহন সেহানবীশ

জোটনিরপেক্ষতার পররাষ্ট্রনীতি

গত নভেম্বর মাসে চীনা আক্রমণের মুখে আমাদের প্রতিরোধ যখন সাময়িকভাবে কিছুটা বিপর্যস্ত তখন সে লাঞ্ছনাজাত বিক্ষোভের আবহাওয়ায় পররাষ্ট্রনীতির বিরোধীপক্ষ রব তুললেন যে আমাদের এই হালের জন্য নাকি দায়ী ঐ 'ক্লীব নীতি'। তাঁদের তরফ থেকে তাই প্রবল দাবি উঠল নীতি পরিবর্তনের। আবার এঁদের পরম শত্রু চীনা সরকারও তখন পঞ্চমুখ আমাদের 'কপট নীতির' নিন্দায়—নিরপেক্ষতার ঘোমটার আড়ালে নাকি আমাদের মন দেওয়া-নেওয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে মার্কিনদের সঙ্গে। আর চারদিকের এই সোরগোলে পড়ে দিশেহারা সাধারণ মানুষ—সচরাচর যাঁরা রাজনীতি নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না বরং নেহরুর উপরে বরাত দিয়েই যাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন এতাবৎ, তাঁরাও অনেকে ভাবতে লাগলেন—তবে কি সত্যই এমন মারাত্মক গলদ রয়ে গেছে আমাদের অভ্যস্ত পররাষ্ট্রচিন্তায়।

পিপ্‌লস পাবলিশিং হাউস কর্তৃক সম্প্রতি আলোচ্য বইটির প্রকাশ তাই বিশেষ করেই প্রাসঙ্গিক। এটি এক হাতের রচনা নয়। দিল্লীর এক আলোচনাসভায় পঠিত আটজন বিশেষজ্ঞের আটটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হয়েছে এর মধ্যে। সম্পাদনা করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রামাণিক গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত করুণাকরণ। জোটনিরপেক্ষতার (বাংলায় non-alignment-এর এই প্রতিশব্দটাই বহুল প্রচারিত হয়েছে সংবাদপত্রের কল্যাণে) 'মৌল উপাদান' প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যবান সাধারণ আলোচনাটিকেই ভূমিকা হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে বইটির গোড়ায়। তারপর আছে ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতির 'ইতিহাস, মতাদর্শ ও ভবিষ্যত' এবং ভারতবর্ষের 'জাতীয় স্বার্থের' সঙ্গে ঐ নীতির সঙ্গতি সম্পর্কে দু'টি প্রবন্ধ। স্বভাবতই জোট-নিরপেক্ষতার আলোচনা ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সিংহল, ইন্দোনেশিয়া,

Outside the Contest: Edited by K. P. Karunakaran. People's Publishing House, New Delhi. Rs. 15.

পশ্চিম এশিয়া, পাকিস্তান এবং ১৯৬১ সনে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত পঁচিশটি জোটনিরপেক্ষ দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলন সম্পর্কে পাঁচটি প্রবন্ধও স্থান পেয়েছে এর পরে। এই সাতটি প্রবন্ধই তথ্যসমৃদ্ধ ও সুলিখিত। পরিশিষ্টে যুক্ত হয়েছে বেলগ্রেড সম্মেলনে গৃহীত দু'টি অতি প্রয়োজনীয় দলিল। এ-ধরনের গ্রন্থে কিন্তু সর্বশেষে বিষয়-নির্দেশিকার সংযোজন অত্যাবশ্যক। আশা করা যায় পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি পূরণের ব্যবস্থা হবে।

তরুণ গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের রচনা হলেও সৌভাগ্যক্রমে সব মিলিয়ে বইটি সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বেশ সুখপাঠ্য। লেখার গুণে ও সম্ভবত সম্পাদকের পরিমিতিবোধের দরুণ তথ্য যথেষ্ট থাকলেও তথ্যভার তাঁদের বুকে চেপে বসে না পাষাণের মতো, অজস্র পাদটীকার কাঁটাও বেঁধে না পদে পদে।

Outside the Contest পড়তে পড়তে কয়েকটি কথা মনে আসে। কথার সূত্রপাত করা যেতে পারে গ্রন্থের নামকরণ থেকেই। এ কথা ঠিক যে কালের বিচারে জোটনিরপেক্ষতার অব্যবহিত পৃষ্ঠপট হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর হিমযুদ্ধ ও সেই হিমযুদ্ধজাত জোটবদ্ধতা। সে দিক থেকে হয়তো নামকরণ সার্থক। কিন্তু সংঘাতের বাইরে অবস্থানই কি আমরা যাকে সচরাচর জোটনিরপেক্ষতা বলে অভিহিত করি সেই নীতির প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য? শ্রীযুক্ত করুণাকরণ তাঁর ভূমিকার শেষ দিকে লিখেছেন:

"এশিয়ার দেশগুলি জোটনিরপেক্ষতার যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে তার শিকড়···প্রোথিত রয়েছে তাদের জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্যের গভীরে আর ঐ সব দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের নিরিখে তাদের পররাষ্ট্রনীতি ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতিচর্চার পারস্পারিকতার মধ্যে"। (২৫ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য এবং এ সব দেশের জরুরী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের নিরন্তর তাগিদ—আমরা যে নীতির কথা বলছি তার উন্মেষ এই ক্ষেত্র থেকেই। স্বাধীনতা অর্জনের পর হিমযুদ্ধের পরিবেশে ঐ নীতিই রূপ নেয় জোটনিরপেক্ষতার। কারণ জাতীয় সত্তার নিরঙ্কুশ বিকাশের যে দাবির প্রকাশ জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের মধ্যে, অন্য অবস্থায় একটি বিশেষ ক্ষেত্রে (পররাষ্ট্রনীতি) তারই সম্প্রসারণ জোটনিরপেক্ষতায়। বহুমূল্যদানে অর্জিত স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও দেশোন্নয়নের স্বার্থে মূলত এটি হচ্ছে আত্মনির্ভরতারই নীতি যদিও একই যুক্তিতে নিজেদের মধ্যে

ব্যাপকতর সংহতি প্রতিষ্ঠাও এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তলিয়ে দেখলে আবার ধরা পড়ে যে জাতীয় সত্তার স্বাধীন বিকাশের তাগিদ আসে ঐ সব দেশের সামনে যুগ যুগ ধরে যে সব জরুরী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা পুঞ্জীভূত ও অনড় হয়ে রয়েছে তার সমাধানের মৌল দাবি থেকেই। অনেক বিশ্লেষণের পর শ্রীকরুণাকরণ তাই এই সিদ্ধান্ত পৌছেছেন যে: "Social revolution is the first priority in Asia।"

সমাজবিপ্লবের নিরন্তর তাগিদ যে এ সব দেশে প্রচ্ছন্ন প্রভাব বিস্তার করে আপাতসুদূর পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও তা অনেক সময়ে প্রকাশ পায় রাষ্ট্রনায়কদের কথাতেও। যেমন সংবিধান পরিষদের সামনে জওহরলাল একদা বলেছিলেন:

"ইয়োরোপের দৃষ্টিভঙ্গির থেকে এশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ নানাভাবেই ধরা পড়ে। আজকে এশিয়ার প্রধান উৎকণ্ঠা যাকে আশু মানবিক সমস্যা বলা চলে তাই নিয়েই। কমবেশি মাত্রায় অনগ্রসর এশিয়ার প্রতিটি দেশের প্রধান সমস্যা হল খাদ্যের সমস্যা, বস্ত্রের সমস্যা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সমস্যা। আমাদের উদ্বেগ এ-সব সমস্যা নিয়েই। শক্তির রাজনীতি প্রসঙ্গে তাই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।" (৮ই মার্চ, ১৯৪৯)

এবং "শেষপর্যন্ত পররাষ্ট্রনীতির উদ্ভব বৈষয়িক নীতি থেকেই এবং যতদিন পর্যন্ত না ভারতবর্ষ তার বৈষয়িক নীতি যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারছে ততদিন তার পররাষ্ট্রনীতিও কিছুটা অস্পষ্ট, অপরিণত ও পথ-হাতড়ানো ধরনের থাকতে বাধ্য।" (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৪৯)

'সংঘাতের বাইরে' বা 'জোটনিরপেক্ষতার' মতো কথা তাই যে-নেতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে আসলে ব্যঞ্জনার দিক থেকে এই নীতি তার চাইতে অনেক বেশি সদর্থক। বিশ্লেষণের গভীরতার দরুন এ-কথাটিই সব চাইতে পরিস্ফুট হয়েছে শ্রীকরুণাকরণের প্রবন্ধে। অন্যান্য রচনাগুলিতে, বিশেষ করে ভারতের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে জোটনিরপেক্ষ নীতির সঙ্গতি-বিষয়ক শ্রীদেবদত্তের প্রবন্ধে সব সময়ে এই দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন থাকেনি। সেখানে ঐ নীতিকে তার বৈষয়িক ভিত্তি থেকে কিছুটা বিযুক্ত করে দেখার ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে মাঝে মাঝে। তাই এই নীতির সঙ্গে সময়ে সময়ে আমাদের 'জাতীয় স্বার্থের' অসঙ্গতি এবং সে-ক্ষেত্রে 'জাতীয় স্বার্থের' খাতিরে কিঞ্চিৎ নীতিপ্রবণ হওয়ার নজিরও তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন তাঁর প্রবন্ধে (যেমন নেপাল ও পাকিস্তানের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে)। কিন্তু 'জাতীয় স্বার্থ' যে মূলত জাতির সামাজিক

ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে জড়িয়েই, সে দিক থেকে তার মূল চরিত্র মোটের উপর এক থাকলেও দেশে দেশে যে বৈচিত্র্য রয়েছে বা অবস্থাবিন্যাসে যে প্রতিনিয়তই তারতম্য ঘটছে এবং সেই অনুপাতে এই পররাষ্ট্রনীতিরও যে বিকাশ ঘটছে ও ঘটতে বাধ্য—এ কথা শ্রীদেবদত্ত সব সময়ে খেয়াল করেন নি। আর নীতির মধ্যে গতিশীলতার স্বীকৃতি কম দিয়েছেন বলেই অনেক সময়ে তাঁর বিচার কিছুটা ছকবাঁধা হয়ে পড়েছে। যেমন ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতিকে তিনি যখন ভাগ করেন ১। Independent Policy বা স্বাধীন নীতি (১৯৪৬-৫০), Peace Area Approach বা শান্তি এলাকার দৃষ্টিভঙ্গি (১৯৫০-'৫৮) এবং non-alignment বা জোটনিরপেক্ষতা (১৯৫৮ সনের পর থেকে) এই তিন ভাবে, তখন তাঁর সতর্কবাণী সত্ত্বেও ব্যাপারটা একটু মনগড়া বোধহয়। তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঘটনাপ্রবাহকে কিছু বাঁকিয়ে-চুরিয়ে তাঁকে বলতে হয় যে "১৯৫৩ সনের পরেই (যুদ্ধের) উত্তেজনা ইওরোপ থেকে ছড়িয়ে পড়ল এশিয়ায় ও আফ্রিকায়" (৬৭ পৃষ্ঠা) এই কথা ভুলে যে ১৯৫০ সন থেকেই কোরিয়া যুদ্ধের গতি পৃথিবীকে প্রায় ঠেলে দিয়েছিল বিশ্বযুদ্ধের কিনারায়।

তেমনই আন্তর্জাতিক সমস্যাদির প্রতি ভারতের মনোভাব বিচার করতে গিয়ে তিনি যখন তার পিছনকার বিচারবুদ্ধিসাপেক্ষ, অনুভূতিগত, ঐতিহাসিক প্রভৃতি নানা উপাদানের কথা তোলেন আর বুদ্ধিগত উপাদানের মধ্যে কমিউনিজম, ধনতন্ত্র, যুদ্ধ ও যুদ্ধের প্রস্তুতির প্রতি মনোভাব এবং অনুভূতিগত উপাদানের ভিতরে জাতীয়তাবাদ, বর্ণবৈষম্যবিরোধ, এশীয় সংহতির মনোবৃত্তিকে ধরেন তখন ব্যাপারটা বেশ কিছুটা মনগড়া ও যান্ত্রিক বোধ হয়। বিচারকালে বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লেষণের দিকটিতে কমজোর পড়ায় এই বিপত্তি মাঝে মাঝেই ঘটেছে এই প্রবন্ধে।

জোটনিরপেক্ষতার ভবিষ্যত (আলোচনার ধরন থেকে মনে হয় খুব সুদূর ভবিষ্যতও নয়) প্রসঙ্গেও শ্রীদেবদত্তের মতামত তর্কাতীত নয়।

"…(ভারতের) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পরিপক্বতা অর্জন ও চীনা বিরূপতার প্রশ্ন, এমন এক অবস্থা যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঔপনিবেশিকতার ক্রমাবসান এবং কেনেডি ও ক্রুশ্চভের ক্ষমতালাভ—এই সব মিলিয়েই নতুন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

'বিকাশমান রাষ্ট্রের পক্ষে মৌল তাগিদ হচ্ছে : মুক্তি নয়, বিকাশ এবং

সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কস্থাপন ও টিঁকে থাকা নয়, ক্ষমতা ও ক্ষমতা অর্জনের সব কটি আনুষঙ্গিক। বোধ হয় ভারতের জোটনিরপেক্ষ নীতিও নির্ধারিত হবে এই সব নতুন প্রয়োজন ও তাগিদের চাপেই। জোটনিরপেক্ষতার রাজনীতি হচ্ছে শান্তির রাজনীতি, শক্তিহীনতা ও কোনোমতে বেঁচে থাকার অবস্থা। শক্তি অর্জন ও বিকাশের রাজনীতির সঙ্গে জোটনিরপেক্ষতার সঙ্গতি সম্ভব হবে কি ?" (৯৩ পৃষ্ঠা)

এর সঙ্গে শ্রীপরমেশ্বরণ নায়ারের বিচার তুলনীয় :

"ভিতরের ও বাইরের অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতির বর্তমান চেহারারও যে পরিবর্তন ঘটবে এ কথা যুক্তিগ্রাহ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান প্রসঙ্গে সত্যকার মতৈক্য ঘটতে পারে যখন প্রত্যেকটি দেশই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'নিজে বাঁচো, অন্যেকে বাঁচতে দাও'-এর নীতি অনুসরণ করে চলবে। কোনো একটি শক্তিজোট হঠাৎ বিপুলতর সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে দাঁড়াতে পারে যার ফলে আজকের দুনিয়ার ভারসাম্য বিপর্যস্ত হবে এবং অসম্ভব ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে জোটনিরপেক্ষতার নীতি। এই সব দেশের ভিতরেও গুরুতর রাজনৈতিক ও অন্যবিধ পরিবর্তনের ফলেও পররাষ্ট্র নীতিতে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। যে-কোনো শক্তিজোটের এই নীতির প্রতি সর্বাত্মক বিরোধিতাও বিশ্বদরবারে এ-নীতির প্রভাবকে খর্ব করতে বাধ্য বহুলাংশেই।

"অন্য এক দিক থেকেও এ-নীতি দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির ভিতরেও সর্বদাই পূর্ণ ও সুসমঞ্জস মতৈক্য ঘটেনি সর্বক্ষেত্রে। …এই মতানৈক্য প্রমাণ করে বিভিন্ন দেশের দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য।…

"তবু এই মতানৈক্য জোটনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধতার মৌল উপাদানগুলিকে আচ্ছন্ন করে না। বর্তমানে সমস্ত অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশগুলির প্রাথমিক সমস্যা হল যত দ্রুত সম্ভব তাদের চিরন্তন, মধ্যযুগীয় সমাজের আধুনিকতাসাধন।…"

এ কথা ঠিক যে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যেও যথেষ্ট তারতম্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে। সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, এবং পাকিস্তান বেলগ্রেড সম্মেলনে যোগদানকারী কোনো কোনো দেশ সম্পর্কে এই বইতে যে তথ্য সমাবেশ ঘটেছে তার থেকেও সেকথা স্পষ্টই বোঝা যায়। এও ঠিক যে ভিতরের

ও বাইরের চাপে ক্ষেত্রবিশেষে আমূল অবস্থান্তরও ঘটতে পারে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, যেমন মোসাদ্দেকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইরানে বা কাশেমের অভ্যুদয়ের পরে ইরাকে। কিন্তু বিপর্যয় ঘটলেও মূলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে যাবে, আর তারই সমাধানকল্পে থাকবে জাতীয় সত্তার স্বাধীন বিকাশের তাগিদ। তাই অদূর ভবিষ্যতে এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলিতে জোট-নিরপেক্ষতার ঝোঁক বাড়বে বই কমবে না—চীন সরকারের হালের মতিগতি সত্ত্বেও বোধ হচ্ছে এ কথাই সঠিক সাধারণভাবে যদি না অবশ্য বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যায় ইতিমধ্যে।

বিশ্বযুদ্ধের পথরোধ করার ব্যাপারেও জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে স্পষ্টতই। বহু আয়াস-অর্জিত স্বাধীনতার সংরক্ষণ এবং অব্যাহত জাতীয় উন্নয়ন—এদের পক্ষে বিশ্ব-শান্তিরক্ষা উভয়ের স্বার্থেই অপরিহার্য। তাই জোটনিরপেক্ষতার অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে শান্তির জন্য অকৃত্রিম আগ্রহ। এর সঙ্গে জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের সমর্থন, এমন কি দেশোদ্ধারের জন্য প্রয়োজনবোধে ইন্দোচীন বা আলজিরিয়া বা আজকের দিনের এঙ্গোলার মতো সরাসরি অস্ত্রধারণের অসঙ্গতি-কল্পনা, হয় সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি (আমাদের গোয়া দখলের সময়ে ইঙ্গ-মার্কিন মহলে যা প্রকট হয়ে উঠেছিল) নয়তো বা অতি বামপন্থী মূঢ়তাপ্রসূত (যেমন চীনের যুক্তি—যেহেতু সোভিয়েত বিশ্বশান্তিরক্ষায় উৎসাহী সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামে নিশ্চয়ই তার সমর্থন নেই)। আসলে স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যই শুধু নয়, আজকের পৃথিবীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের জন্যও বিশ্বশান্তি অপরিহার্য। বেলগ্রেড সম্মেলন-সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রবন্ধটিতে এ-প্রসঙ্গের এবং জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির ভিতরে সংহতি প্রতিষ্ঠার বিশদ বিচার উল্লেখযোগ্য।

সুনীল সেন

এশিয়ার নবজাগরণ

"এশিয়ার সমসাময়িক এবং চলমান ইতিহাস" যুগান্তরের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। স্বাধীন এশিয়ার "রাজনৈতিক রেখাচিত্র" উপস্থিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। সুমধুর ভাষায় তিনি সমসাময়িক ঘটনাবলীর গতি ও প্রকৃতি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। "সাম্রাজ্যবাদের রূপরেখা" "বন্ধন মুক্তির রূপরেখা," "দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া", "পূর্ব এশিয়ার সংঘাত", "চীন-ভারত সম্পর্ক", "পাকিস্তান নেপাল ও ভারত", "এশিয়ার ভবিষ্যৎ"—এই ছয়টি অধ্যায়ে এই বই বিভক্ত। যতদূর জানি বাংলা ভাষায় এই ধরনের বই রচনার প্রচেষ্টা এই প্রথম। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রদের কাছে লেখক নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ।

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের মতে দারিদ্র্য, বেকারি, অশিক্ষা, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনে অনগ্রসরতা এশিয়ার সমাজ-জীবনের "বিক্ষোভ ও অসন্তোষের" মূল উৎস। এশিয়ার সমস্যাকে জটিল করেছে ধর্মের বিকৃতি, লোকাচার, বর্ণভেদের বৈষম্য, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, রক্ষণশীলতা। এই অবস্থায় মানুষের সৃজনশীল শক্তি অবরুদ্ধ, সমাজজীবন গতিশীল হবার পথে অনেক বাধার সম্মুখীন। সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে "পশ্চিমী দলে ভিড়াইবার" চেষ্টা ক্রমাগত চলবে; এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা চুক্তি সংস্থার (সংক্ষেপে সিয়াটোর) উৎপত্তি (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪); এশিয়ার ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-চক্রগুলি (চিয়াং কাইশেক, নগো দিয়েম, সীংম্যান রী প্রভৃতি) ট্রুম্যান-আইসেনহাওয়ার-কেনেডির ("মার্কিন উদারতাবাদী গণতন্ত্রীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও") পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছে। এশিয়াতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সংঘাত সৃষ্টির "একান্ত সম্ভাবনা", এবং সেই লড়াইয়ে "এক প্রান্তে থাকিবে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গ এবং অন্য প্রান্তে সমাজতান্ত্রিক শিবির"।

এশিয়ার বন্ধন-মুক্তি। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ প্রকাশ। ছয় টাকা

(পৃঃ ১৭৯) এশিয়ার জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও সংশয় জেগেছে ; "অদৃষ্টের বন্ধন"-কে অস্বীকার করে তাঁরা "অর্থনৈতিক বন্ধনের" কারণ জানতে উৎসুক হয়ে উঠছে। বিভিন্ন দেশে রূপায়িত হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা।

বর্তমান সমালোচক শ্রীমুখোপাধ্যায়ের অনেক বক্তব্যের সঙ্গে একমত, তবে মনে হয় তাঁর কিছু ঢালাও মন্তব্য আছে যা আদৌ তর্কাতীত নয়। তাঁর দুটি মন্তব্য উধৃত করা গেল :

"গান্ধী-নেতৃত্ব ও নেহরু-নেতৃত্ব ভারতবর্ষকে পূর্ণতর বিপ্লবের পথ হইতে সরাইয়া দিয়াছে—রক্তপাত, অশ্রু, এমন কি প্রয়োজনমত সংঘর্ষ ও যুদ্ধের ভিতর দিয়া জনগণকে পুনর্জন্ম লাভের সুযোগ দেওয়া হয় নাই"। (পৃঃ ১৬৭)

"এশিয়ার বর্তমান অসমাপ্ত বিপ্লবের শুরু হইয়াছিল সংঘর্ষে ও রক্তপাতে (গান্ধীজীর অহিংসা সত্ত্বেও)। সুতরাং সেই বিপ্লব সমাপ্তি ও পূর্ণতার যখন পথ ধরিবে, তখন আর একবার অশ্রু ও রক্তপাতের নিশ্চিত সম্ভাবনা। অন্তত ফুলের মালা ও শঙ্খধ্বনির দ্বারা এশিয়ার সর্বত্র সেই বিপ্লবকে বরণ করা হইবে না"। (পৃঃ ১৮১)

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পটভূমিতে গান্ধী-নেতৃত্ব এবং নেহরু-নেতৃত্বের নতুন মূল্যায়নের কোনো চেষ্টা লেখক করেন নি। গান্ধী-নেতৃত্ব বা নেহরু-নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই স্বীকার্য, কিন্তু মনে রাখা দরকার গান্ধী-নেহরুর নেতৃত্বেই ভারত ঔপনিবেশিক বন্ধন ছিন্ন করেছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তিআন্দোলন জয়যুক্ত হতে পারে না—এই তত্ত্ব ভারতের (এবং আরো কয়েকটি দেশের) ক্ষেত্রে অসার প্রতিপন্ন হয়েছে। গোয়া মুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের বুর্জোয়া সরকারের সামরিক অভিযানের ভূমিকা নিশ্চয়ই গৌণ নয়। ইতিহাসের গতি বিচিত্র। পুরনো ধ্যানধারণা দিয়ে সমসাময়িক ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি বোঝা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : এশিয়ার "অসমাপ্ত বিপ্লব" কোন পথ ধরে অগ্রসর হবে? "অশ্রু ও রক্তপাতের" পথ কি এশিয়াবাসীর নিয়তি ? এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের নতুন পরিস্থিতির নতুন সম্ভাবনার বিষয়টি এসে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয় শ্রীমুখোপাধ্যায় বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব এবং এশিয়ার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উপর এর প্রভাবের কোনো উল্লেখ করেন নি। আধুনিক যুগের কি অন্যতম প্রধান মর্মবস্তু এই নয় যে, বিশ্ব-

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজের বিকাশের নির্ধারক উপাদান হয়ে উঠছে? উৎপাদন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অগ্রগতি নতুন ধারায় বিশ্ব-বিপ্লবের বিকাশকে প্রভাবিত করবার নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে নি ? এশিয়ার কয়েকটি সদ্য স্বাধীন দেশ কি ইতিমধ্যেই সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে স্বাধীন অর্থনীতিক বিকাশ এবং রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্র প্রসারের পথ গ্রহণ করে অগ্রসর হচ্ছে না ? সিংহল ও ব্রহ্মদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কিসের ইঙ্গিত বহন করে ?

শ্রীমুখোপাধ্যায় উপসংহারে চীনের ভারত আক্রমণের বিষয় আলোচনা করেছেন। এশিয়ার ইতিহাসে এই ঘটনা যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করবে, তা নিঃসংশয়ে স্বীকার্য। লেখকের ভাষায় "ইতিহাসের ভয়ঙ্কর সন্ধিক্ষণে" আমরা বাস করছি। এই ঘটনার ফলে "সমাজতন্ত্রের আদর্শ আজ কোণঠাসা হইয়াছে, প্রতিক্রিয়াশীলতার সর্বাত্মক অভিযানে প্রগতিশীলতা চাপা পড়িয়াছে, এবং জনগণের নিকট যারা ছিল অবাঞ্ছিত হঠাৎ তারা দেশপ্রেমের মুখোস পরিয়া সভাক্ষেত্রে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছে।" (পৃঃ ১৯০) ১৯৬২ সালের ১লা ডিসেম্বরে এই অংশ লিখিত। তারপর "প্রতিক্রিয়াশীলতার সর্বাত্মক অভিযান" আরো অগ্রসর হয়েছে। চীন এখনও কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। ঝোপ বুঝে কোপ মারবার জন্য কেনেডি-ম্যাকমিলান "কাশ্মীর সমস্যা" মিটিয়ে ফেলবার জন্য ভারতের উপর চাপ দিচ্ছেন। ভারতের জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি দেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়ার প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন।

রণজিৎ দাশগুপ্ত

নিরস্ত্র জয়

১৯৬২ সালের অক্টোবরের কয়েকটি দিন। কিউবার বিরোধে মার্কিন নৌ-অবরোধ শুরু হয়েছে। অস্ত্র-বোঝাই সোভিয়েত জাহাজ পশ্চিম মুখে অগ্রসর হচ্ছে। মার্কিন জাহাজ তার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত। গোটা পৃথিবী জুড়েই যুদ্ধের মহড়া চলছে। মনে হচ্ছে, যুদ্ধ, নিউক্লীয় যুদ্ধ, আসন্ন আর সেই সঙ্গে সমগ্র মানবজাতি এবং হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে-ওঠা সভ্যতা ও সৌন্দর্যের পরমাশ্চর্য সব কীর্তি এসে দাঁড়িয়েছে চরম সর্বনাশের কিনারায়। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে, বারট্রাণ্ড রাসেল লিখছেন, "আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিলাম যে ক্ষমতার কেন্দ্রগুলিতে কি একজনও প্রকৃতিস্থ লোক নেই। শেষ সম্ভাব্য মুহূর্তে জবাব এল : হ্যাঁ, একজন প্রকৃতিস্থ লোক রয়েছেন। ঘটনাচক্রে তিনি ছিলেন রাশিয়ার দিকে।·· তাঁর প্রকৃতিস্থতা পৃথিবীকে বাঁচিয়েছে। এবং আপনারা ও আমি এখনও টিঁকে রয়েছি।" (পৃঃ ৭)

কিন্তু শুধু ক্যারিবিয়ান উপসাগরে নয়, ঐ একই সময়ে বিশ্বের আর এক প্রান্তে, চীন-ভারত সীমান্তে ঝড়ের কালো মেঘ জমা হচ্ছিল। গত অক্টোবরের এ-দুটি সমস্যার বিষয়েই রাসেল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সম্প্রতি প্রকাশিত 'নিরস্ত্র জয়' বইটিতে।

সাধারণ্যে রাসেলের প্রধান পরিচয় দার্শনিক হিসেবে। সেই সঙ্গে গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা-সমস্যা, শিল্প-সাহিত্য—জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমনি নানা শাখায় তাঁর অবাধ গতায়াত। কিন্তু এই অসাধারণ প্রতিভাধর মানুষটি নিজেকে শুধুমাত্র কেতাবি বিদ্যার জগতে আবদ্ধ রাখেন নি। আর ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এই ৯১ বছর বয়সেও তাঁর মস্তিষ্ক বিস্ময়কর রকমের সক্রিয়, চিন্তা ও উপলব্ধি প্রচণ্ড গতিশীল

Unarmed Victory : Bertrand Russel, Penguin Books. London, 1963.

হৃদয় মানবিক আবেগে স্পন্দিত আর কর্মোদ্যম অপরিসীম। তাই দেখি, যে রাসেল একদা সোভিয়েত রুশিয়ার বিরুদ্ধে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের উন্মাদ পরামর্শ দিয়েছিলেন আজ তিনিই নিউক্লীয় অস্ত্র-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়, সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও কারাবরণে অগ্রণী, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য বিশ্বব্যাপী মহৎ কর্মতৎপরতার অংশীদার, মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমালোচনায় মুখর, নিকিতা ক্রুশ্চভ ও সোভিয়েত সরকারের শান্তিনীতির গুণগ্রাহী। আর সে কারণেই অক্টোবরের সংকটময় দিনগুলিতে তিনি নিশ্চুপ বা নীরব থাকতে পারেন নি, ভাবতে পারেন নি যে চূড়ান্ত বিপর্যয়ই একমাত্র ভবিতব্য। তাই তিনি তাঁর সমস্ত ব্যক্তিগত প্রভাব, সম্পর্ক ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন ক্যারিবিয়ান উপসাগর ও হিমালয় সীমান্তের সংকট-মোচনের উদ্দেশ্যে, নিজেকে যুক্ত করেছেন দেশে দেশে সমস্ত সৎ, শান্তিকামী মানুষের শান্তি প্রয়াসের সঙ্গে এই গ্রহ ও গ্রহের বাসিন্দাদের জীবন নিরাপদ করার কাজে। সেদিনের সেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত, আর সেই অভিজ্ঞতার আলোয় কিউবা ও চীন-ভারত সমস্যা এবং সর্বোপরি, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে নিহিত বিপদ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির পরিচয় রয়েছে আলোচ্য বইটিতে।

দুই

নিঃসন্দেহেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের দীর্ঘ ইতিহাসে কিউবা সংকট হল সব থেকে নাটকীয় ও বিপজ্জনক। কমিউনিজম-বিরোধী পাণ্ডারা প্রচার করে থাকেন যে, এই সংকটের দায়িত্ব নাকি কিউবার বিপ্লবী সরকারের। কিন্তু এই সংকটের মূলে আসলে যে মার্কিন ধনকুবেরদের মুনাফা-লালসাটাই প্রধান কারণ, সে সত্যটি রাসেলের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি দেখিয়েছেন যে, বিপ্লব-পূর্ববর্তী কিউবায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ স্বৈরাচারী শাসকদের একটানা শাসনের পরিণাম কিউবাবাসীর পক্ষে মর্মান্তিক হলেও "কিউবান ভূম্যধিকারী ও আমেরিকান স্বার্থের দিক দিয়ে ব্যবস্থাটি ছিল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক।" (পৃঃ ১৯). কিউবা বিপ্লবের মুখ্য উদ্দেশ্য এই অসঙ্গত পরিস্থিতির প্রতিকার। কিন্তু এই পরিবর্তনকে উত্তর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ মেনে নিতে পারে নি। কেন না [ক] "কিউবাবাসীরা যে ধরনের সরকার নির্বাচন করল সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করে নি"; এবং [খ] "এই ধরনের সরকারের উদ্দেশ্য ছিল কিছু

প্রচণ্ড ধনী আমেরিকানদের আয় হ্রাস এবং তার মাধ্যমে বহুসংখ্যক অপুষ্ট কিউবাবাসীকে চরম দারিদ্র্যের হাত থেকে রক্ষা করা।" (পৃঃ ২৩)

এই পরিস্থিতিতে যে কোনো উপায়েই "কাস্ত্রো সরকারকে ধ্বংস করা এবং এর পরিবর্তে আমেরিকার আর্থিক স্বার্থের প্রতি বেশি অনুকূল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমেরিকার চেষ্টা সংকটের হেতু।" (পৃঃ ৫৬) কিউবা বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটানা প্ররোচনা ও আক্রমণাত্মক প্রস্তুতির পটভূমিতেই কিউবায় সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি নির্মাণ। আর সোভিয়েত রাশিয়ার সক্রিয় সাহায্য ও উদার সহযোগিতা না পেলে যে ওয়াশিংটনের মতলব হাসিল হয়ে যেত—সেকথাও রাসেল বলেছেন।

তিন

সাম্রাজ্যবাদ ও তার স্তাবকেরা প্রতিপাদন করতে চাইছে যে কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি স্থাপনই নাকি সংকটের কারণ। তারা রটনা করছে যে, এই ঘাঁটি স্থাপনের ব্যাপারে রয়েছে সোভিয়েত দেশের "মিথ্যাচারী, প্রতারণা-মূলক ও শয়তানী" নীতি। এবম্বিধ পরিস্থিতিতে "মুক্ত দুনিয়ার" ও "স্বাধীনতার" স্বার্থে কিউবায় হস্তক্ষেপ আর নৌ-অবরোধ ভিন্ন আর কি উপায় ছিল?

কিন্তু 'স্বাধীনতা'র জন্য এই বাগাড়ম্বর যে কত অসার সেটা দেখিয়ে রাসেল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মিসিসিপি, দক্ষিণ আফ্রিকা আর নাটিংহিলের কথা। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, "স্পেন ও পর্তুগালকে 'মুক্ত দুনিয়া'র অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়, যদিও দুটি দেশেই জঘন্য স্বৈরাচারী সরকার বর্তমান। আমেরিকায় কমিউনিজম সম্প্রতি অপরাধে পরিণত হয়েছে।" (পৃঃ ১২) প্রকৃতপক্ষে 'মুক্ত দুনিয়া'র ঢাক যাঁরা বাজাচ্ছেন তাঁদের চিন্তা-চেতনায় পশ্চিম গোলার্ধে স্বাধীনতার অর্থ শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করার স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদী ধনকুবেরদের পরদেশ লুণ্ঠন করবার স্বাধীনতা। (পৃঃ ৬০, ৬২)

'প্রতারণার অভিযোগ প্রসঙ্গে রাসেল বলেছেন, "রাশিয়ানরা কি করছে তা তারা গোপন করার কোনো চেষ্টা করেনি।" কিছু কিছু অস্ত্র স্থাপন করা হয়েছিল একেবারে "প্রধান সড়কের কাছে এবং সবগুলিই আমেরিকান বিমান থেকে পর্যবেক্ষণের জন্য খোলা ছিল।" (পৃঃ ৫৪)

'মিথ্যাচারণ'-এর বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হল যে, এটি যদি করা হয়ে থাকে তবে করা হয়েছে পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও নাটোর গুরু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের

তরফ থেকে। তারই নমুনা হল কিউবায় স্থাপিত মাত্র ৫০০ মাইল পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রকে দূর পাল্লার আক্রমণাত্মক অস্ত্র বলে প্রচার করে মার্কিন দেশে ও অন্যত্র যুদ্ধের জিগিরকে খুঁচিয়ে তোলা। আর এই ধরনের মিথ্যা প্রচার ও সংবাদ তৈরিটা যে সচেতন সরকারী নীতিরই অঙ্গ সে-কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় মার্কিন এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী অব ডিফেন্স আর্থার সিলভেস্টারের উক্তিতে যেখানে তিনি বলছেন যে, সংবাদ হচ্ছে "আমেরিকান অস্ত্রাগারের একটি হাতিয়ার" এবং "নিউক্লীয় বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলার জন্য সরকারের জন্মগত অধিকারটি মৌলিক বলেই আমি মনে করি।" (পৃঃ ৫৬) কেউ কেউ হয়তো জাতিসঙ্ঘে কিউবা সংকটের গোড়ার দিকে সোভিয়েত প্রতিনিধি জোরিন কর্তৃক কিউবায় সোভিয়েত ঘাঁটির অস্তিত্ব অস্বীকার করার কথা উল্লেখ করতে পারেন। কিন্তু এ-বিষয়ে রাসেলের অভিমত হল যে, যথা সময়ে যথাযথ সরকারী নির্দেশের অভাবেই জোরিন ভুল করেছেন। উপরন্তু ব্যাপারটিতে জোরিনের বেশ কিছু ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকতে পারে, আর তার দরুণই পরবর্তীকালে জোরিনের অপসারণ ঘটেছে—এমন ইঙ্গিতও রাসেল করেছেন।

মার্কিন ও ব্রিটিশ সরকারী নেতাদের কপটতার স্বরূপ উদঘাটন করে রাসেল দেখিয়েছেন যে, সোভিয়েত দেশের সীমান্তকে ঘিরে পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন, তুরস্ক, জাপান, কানাডা ও অন্যান্য অনেক দেশে যুদ্ধ ঘাঁটি, ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি ও নিউক্লীয় সাবমেরিনের বেড়াজাল যারা রচনা করেছে তারাই আজ কিউবায় একটি স্বল্প পাল্লার ঘাঁটি নির্মাণের জন্য সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে হল্লা জুড়ে দিয়েছে। আর সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্রের অস্তিত্বকে যদি শয়তানী ও শত্রুতামূলক কাজ বলে গণ্য করাটা ন্যায়সঙ্গত হয়, "তবে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে হাইড্রোজেন বোমার, নিউক্লীয় রকেট ও পোলারিস সাবমেরিনের উপস্থিতিকে আমরা কি ভাবে ব্যাখ্যা করব?" (পৃঃ ২৫) সুতরাং সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে "যে দুমুখো আচরণের কথা লর্ড হোম বলছেন সেটিই হল আমেরিকান দুমুখো চিন্তা এবং ম্যাকমিলানের তথাকথিত সার্বভৌম সরকারের দু-রকম মাপকাঠির যোগ্য বর্ণনা।" (পৃঃ ৪২)

এই সাম্রাজ্যবাদী দুমুখো নীতি প্রচারের বাহন হয়েছে বেতার, টেলিভিশন ও সর্বোপরি সংবাদপত্র। যে 'মুক্ত দুনিয়া'র এত বড়াই করা হয় সেই দুনিয়াতেই সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের মালিককুল কেমন করে

সংবাদ বিকৃত করে, সত্য গোপন করে আর সর্বনাশা যুদ্ধের হিস্টিরিয়া ছড়ায় তার বহু দৃষ্টান্ত রাসেল উপস্থিত করেছেন। কিউবা সংকটকালে এদের এই রটনাজালকে ছিন্ন করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশন করার জন্য রাসেল সক্রিয় হয়েছেন, সংকট মোচনের জন্য কেনেডি, ম্যাকমিলান, ক্রুশ্চভ, কাস্ত্রো, উ থাণ্ট প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন (যদিও এসব বিবৃতির বেশির ভাগই সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পায় নি) এবং শুধুমাত্র একক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বা রাষ্ট্রনায়কদের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর না করে "যারা জীবনকে ভালোবাসে এমন প্রতিটি মানুষকে আমাদের দেশের রাস্তায় বেরিয়ে আসা এবং বাঁচার ও বাঁচতে দেওয়ার জন্য আমাদের দাবি জানানোর জন্য" উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। (পৃঃ ৩০)

চার

রাসেলের এই সমস্ত কর্মতৎপরতা ও আলোচ্য গ্রন্থে নানা তথ্য-বিশ্লেষণ ইত্যাদির মধ্যে যেটি প্রধান কথা সেটি হল যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা প্রসঙ্গে তাঁর গভীর উৎকণ্ঠা। এই পৃথিবীতে রক্তক্ষয়ী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ ইতিপূর্বে অনেক হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে নিউক্লীয় অস্ত্রের আবিষ্কারের দরুণ যুদ্ধের সমস্ত প্রকৃতিই একেবারে পাল্টে গেছে। নিউক্লীয় অস্ত্রের প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা যুদ্ধকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক করে তুলেছে, এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক নানা পরিবর্তন দুই বিরোধী সমাজব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে একই সঙ্গে সম্ভবপর ও প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে রাসেলের বিবেচনায় যুদ্ধ ও শান্তির প্রসঙ্গে "শান্তির গুরুত্বের তুলনায় দুই পক্ষের গুণাগুণের প্রশ্ন তুচ্ছ।" (পৃঃ ১৩) এই নিউক্লীয় যুগে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কোনো বাস্তব বিকল্প নেই। আর সে কারণেই, রাসেল ঘোষণা করেছেন, দুটি দেশের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয় দেশের পক্ষে।

কিউবা সংকট সুনিশ্চিতভাবেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, ক্রুশ্চভ ও সোভিয়েত সরকার নিউক্লীয় বিপদ এবং শান্তির সম্ভাবনা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। এই সংকট মোচনের জন্য সোভিয়েত ব্যবস্থাবলীই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সোভিয়েত সরকারের কাছে মানবজাতির অস্তিত্বের প্রশ্ন, শান্তির প্রশ্ন সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্ন। আগেই বলা হয়েছে, সংকটকালে রাসেল অনেক রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে সুবিবেচনার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

কিন্তু ম্যাকমিলান আবেদনটির শুধুমাত্র প্রাপ্তিস্বীকার করেছিলেন, কেনেডি পরামর্শ দিয়েছিলেন সোভিয়েত 'দস্যু'দের প্রতি মনোযোগ দিতে। আর ক্রুশ্চভ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন : কোনো হঠকারিতা করা হবে না, নিউক্লীয় যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া হবে না, শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সব রকম উপায়ে চেষ্টা চালানো হবে। এই সমস্ত প্রতিশ্রুতিই পূরণ করা হয়েছে। তাই রাসেলের সিদ্ধান্ত হল, "যদি কোনও দিন কাজ দিয়ে কথাকে সমর্থন করা হয়ে থাকে তবে তা করা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে।" (পৃঃ ৫২) সোভিয়েত ব্যবস্থাবলীর ফলেই একাধারে মানবজাতি ও সভ্যতা সংস্কৃতির অস্তিত্ব এবং কিউবা বিপ্লবের অগ্রগতি রক্ষা পেয়েছে। এ ভাবেই কোনও অস্ত্র ব্যবহার না করে, রক্তক্ষয় না ঘটিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্জন করেছে এক মস্ত বড় নৈতিক জয়, 'নিরস্ত্র জয়'।

কিন্তু সোভিয়েত সরকার যখন "ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের জন্য ইচ্ছুক," তখনও আমেরিকান সরকার ও পশ্চিমী দেশগুলি অনুসরণ করে চলেছে আগের মতোই "সশস্ত্র উন্মাদগ্রস্ততার" নীতি। কিউবার বিরুদ্ধে হুমকী প্রদর্শনও অব্যাহত রয়েছে। নিঃসংশয়েই এই নীতি অনুসরণের মধ্যে রয়েছে যে-কোনো সময়ে সর্বনাশা বিস্ফোরণের সম্ভাবনা।

রাসেল অবশ্য অকপটেই জানিয়েছেন যে, তিনি কোনোদিনই কমিউনিজমের প্রতি সহানুভূতিশীল নন। তাঁর মতে মার্কসবাদ বাতিল হয়ে গেছে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি অগণতান্ত্রিক ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনকি সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নই যে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে শান্তির পক্ষে এটা তাঁর কাছে একটা গুরুত্বহীন যোগাযোগ বা "unimportant accident।" (পৃঃ ৭) আসলে অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম দিনে শান্তি ঘোষণার সময় থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন যে শান্তির জন্য নিরলস নিরবচ্ছিন্ন যোদ্ধা এ-ইতিহাস তিনি উপেক্ষা করেছেন। কিউবা সংকটকালে সোভিয়েত আচরণ ও নীতি যে মোটেই আকস্মিক ব্যাপার নয়, বরং এটাই যে কোনো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাভাবিক ও সঙ্গত এবং এই সুবিবেচনাসম্মত নীতির মূল যে সমাজতন্ত্রের প্রকৃতির ভিতরেই নিহিত, শান্তির সংগ্রাম যে কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ, এ-সত্যটি অনুধাবনে রাসেল ব্যর্থ হয়েছেন।

স্বভাবতই এরকম অনেক বিষয়ে রাসেলের সঙ্গে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এই মতপার্থক্য গৌণ। বর্তমান পরিস্থিতিতে মতপার্থক্যের

থেকে মিলের কথাটাই হল প্রধান—এবং এ-মিল বা ঐক্য হল আজকের দিনের সব থেকে মৌলিক, সব থেকে জরুরী বিষয়ে: বিশ্বশান্তির জন্য প্রহরাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে, আর দেশে দেশে জনসাধারণের সদাসতর্কতাই বিশ্বশান্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখার একমাত্র উপায়।

পাঁচ

যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যার বিষয়ে এই গভীর উৎকণ্ঠা নিয়েই রাসেল ভারত-চীন সীমান্ত যুদ্ধের বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। অবশ্য আশু ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে কিউবা সংকটের তুলনায় ভারত-চীন সংকট ছিল কম গুরুত্বপূর্ণ। কেন না প্রথম ক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতি এসে দাঁড়িয়েছিল একেবারে চরম ধ্বংসের মুখোমুখি, আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিপদটা ছিল একটা স্থানীয় যুদ্ধের সর্বাত্মক সাধারণ যুদ্ধে পরিণত হওয়ার। তথাপি দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সংঘর্ষ, এবং সেই সংঘর্ষ বিস্তারের সম্ভাবনায় রাসেল ব্যথিত ও বিচলিত হয়েছেন অত্যন্ত সঙ্গত কারণে। আর এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত সাধ্য অনুসারে এই জটিল সমস্যা সমাধানে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন।

কিন্তু একান্ত মানবদরদ ও শান্তিকামনার জন্য রাসেলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও একথা না বলে উপায় নেই যে, চীন-ভারত সীমান্ত-সমস্যা প্রসঙ্গে রাসেলের অনেক ধারণা ও বক্তব্য একেবারেই ভ্রান্ত। বাস্তবিকপক্ষে ভারত-চীন বিরোধটিকে সমসাময়িক বাস্তবতার পটভূমিতে বিচার করার পরিবর্তে রাসেল গ্রহণ করেছেন অত্যন্ত আইনী ও আনুষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি। তার ফলে তাঁর মনে হয়েছে: [ক] চীনের সীমান্ত দাবি খুবই জোরালো; [খ] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'বেআইনী' দখলগুলির উত্তরাধিকারের দাবিদার ভারতীয় ইউনিয়ন; [গ] চীনই প্রথম আক্রমনকারী কিনা, এটা বলা সংশয়ের বিষয়; [ঘ] শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার মীমাংসায় ভারত তেমন আগ্রহান্বিত তো নয় বটেই, বরং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ, ভারত সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরু চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টিতে রত।

এই দুই সুপ্রাচীন বন্ধু দেশের মধ্যে সংঘর্ষ যে গভীর বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক ঘটনা, একথা যে-কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই স্বীকার করবে। কিন্তু কেন এমনটা ঘটল? এখন কার ম্যাপ ঠিক, আর কার ম্যাপ বেঠিক—সে তর্কের মধ্যে প্রবেশ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে রাসেল নিজেও

সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত নন। কিন্তু এরকমের কোনো সমস্যাকে আমরা কি বিবেচনা করব শুধু অতীত ইতিহাস ও পুরনো ম্যাপের সাহায্যে, না বর্তমান ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোয়? ভারতীয় জাতি সম্পর্কে ধারণা বা বর্তমান ভারত রাষ্ট্র তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারতজয়ের পরবর্তী ব্যাপার এবং অনেকাংশে ফলও বটে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের বর্তমান সীমানা তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঘটনা। কিন্তু অতীত ইতিহাসের নজীর তুলে যদি পুরনো সীমানা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয় তবে কেমন হবে? চীনা বক্তব্য থেকেই তো জানা যাচ্ছে, ১৯৫০ সালেই 'নেফা' অঞ্চলে ভারতীয় প্রশাসন প্রসারিত হয়েছে, এটা ঘটেছে বিনা বাধায় এবং ১৯৫৯ সালের আগে পর্যন্ত এ-বিষয়ে কোনো আপত্তিই চীন সরকার জানান নি।

ভারত আলাপ-আলোচনায় আগ্রহী কিনা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলছে কিনা, এ-প্রশ্নের উত্তরে মনে রাখা উচিত, অতীতে চীন যখন আজকের তুলনায় অনেক দুর্বল ছিল তখনই অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের পঞ্চশীল চুক্তিতে তিব্বতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত সুবিধার উত্তরাধিকার ভারত স্বেচ্ছায় বর্জন করেছে। মনে রাখা উচিত, ঐ চুক্তি অনুসারেই তিব্বতের ইয়াংসি ও গিয়াংসি থেকে ভারত সামরিক চৌকি তুলে নিয়েছে, এবং ভারত সরকারের মালিকানাধীন ডাক ও তার বিভাগকে নামমাত্র মূল্যে চীন সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রথম আক্রমণের বিষয়ে বলা যেতে পারে, এটা ঠিকই যে অক্টোবরের প্রথম দিকে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভারতীয় জমির থেকে চীনা ফৌজ বিতাড়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ নির্দেশটি ছিল ভারতীয় দাবি অনুসারে ম্যাকমেহন রেখার দক্ষিণে থাগলা গিরিপৃষ্ঠ অঞ্চলের জন্য। গত বছরে ৮ই সেপ্টেম্বরের আগে চীনারাও এ অঞ্চলে ছিল না এবং এখানে মামলা ছিল মাত্র ৪।৫ মাইলের। কিন্তু এই নির্দেশের পাল্টা জবাবে শুরু হয় চীনা অভিযান এবং এই অভিযান চালানো হয় সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে। ট্যাঙ্ক, মর্টার ইত্যাদিতে সুসজ্জিত অভিযানই প্রমাণ করে দেয় যে এটি ছিল সযত্নে প্রস্তুত ও যথেষ্ট পূর্বপরিকল্পিত। আর পূর্ব সীমান্তে এই অভিযান চালানো হয় ম্যাকমেহন লাইন অতিক্রম না করার পূর্ব-প্রতিশ্রুতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে।

একথা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই যে, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষ থেকে চীনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্ররোচনা জোগানো

হয়েছে, দেশের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা ও অন্ধ চীন-বিদ্বেষ জাগ্রত করার অপপ্রয়াস করা হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই যুদ্ধ-উন্মাদনার বিরুদ্ধে বারে বারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, চীনের প্রতি বর্বর হওয়ার জন্য ফ্র্যাঙ্ক অ্যাণ্টনীর আহ্বানকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছেন, দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক যুদ্ধের শোচনীয় পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য বারে বারে আবেদন জানিয়েছেন, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার নীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অবশ্য তাঁকে এবং তাঁর মতো আরও অনেককে কাজ করতে হচ্ছে এখন, এক পরিস্থিতিতে যখন দেশের ভিতরে উগ্র প্রতিক্রিয়াশীলেরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে। ফলে শান্তিকামী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাজ দুরূহ হয়েছে। কিন্তু এটা ঘটেছে চীন সরকারের ভ্রান্ত নীতির দৌলতে। রাসেল কিন্তু চরম প্রতিক্রিয়াশীল এবং জওহরলাল নেহরু ও অন্যান্য সুস্থ শক্তির মধ্যেকার পার্থক্যটিকে ধর্তব্য বিষয় বলে মনে করেন নি। আর চীনের পক্ষ থেকে 'পিপলস ডেইলি'র পাতায় ও পিকিং রেডিওতে দিনের পর দিন যে বিষোদ্গার ও উৎকট কুৎসা রটনা করা হয়েছে সেটিও তাঁর নজরে পরে নি।

চীন যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে নিঃসন্দেহেই বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। কোনও বিজয়ী শক্তির পক্ষ থেকে এমন ঘটনা, বিশেষত সৈন্য প্রত্যাহার তর্কাতীতভাবেই অভূতপূর্ব ও অত্যন্ত তাৎপর্যসম্পন্ন। কিন্তু সামরিক সংঘর্ষ না হওয়াটাই ভালো ছিল না কি? আর ভারত যদি আক্রমণকারী হয়ে থাকে তবে চীনা পক্ষকে কেন সৈন্য প্রত্যাহার করতে হল? কেনই বা চীন কোনোরকম সালিশী বা তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মানতে একেবারেই রাজী নয়? কলম্বো প্রস্তাব সম্পর্কে গোড়ায় 'ইতিবাচক সাড়া'র কথা প্রচার করার পর ভারত সরকার যখন ঐ প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করলেন, তখন চীন কেন তা কার্যকরী করতে গররাজী? (রাসেল তো ভারত সরকারকে তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মেনে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।) এ-ক্ষেত্রে কপটতার দোষে কে দুষ্ট? এ-সব বিষয় ও তথ্য রাসেলের নজরে না পড়াটা নেহাৎই অপ্রত্যাশিত।

ছয়

রাসেলের এমন বিভ্রমের অবশ্য কারণ আছে। তিনি সমস্ত সমস্যাটির মতাদর্শ ও রাজনীতিগত দিকটিকেই অবহেলা করেছেন। তাঁর মতে "কোনো

মতাদর্শগত কারণে নয়, শুধুমাত্র কতকগুলি অঞ্চলগত প্রশ্নে চীন ও ভারতের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে।" (পৃঃ ৬৫) অথচ ব্যাপারটি হল ঠিক এর বিপরীত। এই বিরোধের মূল অতীতের ম্যাপ বা ইতিহাসের মধ্যে নেই; এর মূল রয়েছে ভারত সরকার, সরকারের নীতি ও দেশের ভিতরে বিভিন্ন শ্রেণী ও রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস সম্পর্কে চীনা নেতৃবৃন্দের ভ্রান্ত রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত বিচারের মধ্যে। আর এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, যুদ্ধ, শান্তি ও অন্যান্য মৌলিক সমস্যাবলী সম্পর্কে চীনা নেতৃবৃন্দের মতান্ধতা। আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতির অনুসরণ যে সমাজতান্ত্রিক দেশের পররাষ্ট্রনীতির সাধারণ নীতি, এ-কথাটাই চীনা নেতাদের চিন্তা-চেতনা ও কার্যকলাপে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। আর এরই দরুণ শুধু যে চীন ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক শত্রুতামূলক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে তাই নয়, কোনও পক্ষ অবলম্বন না করে এই বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আবেদন করাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও চীনা সমালোচনার লক্ষ্যবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত-চীন সীমান্ত-সমস্যার এই মূলগত মতাদর্শগত দিকটি উপলব্ধি করতে রাসেল সম্পূর্ণভাবেই অপারগ হয়েছেন।

কিন্তু এই সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য, এই ধরনের স্থানীয় যুদ্ধের মধ্যে যে বিপদ নিহিত রয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ তীব্রতর হওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে, এ-রকমের কোনো সংঘর্ষে নিউক্লীয় শক্তিগুলির জড়িয়ে পড়বার ভয় রয়েছে—সেদিকে রাসেল অত্যন্ত সঠিকভাবেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উপরন্তু ভারতের মতো সদ্যস্বাধীন উন্নয়নকামী দেশে যুদ্ধের হিষ্টিরিয়া তৈরি ও সামরিক সাহায্যের জন্য আমেরিকা বা ব্রিটেনের উপর নির্ভরশীলতা যে গোষ্ঠী-বহির্ভূত নীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, গণতন্ত্র ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের পক্ষে চরম বিঘ্নস্বরূপ, সে সম্পর্কেও তিনি সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এসবের উপরে রয়েছে আজকের উত্তেজনাপূর্ণ জগতে সংযম, সুস্থ বিবেচনা ও শান্তির জন্য তাঁর যুক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর। আর এ-কারণেই সকলের আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রশংসা তাঁর অবশ্য প্রাপ্য।

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাস

সি. এইচ. ফিলিপস্-এর সম্পাদনায় হালে প্রকাশিত ভারত, পাকিস্তান ও সিংহলের ঐতিহাসিকগণ (হিস্টোরিয়ানস্ অ ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যাণ্ড সিলোন)-এর একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে— ভারতীয় পণ্ডিতরা ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইংরেজরা যে পথ নির্দেশ করে গেছেন সে পথেই পরিক্রমায় ইচ্ছুক। ফলত যে সব ইতিহাস লেখা হয়েছে বা হ তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল।" বলা বাহুল এই মন্তব্যের সপক্ষে বহু ইতিহাস-গ্রন্থেরই নাম করা চলতে পারে—পরিচি অপরিচিত দুই-ই। বোধ করি বিখ্যাত পণ্ডিত ভিন্সেণ্ট স্মিথের মারাত্ম উক্তিই এর জন্যে খানিকটা দায়ী—"The history of India in th Muhammedan period must necessarily be a chronicle of kings courts or conquests, rather than one of national and soci evolution." উনিশ শতকের ইওরোপ বলতে যেহেতু কার্যত আম ইংলণ্ডকেই বুঝতাম, সেহেতু ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ও শাস তান্ত্রিক বিষয়বস্তুকে বেছে নেবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিংবা হয়তে রাজনীতি চর্চায় আমরা যেমন অগ্রসর হয়েছিলাম সামাজিক ও অর্থনৈতি ক্ষেত্রে ততটা নয়—এই সূত্রেও এই ঝোঁকের ব্যাখ্যা পাওয়া চলে। সামাজি ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যতটা আমরা স্বাধীন, স্বাবলম্বী হতে চেয়েছি, রা নীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মূল শর্ত হিসাবে তার থেকে অনেক বে চেয়েছি। বাস্তবিক, রাজনৈতিক কার্যাবলীকেই সর্বদা শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া আমাদের ইতিহাস চর্চার নয়, জাতীয় আন্দোলনেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য)।

কিন্তু স্মরণীয়, ইংরেজ ভারত ইতিহাসবিদদের মধ্যে আমরা শুধু ভিন্সে স্মিথদেরই পাইনি। আশ্চর্যের বিষয় মোরল্যাণ্ড—যাঁর মুসলিম ভারতের কৃষি-ব্য

Contributions to Indian Economic History. Edited by Tapan R Chaudhuri ; Firma K. L. Mukhopadhyay. Calcutta, Rs. 8·00

(অ্যাগ্রারিয়ান সিস্টেম ইন মোসলেম ইণ্ডিয়া) এক স্মরণীয় ইতিহাস-কর্ম— আমাদের ঐতিহাসকদের উৎসাহিত করলেন না। অথচ তিনি বুঝেছিলেন ইতিহাসের মূল চাবিকাঠি অর্থনীতিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতেই পাওয়া যাবে এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কৃষি ও ভূমিরাজস্বই তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অবিচ্ছিন্ন রূপ চোখের সামনে থাকা দরকার। অবশ্য মোরল্যাণ্ড-এর প্রচেষ্টা তো দূরে থাক, রমেশচন্দ্র দত্তের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'ভারতের আর্থিক ইতিহাস' (দি ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া) কি আমাদের অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চায় উৎসাহিত করেছিল? অথচ বিশ শতকের গোড়াতেই এর প্রকাশকাল। এ-গ্রন্থ শুধু অর্থনীতিক ইতিহাস নয়, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের বড় হাতিয়ারও বটে। ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে রমেশচন্দ্র দত্তের এই আশ্চর্য প্রচেষ্টার ভূমিকা সর্বদা স্মরণীয়। একদিক থেকে এই গ্রন্থ এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এর স্থান গ্রহণ করার মতো গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নি—প্রায় দেড়শো বছরের ভারতবর্ষ এর পটভূমি।

সুখের বিষয়, স্বাধীনতালাভের পর থেকে অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চায় আমাদের উৎসাহ ক্রমবর্ধমান। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থাও হয়েছে। দিল্লীতে তো গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে যা শুধু অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চার জন্য। অবশ্যই আমাদের অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চার আরম্ভ-সূত্র রমেশচন্দ্র দত্ত। এবং তাঁর অতি মূল্যবান গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছি আমরা। অবশ্য তাঁর প্রতি আমাদের সমালোচনা মাঝে মাঝেই রূঢ় হয়ে যাচ্ছে—অনেক সময়েই তাঁর বক্তব্যের আসল তাৎপর্য না বুঝে আমরা সমালোচনা করছি। যেমন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের মন্তব্যাবলী নিয়ে। তাঁর মতে "Lord Cornwalli's Permanent Settlement of 1793 is the widest and most successful measure which the British nation has ever adopted in India." অনেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল বর্ণনা করে দেখাতে চেয়েছেন যে, রমেশচন্দ্রের এই উক্তি ভুল। কিন্তু রমেশচন্দ্রের কাছে মূল প্রশ্নটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না—ছিল "ইকনমিক ড্রেন"। তিনি দেখেছিলেন যে এই বন্দোবস্তের ফলে "ইকনমিক ড্রেন" অন্তত কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। এ ব্যাপারে দ্বিমত হবার কারণ নেই।

আধুনিক গ্রন্থকারও একথা স্বীকার করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যা হল তা "a set-back to the company's principle of collecting ever-increasing land-tax from the peasants."[১] অবশ্যই ইকনমিক ড্রেনের ওপর অত্যধিক মনসংযোগ-এর ফলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে কি কি কুফল ঘটতে পারে,—জমিদারদের হাতে কৃষকদের দুর্দশা কি ভাবে ঘটে এসব ব্যাপার তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু রমেশচন্দ্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তবু ঠিকই থাকে।

অবশ্যই রমেশচন্দ্রের সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই আছে, থাকাটাই স্বাভাবিক। জাতীয়-আন্দোলনের সময়ের মধ্যে বাস করে রমেশচন্দ্রের পক্ষে হয়তো অনেক সময়ই নৈর্ব্যক্তিকতা আনা সম্ভব হয় নি। তাঁর লেখায় মর‍্যাল বা নৈতিক প্রশ্ন বার বার দেখা দিয়েছে। তা ছাড়াও আরও সীমাবদ্ধতার কথা আধুনিক ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন।[২] সুতরাং নতুন করে অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চা শুরু হয়েছে—রমেশচন্দ্রই এ ব্যাপারে পুরোধা। এক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের সমালোচনা নিশ্চয়ই করা হবে কিন্তু একথা যেন আমরা না ভুলি যে, রমেশচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার অর্থনীতিক ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তেমনি মুসলমান যুগের জন্য আমাদের আরম্ভ মোরল্যাণ্ডে।

ইদানীং অর্থনীতিক ইতিহাসের চর্চা কোনদিকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ সংকলন-এর শেষ প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত তপন রায়চৌধুরীর রচনায়। তিনি যে গ্রন্থগুলির আলোচনা করেছেন, আরও সঠিক অর্থে চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন, তার পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ এখানে নেই—তবু বর্তমান লেখকের তার মধ্যে যে কয়টি গ্রন্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে তার এবং শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর প্রবন্ধটির ভিত্তিতে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এই নতুন অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গবেষণা মোনোগ্রাফিক। রমেশচন্দ্র দত্তের মত বিস্তৃত সময় ও পটভূমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন গ্রহণ করা হচ্ছে না। সমগ্র দেশ নয়, দেশের একটি অংশই

১। The Rise and Fall of the East India Company: Ramkrishna Mukherjee p. 238.

২। শ্রীযুক্ত অমলেশ ত্রিপাঠীর 'ট্রেড এ্যাণ্ড ফিন্যান্স ইন দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' দ্রষ্টব্য।

বেছে নেওয়া হচ্ছে গবেষণার জন্য বা অতি স্বল্প সময়কালের কয়েকটি সমস্যাকে নিয়ে লেখা হচ্ছে। শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী বলেছেন, ইতিহাসের অন্য শাখার গবেষণা, সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই উন্নতি। অবশ্যই এর সঙ্গে আছে "documentary exploitation of source material"—মৌলিক উপাদানের উৎসস্থানীয় দলিল-দস্তাবেজের বিশ্লেষণ। অবশ্যই এই বিশেষীকরণের ফলে অর্থনীতিক সম্পর্কের প্যাটার্ন সম্পর্কে পুরনো তর্কবিতর্ক চাপা পড়ে যায় নি। রমেশচন্দ্র দত্ত ও ডিগবি আলোচিত "এক্সপ্লয়টেশন"-এর প্রশ্ন অনেক আধুনিক অর্থনীতিক ইতিহাসেরই কেন্দ্রীয় সূত্র। অবশ্যই এই আলোচনা কোনো বিশেষ বিষয়কে নিয়ে। এবং গড়ন ও গাঠনিক পরিবর্তনের তাৎপর্যপূর্ণ খুঁটিনাটিগুলিও "significant minutea of structure and structural change', আধুনিক ইতিহাস-চর্চার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়। কোনো বিশেষ বিষয় বা স্বল্প সময়কাল অথবা কোনো বিশেষ প্রদেশকে কেন্দ্র করে এই অর্থনীতিক ইতিহাস-চর্চায় আমাদের জ্ঞান নিখুঁত হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বিস্তৃত পটের চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে না কি? রমেশচন্দ্র দত্ত যেমন ব্যাপক সময় ও গোটা দেশকেই তাঁর গ্রন্থে ধরতে চেয়েছিলেন—দোষত্রুটি সত্ত্বেও তার অন্যমূল্য নিশ্চয় আছে। এই পটের চেতনা যদি না থাকে তাহলে অক্লান্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র অর্থনীতিক ইতিহাস বলার যে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে তাতে হয়তো একাডেমিক অর্থে অর্থনীতিক ইতিহাস রচিত হচ্ছে, নিশ্চয় তার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু শেষ লাভ বড়ো একটা হচ্ছে না। বাস্তবিক ইতিহাসের কারবার সমাজে ব্যক্তিকে নিয়ে—এবং যিনি যেখানে অক্লান্ত পরিশ্রমে ইতিহাসের নতুন দিক আলোকিত করছেন তার শেষ কথা কিন্তু সে যুগের সমাজের চেহারাকে স্পষ্ট করা। মনোগ্রাফ রচনা করার সীমাবদ্ধতা এখানেই। সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ও অর্থনীতির মিলনেই তা সম্ভব। মার্কসের নির্দেশিত পথও এটাই। তৃতীয়ত, ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত নিঃসন্দেহেই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিক ইতিহাসবিদদের অধিকাংশই শুধুমাত্র ব্রিটিশদের আগমন ও শাসনের ফলাফল নিয়েই ব্যস্ত আছেন—তাও সারা সমাজে কী হল তা নয়—কতকগুলি শিল্প কিভাবে ভেঙে গেল, খুব সংকীর্ণ অর্থে কতকগুলি অর্থনীতিক বিষয় প্রভৃতি

নিয়ে। অথচ ভারতীয় সমাজের ভিতর থেকে কোনো তাগিদ ছিল কিনা, সেখানকার অবস্থা কী,—এসব আলোচনা অনেকটা অবান্তরের মতোই উপেক্ষিত। অবশ্যই দু'একজনের লেখায় এই সমস্যা আলোচিত হয়েছে। যেমন রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর "দি রাইজ এ্যাণ্ড ফল অব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।" এবং এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতীয় সামন্ততন্ত্র, ভারতীয় বুর্জোয়াজির দুর্বলতা প্রভৃতির চমৎকার আলোচনা করেছেন তিনি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উত্থান-পতনকে ইংলণ্ডের ইতিহাস ও সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন—বৃহত্তর ইতিহাসের পটে তাকে স্থাপন করেছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ইতিহাস তাঁর বিষয়বস্তু নয়—ফলে কয়েক জায়গায় তাঁর মন্তব্য যেমন উপযুক্ত তথ্যসমৃদ্ধ নয়, তেমনি কয়েকটি অসতর্ক সামান্য সিদ্ধান্ত পীড়াদায়ক।

শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী যে কয়টি গ্রন্থের আলোচনা করেছেন, তা হল— ১। দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অ্যাণ্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল ফ্রম ১৭০৪ টু ১৭৪০—এস. ভট্টাচার্য। ২। ইকনমিক হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল ফ্রম পলাশী টু পার্মানেণ্ট সেট্‌লমেণ্ট—(১ম খণ্ড) এন. কে. সিনহা (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হয়েছে।) ৩। জন কোম্পানি অ্যাট ওয়ার্ক—হোল্ডেন ফার্বার ৪। ইকনমিক ট্র্যানজিশন অব বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী—এইচ. আর. ঘোষাল (১৭৯৩—১৮৩৩)। ৫। ট্রেড এ্যাণ্ড ফিন্যান্স ইন দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী (১৭৯৩—১৮৩৩)—এ. ত্রিপাঠী। ৬। ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অব অন্ধ্র প্রদেশ—এ. ভি. রমন রাও। ৭। ইকনমিক কণ্ডিশনস ইন দি ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সী—এ. সরদা রাজু। ৮। ইকনমিক হিষ্ট্রি অব দি বোম্বে, ডেকান অ্যাণ্ড কর্ণাটক (১৮১৮—১৮৬৮)—আর. ভি. চোকিস। ৯। ল্যাণ্ড রেভেনিউ পলিসি ইন দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস আণ্ডার ব্রিটিশ রুল—বি. আর. মিশ্র। ১০। স্টাডিস ইন ইণ্ডো-ব্রিটিশ ইকনমি হাণ্ড্রেড ইয়ারস এগো—এন. সি. সিনহা। ১০। দি রাইজ অ্যাণ্ড ফল অব দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি— আর. কে. মুখার্জী। ১১। অরিজিনস অব দি মডার্ন ইণ্ডিয়ান বিজনেস ক্লাস — অ্যান ইণ্টারিম রিপোর্ট - গ্যাডগিল (মাইমিওগ্রাফড)। ১২। দি ইংলিশ ইউটিলিটারিয়ানস অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া—এরিক স্টোকস। ১৩। ইনভেস্টমেণ্ট ইন্ এম্পায়ার—ব্রিটিশ রেলওয়ে অ্যাণ্ড স্টীম শিপিং এণ্টারপ্রাইজ ইন ইণ্ডিয়া (১৮২৫ —১৮৪৯) ড্যানিয়েল থর্নার। এই গ্রন্থতালিকা আমাদের মন্তব্যকেই সমর্থন করে।

এই সংকলনের প্রথম প্রবন্ধ ইরফান এম. হাবিব-এর ব্যাঙ্কিং ইন্ মুঘল ইণ্ডিয়া। শ্রীযুক্ত হাবিব-এর লেখার সব থেকে বড় গুণ যে তাতে রিসার্চ-এর গাম্ভীর্যও যেমন বিগুমান, তেমনি নতুন চিন্তা—প্রচলিত মতকে খণ্ডন, নতুন ভাবে ইতিহাস রচনা করার অভীপ্সা—পাঠককে চমৎকৃত করে। এই প্রবন্ধে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় "…Mughal India had developed 'money economy' to a considerable extent" এবং "there existed a brisk market in commercial paper, a system of insurance and the rudiments of deposit banking." অবশ্য ভারতবর্ষে মুসলমান যুগে "মানি ইকনমির" বিকাশ অনেকখানি ঘটেছিল—এই কথা আগেও বলা হয়েছে। যেমন এ. কে. নাজমুম করিম বলেছেন তাঁর 'চেঞ্জিং সোসাইটি ইন্ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান'-এ। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে মুশকিল হয়েছে যে তিনি শুধু মন্তব্য করেই ছেড়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত তিনি এর মূল মুসলমান শাসকদের মধ্য এশিয়া থেকে পাওয়া, "largescale use of money"-র সঙ্গে পরিচিতিতে খুঁজেছেন। শ্রীযুক্ত হাবিব যথার্থ ইতিহাসবিদের মতো এই মতকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন—Sarraf-দের কার্যাবলীর সূত্রে। Sarraf-দের সম্পর্কে প্রবন্ধের গোড়ার দিকে মন্তব্য করেছেন যে "with all the "dissolving influence" that money is said to possess, the profession of the Sarraf has not escaped the tentacles of the Indian caste system and has been monopolised by the members of a few mercantile castes". বোধ হয় এই মনোপলি মুঘল যুগেও ছিল। "Testing and Changing money" ছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীর Sarraf হুণ্ডির ব্যাপারেও মূল ব্যক্তি। সতেরো শতকে বাণিজ্যের যে উন্নতি ঘটেছিল তার অন্যতম প্রমাণ বীমাব্যবস্থার বিকাশ—এক্ষেত্রেও বীমাকারী ছিল Sarraf-বৃন্দ। আধুনিক ব্যাঙ্কব্যবস্থার সার কর্ম টাকা ঋণ দেওয়া ও গচ্ছিত রাখা। মুঘল যুগে অন্তত কিছু Sarraf এই দ্বিবিধ কর্মই করতেন। অবশ্য Sarraf-রা ব্যতীত অর্থঋণের ব্যাপারে আরও ঋণদানকারী ছিল—যেমন মহাজন, সাহুকার ইত্যাদি। আলোচনার শেষে শ্রীযুক্ত হাবিব একটি তত্ত্বগত সিদ্ধান্তে পৌচেছেন* যে আর্থিক সংগঠনের উন্নতি এবং টাকার ব্যাপক ব্যবহারের ফলই ধনতন্ত্র নয়।

* লক্ষণীয় ইরফান হাবিব তত্ত্ব থেকে তথ্যে আসেন নি—বাস্তবকে বিশ্লেষণ করার পরেই তত্ত্বে এসেছেন।

মুঘল যুগে ব্যাঙ্কব্যবস্থা তৎকালীন বাণিজ্যব্যবস্থার প্রয়োজনানুযায়ীই বিকশিত হয়েছিল—এই বাণিজ্য মূলত অপরিবর্তনীয় হস্তশিল্প (হ্যাণ্ডিক্রাফট) উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আসলে ব্যাঙ্কারদের মূলধন, যা কোনো উদ্যোগে নিযুক্ত ছিল না, আসলে ছিল ব্যাপারী পুঁজি "মার্চেণ্ট ক্যাপিটাল।" ফলত উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর এর কোনো প্রত্যক্ষ হাত ছিল না। শ্রীযুক্ত হাবিব তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন মার্কসের উধৃতি দিয়ে, যার শেষ কথা, "The Independent development of Merchant Capital stands therefore in an inverse ratio to the general economic development of society."

সংকলনের পরবর্তী প্রবন্ধ সুলেখচন্দ্র গুপ্ত-র আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমের "সিডেড ও কঙ্কারড্ প্রভিন্সের" গ্রামসমাজ (ভিলেজ কম্যুনিটি) প্রসঙ্গে। উপরি উক্ত সময়ে গ্রামসমাজ বা ভিলেজ কম্যুনিটি ছিল বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়ের মিশ্রণে তৈরী। অবশ্যই এই সময়, বিভিন্ন অধিকার ও সুবিধা কেবল জাতি বা বর্ণের সূত্রে বিবেচিত হত না। গ্রামের এই বিভিন্ন দলের জীবনে অবশ্যই ঐক্য এনে দিয়েছিল কতকগুলি অর্থনীতিক সম্পর্ক। যেমন জনসাধারণের জমি ও তার উৎপাদনের ওপর সাধারণ অধিকার ইত্যাদি। গ্রামসমাজের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এর স্বয়ং-সম্পূর্ণতা। এর কারণ, গ্রামসমাজে শুধু কৃষকরা নয় অ-কৃষি উৎপাদনের জন্য কারিগর "আর্টিজান"রাও ছিল। এবং শেষোক্তরা সমগ্র গ্রামসমাজের জন্যই কোনো বিশেষ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তাদের পেশা সাধারণত জাতি-বর্ণের ভিত্তিতেই উত্তরাধিকার সূত্রে নিরূপিত হত। গ্রামসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর স্থায়িত্ব এবং শক্তি। অবশ্যই এই সব বৈশিষ্ট্য অন্তত অংশত ভারতীয় রাজস্ব ব্যবস্থার ফল। প্রাথমিক ভাবে এই মন্তব্যের পর শ্রীযুক্ত গু বিস্তৃতভাবে গ্রামসমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—এর শ্রেণী বিন্যাস অর্থনীতিক সম্পর্ক, কেমন ভাবে রাষ্ট্রের দাবি গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দে প্রভৃতির বাস্তবনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় এ-প্রবন্ধ উজ্জ্বল। স্বল্প পরিস হলেও কী ভাবে পরিবর্তন গ্রামসমাজে এলো, ও গ্রামের ওপর মধ্যবর্তী শ্রেণী (intermediaries) প্রভাব চমৎকার আলোচিত হয়েছে এ প্রবন্ধে।

শ্রীসুলেখচন্দ্র গুপ্ত তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, "During the later years of Mughal rule, a process of defeudalization (

was taking place and the British rule intervened before the process was completed." কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র দুর্বল হতে শুরু করে চোদ্দ শতক থেকে। এবং এই আঘাত শাসক-শক্তির দিক থেকেই এসেছিল। আলাউদ্দিন খলজির আমল থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। শের শাহের পর থেকে এই প্রক্রিয়া আরও স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। আকবরের হাতে তা আরও দ্রুতভাবে ঘটতে থাকে। এ ব্যাপারে শের শাহের ভূমি রাজস্ব সংগ্রহে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন স্মরণীয়। তিনি কৃষকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং ভূমিরাজস্ব নির্ধারণে গ্রামের প্রধানের (headman) ক্ষমতাও তিনি হ্রাস করেন অর্থাৎ গ্রামসমাজের ক্ষমতারই অবনতি ঘটে। শুধু তাই নয় শের শাহ গ্রামপ্রতিনিধি এই "হেডমেন"দের দায়িত্ব গ্রামসভা নয় সরাসরি রাষ্ট্রের কাছে ন্যস্ত করেন। আকবর এই প্রক্রিয়াকেই পূর্ণতা দেন। শুধু তাই নয়, গ্রামসমাজের স্থায়িত্ব সম্পর্কে মার্কসের উক্তি নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে মুঘল বিজয় গ্রামীন অর্থনীতিতেও বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনার কাজ আরম্ভ করেছিল। অবশ্যই শ্রীসুলেখচন্দ্র গুপ্তর আলোচনা একটি বিশেষ সময় (অর্থাৎ যখন মুঘল শাসন দুর্বল) ও একটি বিশেষ স্থলকে (অর্থাৎ উত্তর প্রদেশকে) কেন্দ্র করে রচিত। তবু উপরি উক্ত এই সাধারণ মন্তব্য এই স্থানকালে প্রযোজ্য কিনা তা নিশ্চয়ই বিবেচ্য।

সংকলনটির তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধ যথাক্রমে জগদীশ রাজ লিখিত অযোধ্যায় তালুকদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন (দি ইণ্ট্রোডাকশন অব দি তালুকদারি সিস্টেম ইন্ আয়ুধ") এবং বি. এম. দন্তিয়ার ১৮৮৮ ভারতীয় কৃষিজীবীদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান (এ্যান এনকোয়ারী ইন্ টু দি কণ্ডিশনস অব দি এগ্রিকালচারাল ক্লাসেস ইন ইণ্ডিয়া ১৮৮৮) দুটি প্রবন্ধই মোটামুটি বর্ণনাত্মক। প্রথম প্রবন্ধটিতে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসকদের অর্থনীতিক নীতি কী রূপ পেল, রাজনৈতিক মিত্র সৃষ্টির চেষ্টায় তালুকদারদের ভূমির ওপর অধিকার দেওয়া হল রায়তদের অধিকার উপেক্ষা করে প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যদিও ১৮৫৭-র পূর্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফলে সন্তুষ্ট না হয়ে অযোধ্যার সরকারী ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর কৃষকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের কথাই ব্রিটিশ শাসক ভেবেছিল। এই প্রবন্ধের লেখক যদি প্রবন্ধের শেষে যে মন্তব্য করেছেন —(the conciliation of the taluqdars was also achieved, at the

expense of other classes of society in Oudh) তার যদি আর একটু বিস্তৃত আলোচনা করতেন তাহলে ব্রিটিশনীতি সমগ্র সমাজে কী দুর্দশা আনল তা বোঝা যেত। বি. এম. দন্তিয়া লিখিত দ্বিতীয় প্রকল্পটির মূল্য বহুদিন গোপনে রাখা লর্ড ডাফরিনের ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের "এন্‌কোয়ারী"র গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় দানে। এই সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই উনিশ শতকের শেষে গ্রামীন দারিদ্র্য এবং কৃষকসমাজের বস্তুনিষ্ঠ চিত্রও উপস্থিত করা হয়েছে। বর্ণনাত্মক হলেও শ্রীজগদীশ রাজ ও শ্রীদন্তিয়ার প্রবন্ধ দুটি মূল্যবান্।

পরের অর্থাৎ পঞ্চম প্রবন্ধে রাশিয়ার শ্রীযুক্ত কোমারভ্, বিপ্লব পূর্ব ও বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় ভারতীয় অর্থনীতিক ইতিহাসচর্চার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। মোটামুটি ভাবে ভারতীয় অর্থনীতি চর্চার শুরু আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রারম্ভে। এই সময় সাধারণত বিষয় হিসাবে রাশিয়া ও ভারতের বাণিজ্যই আলোচ্য ছিল। রুশ পণ্ডিতরা উপনিবেশিক শোষণের ফলে ভারতে যে অর্থনীতিগত পরিবর্তন এলো সে সম্বন্ধেও চিন্তা শুরু করেন। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে Saltykov ও Rotchev ভারতের হস্তশিল্পের ধ্বংস ও ব্রিটিশ পণ্যের বাজারে পরিণতির চিত্র আঁকেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনীতিক বিকাশও রাশিয়ার ইতিহাসবিদ্‌দের আকর্ষণ করে। ১৮৫৭-৫৯-এর বিদ্রোহের ওপর কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়। এই উনিশ শতকের শেষেই রাশিয়ার গ্রামসমাজের ভবিষ্যৎ ও কৃষিসমস্যাই রুশ ঐতিহাসিকদের অন্যান্য দেশের কৃষি সম্পর্কের অধ্যয়নে উৎসাহিত করে—তার মধ্যে ভারতবর্ষও একটি দেশ।

বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার এই ভারতীয় অর্থনীতিক ইতিহাসচর্চা আরও বিস্তৃত হয় সোভিয়েত পণ্ডিতদের হাতে। সোভিয়েত ভারতবিদ্‌দের দ্বারা আধুনিক ভারতের ইতিহাসের নিয়মিত চর্চা এবং উচ্চ শিক্ষায় এর পঠন-পাঠন শুরু হয় এ-শতাব্দীর কুড়ির দশকের শেষের দিকে। এই চর্চার পিছনে আছে চিরপরিচিত উপনিবেশ (ক্ল্যাসিক কলোনি) হিসাবে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব, অন্যদিকে ভারতীয় জনসাধারণের স্বাধীনতাসংগ্রামের জন্য নিবিড় সহানুভূতি। আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য অবদান I. M. Reusner (১৮৯৯-১৯৫৮) যিনি সোভিয়েত স্কুল অন্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রির মূলে। জীবনের শেষের দিকে তিনি মনোনিবেশ করেন সতেরো ও আঠেরো শতকের ওপর

এবং আধুনিক কালের প্রারম্ভে ভারতের সামাজিক অর্থনীতিক অবস্থাই তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এই বিষয়ে আরো অনেকেই লেখেন। তাঁদের মূল বক্তব্য: ব্রিটিশ শক্তির জয়লাভের পূর্বে ভারতবর্ষ উন্নত সামন্ততন্ত্রের স্তরে ছিল। কিন্তু সমাজ অচল হয়ে পড়ে নি, সামাজিক-অর্থনীতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছিল। Reusner ও তাঁর ছাত্রদের মতে শিল্পোৎপাদকের (মার্কস যে অর্থে ব্যবহার করেছেন সেই অর্থে) বীজ ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে ভারতীয় হস্তশিল্পে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শ্রীযুক্তা আন্তোনোভা তা স্বীকার করেন না। বস্তুত ভারতে সামন্ততন্ত্রের ভাঙন, ধনতন্ত্রের বিকাশ (কলোনিতে), জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের সমাজ ও অর্থনীতিগত পটভূমি প্রভৃতি সোভিয়েত ভারতবিদদের উৎসাহ স্থল। এবং ইংলণ্ডে ধনতন্ত্রের বিকাশের পটভূমিতে ভারতে উপনিবেশিক শোষণও তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আঠেরো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা আলোচিত হয়েছে একটি সংকলনে আরও অনেকের রচনায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের সমস্যা নিয়েও আলোচনা চলছে। এই আলোচনায় ব্রিটিশ মূলধনের একচেটিয়া যুগে আসা, ভারতের মজুর শ্রেণী ও বুর্জোয়াজির গঠন প্রভৃতি সমস্যা আলোচিত হচ্ছে। অন্যদিকে আছে সামন্তব্যবস্থার ক্রম ভাঙ্গন, জমিদার কৃষকদের সম্পর্ক প্রভৃতি সমস্যার আলোচনা। অবশ্যই সামাজিক-অর্থনীতিক বিকাশ সোভিয়েত পণ্ডিতরা জাতীয় আন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামের সূত্রেই বিচার করছেন। সামন্ততন্ত্রের ভাঙন ও ধনতন্ত্রের আবির্ভাবই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সচেতন ও সংগঠিত গনসংগ্রামের জন্ম দিয়েছে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে। অবশ্য নতুন বিরোধেরও শুরু এইখানে। আধুনিক ভারতবর্ষের অর্থনীতিক ইতিহাসচর্চার এই ব্যাপক প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ, ১৯৬০-এ রুশ ভাষায় 'আধুনিক যুগের ভারত ইতিহাস' সংকলন গ্রন্থ। এখানে একটি কথা স্মর্তব্য ; সোভিয়েতে এই ভারতীয় ইতিহাসের চর্চায় ভারতীয় মাত্রেই আনন্দিত হবেন, কিন্তু মুস্‌কিল হচ্ছে যে প্রায় সবই রুশ ভাষায় লেখা। অথচ এখানে রুশ ভাষা অভিজ্ঞ পাঠক সংখ্যায় অল্প—ফলে গবেষণা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত কোমারভদের ইংরেজি অনুবাদে ছোট প্রবন্ধ পাঠেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। যতক্ষণ এসব রুশ লেখা মূলে বা অনুবাদে ভারতীয় বিদ্বানরা পড়তে না পারছেন ততক্ষণ এসবের সত্যকার মূল্য স্থির ও সমাদর হবে না।

পরের প্রবন্ধে Ignacy Sachs বলেছেন যে অনুন্নত অর্থনীতি সমন্বিত দেশগুলির বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকাই তাদের চরিত্রের বিশিষ্ট জটিল প্যাটার্ন ফলত তাদের উন্নতির প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এবং অর্থনীতিক বিকাশের চর্চার ঐতিহাসিক পদ্ধতি বা হিস্টরিক্যাল অ্যাপ্রোচের ওপর জোর দেন তিনি। প্রবন্ধের গোড়াতেই প্রবন্ধকার জানিয়েছেন যে অনুন্নত দেশগুলির সামাজিক অর্থনীতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা বহরে যদি বা মন ভোলায়, গুণে নয়। প্রথমত, এই সবদেশ থেকে খুব অল্পই আলোচনা আসছে। এবং উন্নত দেশে যে চর্চা হচ্ছে তাতে পশ্চিমীভাব বা ওয়েস্টার্নিইজম-এর বোঝা কিছুতেই নামছে না।[৩] তারপর শুদ্ধ অর্থনীতি ও ফলিত অর্থনীতি নিয়ে যে মানসিক বিশৃঙ্খলার স্বরু হয়েছে তাতে এদের একটির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ প্রায় ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। আসলে বর্ণনাত্মক মনোগ্রাফ যেমন অন্যদিকে প্রচুর, তত্ত্বগত বিশ্লেষণ তেমনি স্বল্প। অনেকক্ষেত্রেই অধিক মাত্রায় তথ্যাধিক্য যুক্ত লেখায় আসল সমস্যাও হারিয়ে যাচ্ছে। শুদ্ধ ও ফলিত উভয় অর্থনীতিই ভুগছে এক রোগে অর্থাৎ "a methodological under-estimation of the institutional aspects of the socio-economic process, seen both from a historical and sociological angle." এই ঝোঁকই প্রতিফলিত পলিটিক্যাল ইকনমির জায়গায় ইকনমিকস শব্দটি ব্যবহারে। অথচ পলিটিক্যাল শব্দটি দুটো পদ্ধতিগত ইঙ্গিত বহন করে।—এক, মানবসমাজের অর্থনীতিক সঠিক মূল্যায়নে প্রতিষ্ঠানগত প্রকাশ বা 'ইনিষ্টিটিউশনাল আসপেক্টস'-এর গুরুত্বের। দুই, এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রথামত আলোচনা বর্জনের প্রয়োজনীয়তার। বিকাশ প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠানগত বিশ্লেষণেই শুদ্ধ ও ফলিত অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান ফারাক জোড়া যাবে।

"A first step from the multiplicity of concrete situations to the singling out of certain developmental patterns would be a proper classification of the countries involved according to the degree of development."---Ignacy Sachs কী ভাবে ও কখন অনুন্নত দেশগুলি স্বাধীন হলো ও অর্থনীতিক তাদের কতটা—তার ভিত্তিতে তিনটি ভাগ করেছেন—(ক) জাতীয় মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেসব দেশ সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথে এসেছে। (খ) বাইরের শক্তির ফলে বা উপনিবেশিকতার সাধারণ প্রক্রিয়াতে যে সব দেশ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে—যদিও বহিঃপ্রভাব থেকে মুক্ত নয়, অন্যদিকে যাদের ইচ্ছা প্রুশীয় বা জাপানি ঢঙের ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে যাওয়া। (গ) শক্তিশালী জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের ফলে যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং যারা কল্যাণরাষ্ট্র (ওয়েল ফেয়ার স্টেট) ও সমাজতান্ত্রিক দেশ—উভয় দেশের পরিকল্পিত অর্থনীতির

৩। এ-প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সমাজ-অর্থনীতির সূত্রে ভ্যানলিয়র ও বুয়েক-এর আলোচনা স্মরণীয়।

দ্বারা প্রভাবিত। এই তৃতীয় গ্রুপেই এশিয়া-আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ যাদের জন্ম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর।

এ ছাড়াও Ignacy Sachs অন্য ভিত্তিতেও দেশগুলিকে ভাগ করেছেন যেমন পুরাতন ও নতুন। দ্বিতীয়োক্তদের দেশে প্রায় পুরোপুরি ধনতন্ত্রই বহাল হয়েছে (যেমন ইউনাইটেড স্টেটস, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড)। প্রথোমক্ত দেশে আছে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে সংস্পর্শে আসা ও তার ফলে—ভারসাম্যহীন ও জটিল কাঠামোর সৃষ্টি। বড় ছোট এই ভিত্তিতেও প্রবন্ধকার অনুন্নত দেশগুলোকে ভাগ করেছেন। এই জটিল কাঠামো ব্যাখ্যায় দুটি পদ্ধতি প্রচলিত (১) বর্তমান মার্কসীয় বিশ্লেষণের দ্বারা ও (২) ডুয়াল ইকনমিকস ও ডুয়াল সোসাইটির তত্ত্বতে (বুয়েক)। Ignacy Sachs দ্বিতীয়টিরও গুরুত্ব স্বীকার করেন। এবং "the purposiveness of a dynamic analysis of composite structures and the relevance of transitory stages"—তিনি মানেন। তাঁর মতে "a useful distinction is that between exogenous and endogenous patterns of development." শুধু তাই নয়, তিনি আরও বলেন "I propose now to deal succinctly with mutual influences of patterns of development in countries in different socio-economic stages. এবং এই সূত্রেই বুঝি অনুন্নত দেশের জনসাধারণ শিল্পবিপ্লবের ব্রিটিশ মজুরের বা মেইজি যুগের জাপানি কৃষকের দুর্দশা সে চায় না ; তার ওপর সোভিয়েট শিল্প তাদের প্রভাবিত করেছে। অর্থনীতিক ভাবেও তারা, আজকের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে এক পরিবেশে নেই। সেইজন্যই এরা নানা 'স্টেট্ ক্যাপিটালিজম'-এর দিকে ঝুঁকেছে।

এই প্রবন্ধটি নানা দিক থেকেই মূল্যবান—বারো পৃষ্ঠার এতো আঁটসাঁট লেখা যে, সারাংশ সঙ্কলন করা মুস্কিল। ভারতের প্রথম অর্থনীতিক ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন—Economic laws are the same in Asia as in Europe. নিরঙ্কুশ ভাবে বুঝলে দেখা যাচ্ছে কথাটা তা নয়। কারণ অসমান বিকাশ ও বিচিত্র জীবনযাত্রাও ইতিহাসের স্বীকৃত সত্য। এশিয়ার যার অধিকাংশই অনুন্নত দেশ, জটিল সমাজকাঠামোকে বুঝতে গেলে তাই ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিক পদ্ধতির মিলন ঘটানো দরকার। এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করলে Ignacy Sachs-এর সঙ্গে অভিন্ন মত হতে হয়। ভ্যানলিয়র তো প্রাচ্যের ইতিহাসচর্চায় আলাদা ক্যাটেগরির কথাই বলেছেন—যুগ-বিভাগ সম্বন্ধেও আমাদের ভাববার সময় এসেছে।

বিনয় ঘোষ

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র অর্থনৈতিক দৃষ্টি

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সবদিক থেকেই আধুনিক ছিল, কোনো ভেজাল ছিল না তার মধ্যে। আধুনিক কালোপযোগী ছিল, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ধনতান্ত্রিক যুগে অর্থনৈতিক মনোভাব যা হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেই মনোভাবই তত্ত্ববোধিনীর বিভিন্ন রচনায় ফুটে উঠত। এইজন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অর্থনীতিকে যুগধর্মী ও প্রগতিশীল বলা যায়। ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্ত্য দেশের মতো এদেশেও শ্রমশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের অবাধ অগ্রগতি হোক, এই ছিল তার কাম্য। কিন্তু এই কামনা বা উদ্দেশ্যকে স্বদেশের জনস্বার্থের প্রতিকূলে প্রশ্রয় দিতে কখনও সে সম্মত ছিল না। অর্থনৈতিক শোষণ ও দুস্তর ভেদ-বৈষম্যজনিত সামাজিক উৎপীড়ন তত্ত্ববোধিনীর কাছে সর্বদাই অন্যায় ও অধর্ম বলে ধিক্কৃত হত। এদেশের আলস্যপ্রিয় ঘরকুণো লোকের শিল্পবাণিজ্যবিমুখতা, অর্থসঞ্চয়ের প্রতি সুদখোর মহাজনী মনোবৃত্তি, দালালী প্রবৃত্তি ইত্যাদির কঠোর সমালোচক ছিল তত্ত্ববোধিনী। সবার উপরে উল্লেখযোগ্য হল দেশের জনসাধারণের প্রতি, বিশেষ করে অর্থনীতিক্ষেত্রের বঞ্চিত ও লাঞ্ছিতদের প্রতি তত্ত্ববোধিনীর গভীর সহানুভূতিশীল মনোভাব। ধনতান্ত্রিক যুগের বিজ্ঞানসম্মত শিল্পায়ন-নীতির সমর্থক হলেও তত্ত্ববোধিনীর চেতনা থেকে এই সামাজিক সুবিচারবোধ কখনও লোপ পায় নি। আধুনিকতার সঙ্গে মানবিকতার এই সংমিশ্রণ হল তার অর্থনৈতিক দৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলার গ্রাম্যসমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি রচনা* থেকেই এই জনদরদী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাটির নাম—পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা। ১৭৭২ শকে (১৮৫০ সাল) রচনাটি ধারাবাহিকভাবে তত্ত্ববোধিনীতে

* রচনাটি অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা বলে মনে হয়।

প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকাতেও এদেশের সাধারণ কৃষক-প্রজাদের আর্থিক দুরবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু যতদূর বর্তমান লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তাতে আর কোনো বর্ণনাই এত বাস্তব জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী বলে মনে হয়নি। আজকের দিনেও যদি কোনো উপন্যাসকাতর পাঠক শতাধিক বৎসর পূর্বের গদ্যভাষায় লেখা এই রচনাগুলি পাঠ করেন, তাহলে চলচ্চিত্রের মতো গত শতাব্দীর মধ্যভাগের বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকদের অত্যাচার-পীড়িত শোষিত জীবনের ছবি তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হবে যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে বিদেশী শাসকদের হাতে হাত মিলিয়ে এদেশী উপশাসকরা কিরকম নৃশংসভাবে কৃষকদের শোষণ ও পীড়ন করতেন। রচনার মধ্যে শুধু যে পর্যবেক্ষণশক্তি ও বিশ্লেষণনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, কালের বিচারে এমন সাহসেরও পরিচয় পাওয়া যায় যা এযুগের অতিপ্রগতিবাদী পত্রিকাতেও দুর্লভ। সংক্ষেপে তৎকালের অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌ভূমির পরিচয় দিয়ে এই রচনাগুলির প্রতিপাদ্যের বিবরণ দেব।

কেউ কেউ বলেন কর্নওয়ালিসের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের প্রশাসনব্যবস্থা ইংলণ্ডের ছাঁচে গড়ে তোলা—"to remodel the administration on English lines"—এই উদ্দেশ্যে তিনি আইনকানুন বিচারবিভাগ ইত্যাদির পরিবর্তন করেছিলেন এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement) প্রবর্তন করে ইংলণ্ডের মতো ভূসম্পত্তি ও ভূস্বামীশ্রেণীর সৃষ্টি করেন—"introduced an English form of landed property and created a class of landlords which was hitherto unknown in India."[১] কর্নওয়ালিস মনে করেছিলেন যে, ব্যক্তিগত মালিকানা স্বার্থ দ্বারা জমিদাররা অনুপ্রাণিত না হলে দেশের বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব হবে না। একথা আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। কোনো নূতন ব্যবস্থা, বিশেষ করে বিদেশী সমাজব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তন করার পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা নিয়ে কর্নওয়ালিস শাসনভার গ্রহণ করেননি, বরং প্রায় বিশ বছর ধরে তাঁর পূর্বগামীরা এখানকার গ্রাম্যসমাজের শাসনে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তিনি তারই উত্তরাধিকারী হয়ে এদেশে এসেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা তৎসম্পর্কিত কোনো ব্যবস্থা তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। তাঁর আগমনের অনেক আগে থেকেই কোম্পানির শাসকরা এদেশে ভূমিরাজস্বের বহুবিধ

ব্যবস্থা প্রবর্তন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পথ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কর্নওয়ালিস কেবল সেই পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাকা করার ব্যবস্থা করেছিলেন।[২]

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বিবরণপ্রসঙ্গে এই ইতিহাস-বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক নয়, শুধু উল্লেখটুকুই যথেষ্ট। প্রাসঙ্গিক হল, ১৮৫০ সালে এদেশের গ্রাম্য-সমাজের যে ভয়াবহ করুণ চিত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আঁকা হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পরের কথা। কর্নওয়ালিস অথবা কোম্পানির কর্মকর্তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনকালে গ্রাম্যসমাজের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাস্তব ঘটনাচক্রে স্বভাবতই তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। বাঙলার গ্রাম্যসমাজ চিরন্তন গোষ্ঠীগত আত্মনির্ভরতার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে, নূতন জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎপীড়নে প্রায় উৎসন্নে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কৃষকদের দুঃখদুর্দশার অন্ত ছিল না এবং পুরাতন বনেদী জমিদাররা অনেকক্ষেত্রে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার জটিল ও কঠোর নিয়মকানুন ধাতস্থ করতে না পেরে চিরকালের মতো ভূস্বামিত্বের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। বছরের পর বছর নূতন রাজস্ব-আইন ও নিলাম-আইনের চাপে বড় বড় পুরাতন জমিদারী খণ্ড খণ্ড হয়ে 'লাটে' উঠেছে এবং বনেদী ভূস্বামীরা নিজেদের পৈতৃক ভদ্রাসন থেকে পর্যন্ত উৎখাত হয়েছেন। আজও বাঙলার পুরাতন গ্রামে গ্রামে জঙ্গলাকীর্ণ জীর্ণ অট্টালিকার অস্থিপঞ্জরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই কলঙ্ককাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক দলিলপত্র হাণ্টার তাঁর Bengal MS. Record, 1782-1807 চার খণ্ডে সংকলন করেছেন। তিনি লিখেছেন, "In these four volumes of *Bengal Records*, I cite many hundred letters written at that disastrous period, and showing how the disintegration of estates went on in every District of Bengal."[৩] পুরাতন জমিদারবংশের উচ্ছেদ যে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে শুরু হয়েছিল তা নয়, তার অনেক আগে থেকেই ব্যাপকভাবে ইংরেজদের ইজারাদারি ব্যবস্থা (farming system) প্রবর্তনের ফলে হয়েছিল। কোম্পানির আমলে এই ইজারাদারির পরীক্ষা ইংরেজরা কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটির জমিদারী পাবার পর থেকে আরম্ভ করেছিলেন। কলকাতার হাট ঘাট মাঠ বাজার খাল বিল সবই তাঁরা ইজারা দিতেন এবং কলকাতা শহরে

এসে এদেশের লোক যাঁরা বিপুল ধনসঞ্চয় করেছেন তাঁদের মধ্যে এই ইজারাদাররা অন্যতম। কাজেই ইংরেজদের ইজারাদারি পরীক্ষার ইতিহাসই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে প্রায় একশত বছরের পুরাতন। কলকাতার বাইরে জমিদারীর ক্ষেত্রেও একবছর পাঁচবছর প্রভৃতি বিভিন্ন মেয়াদের ইজারার ভিতর দিয়ে অবশেষে তাঁরা চিরস্থায়িত্বের সিদ্ধান্তে এসে পৌছান (১৭৯৩)। বাংলাদেশে কোম্পানির রাজত্বকালকে এইদিক থেকে ইজারাদারদের স্বর্ণযুগ বলা যায়।

পুরাতন বনেদী রাজা-ভূস্বামীরা গ্রাম্যসমাজমঞ্চ থেকে বিদায় নেবার পর যাঁরা নূতন জমিদারের শিরোপা পরে মঞ্চে পদার্পণ করলেন তাঁরা এই ভুঁইফোঁড়-অভিজাত ইজারাদার-শ্রেণী। কর্নওয়ালিসের আগে থেকেই, কোম্পানির ইজারানীতির দৌলতে (১৭৬৯-১৭৮৮) বনেদীবংশের পতন ও ভুঁইফোঁড় ইজারাদারদের উত্থানপর্ব আরম্ভ হয়েছিল—"the effect of the farming system was to level down the ancient zamindars and to level up the revenue farmers into new zamindars"[৪] কার্ল মার্কস তাঁর ভারতীয় ইতিহাসের খসড়ায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফলের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, "greater part of the province's land holdings fell rapidly into the hands of a few city capitalists who had spare capital and readily invested it in land."[৫] মার্কস 'city capitalists' শুধু ইজারাদারদের কথা মনে করে ব্যবহার করেন নি বলে মনে হয়, তাদের সঙ্গে শহরবাসী বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দি দালাল গোমস্তা ব্যবসায়ী প্রভৃতি নূতন ধনিকশ্রেণীর কথাও তাঁর মনে ছিল। এই নূতন ধনিকশ্রেণীর কাছে জমিদারীও বাণিজ্যপণ্যের মতো লেনদেনের, স্পেকুলেশনের ও মুনাফার বস্তু হয়ে উঠল। বস্তুত কর্নওয়ালিসেরও উদ্দেশ্য ছিল তাই। এদেশের নূতন ধনিকশ্রেণীর সঞ্চিতধনের একটা গতি করা প্রয়োজন। জমিদারীতে নিরাপদ আয় এবং অতিরিক্ত মুনাফার সৃষ্টি করে কর্নওয়ালিস এদেশের নূতন বাণিজ্যলব্ধ মূলধনকে স্বাধীন শিল্পায়নের ক্ষেত্র থেকে সনাতন ভূসম্পত্তির দিকে পরিচালিত করেছিলেন। কোম্পানির ডিরেক্টরদের একটি চিঠিতে (৬ মার্চ ১৭৯৩) তিনি পরিষ্কার লিখেছিলেন, "the large capitals possessed by many of the Natives, which they will have no means of employing···will be applied to the purchase of landed property as soon as the

tenure is declared to be secure." * কাজেই জমিদারী যখন নূতন ইংরেজ-আইনে বাণিজ্যের পণ্য হয়ে উঠল, তখন তার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ বা কৃষকদের প্রতি গোত্রান্তরিত জমিদারদের সামান্য মানবিক মমত্ববোধটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেল। বেনিয়ানী দালালী ও ইজারাদারির মুনাফা থেকে যাঁরা জমিদারী কিনতে লাগলেন তাঁরা বেশীরভাগ হলেন শহরবাসী 'absentee' জমিদার। গবর্নমেন্টকে নির্দিষ্ট রাজস্ব যোগান দিতে পারলেই তাঁদের দায় চুকে যেত, তারপর প্রজাদের উপর পীড়ন করে যত খুশি খাজনা, ট্যাক্স ইত্যাদি আদায় হত তার সবটাই মুনাফা। কিন্তু গ্রাম ছেড়ে শহরবাসী হলে খাজনার দায়িত্ব নেবে কে? বণিকবুদ্ধিতে এর সমাধান হল—মধ্যস্বত্বভোগী তৈরি করা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে গবর্নমেণ্টের কাছে জমিদাররা হলেন contractor এবং জমিদাররা নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ চালাবার জন্য একদল sub-contractor তৈরি করলেন। গবর্নমেণ্ট তাঁদের এই পরিকল্পনা ও দাবী আইনসঙ্গত উপায়ে মঞ্জুর করলেন। উপর থেকে জমিদারের চাপ এবং তার তলায় স্তরে স্তরে অসংখ্য মুনাফা-বুভুক্ষু মধ্যস্বত্বভোগীর চাপ—এইভাবে অসহনীয় এক শোষণযন্ত্রের চাপে বাংলার গ্রাম, গ্রাম্যসমাজ ও দরিদ্র কৃষকশ্রেণী ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল।

জমিদারদের পরবর্তী স্তরে পত্তনিদার দর-পত্তনিদার গাঁতিদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীরা ক্ষুদে জমিদারশ্রেণীতে পরিণত হলেন। হেস্টিংসের আমলে ১৭৭২ সালে বড় বড় জমিদার ও জমিদারীর সংখ্যা একশতের খুব বেশী ছিল না। কিন্তু তারপর চিরস্থায়িত্ব ও মধ্যস্বত্বের ফলে ১৮৭২ সালের মধ্যে জমিদারীর সংখ্যা বেড়ে দেড়লক্ষের বেশী হল। এর মধ্যে ৫৩৩টি হল বড় জমিদারী, ২০০০০ একরের উপরে, ১৫৭৪৭টি জমিদারী হল ৫০০-২০০০০ একরের মধ্যে এবং ৫০০ একর ও তার কম জমিদারীর সংখ্যা হল ১৩৭৯২০টি।[১] এই ক্ষুদে জমিদারীর সংখ্যাবৃদ্ধি থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎপাতের আধিক্য অনুমান করা যায়। 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' নীতি মধ্যস্বত্বভোগীরা গ্রাম্যসমাজে নির্বিচারে প্রয়োগ করেছেন এবং তার ফলে গ্রামের কৃষক-প্রজারা ধনেপ্রাণে উচ্ছন্নে গেছে, গ্রাম্যসমাজের গোষ্ঠীবদ্ধতাও ধ্বংস হয়েছে। পল্লীগ্রামের প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাংলার গ্রাম্যসমাজের এই ধ্বংসের চিত্রই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বর্ণনার মধ্যে অর্থনীতিক পশ্চাদ্‌ভূমির বিশ্লেষণ করা হয় নি বটে, করার প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু ধ্বংসের চিত্রটিকে

অত্যন্ত জীবন্ত করে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রাম্যসমাজের এরকম বাস্তব চিত্র সেকালের রচনাতে নিতান্তই দুর্লভ।

রচনার প্রারম্ভে বলা হয়েছে "ভূমিই আমাদের মূলধন, এবং কৃষকেরাই আমারদের প্রতিপালক।" কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে-কৃষকদের উপর আমাদের সুখ ও মঙ্গল সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাদের দুঃখদুর্দশার ও যন্ত্রণার শেষ নেই। "ইহার কারণ অতি ভয়ানক, এবং তাহার অনুসন্ধান করাও যন্ত্রণা-জনক।" যে রক্ষক সেই ভক্ষক, এই প্রবাদ বাংলার ভূস্বামীদের কথা মনে করে রচিত হয়ে থাকবে। ভূস্বামীরা কি শুধু নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করে নিশ্চিন্ত হতেন? রাজস্ব ছাড়াও বাটা, বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনী, পার্বণী, হিসাবানা প্রভৃতি "অশেষ প্রকার উপলক্ষ করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিপীড়ন" করা হত। অনেক ভূস্বামী অনাদায়ী টাকার চতুর্থাংশ, অর্থাৎ একশত টাকায় পঁচিশ টাকা হারে, 'বৃদ্ধি' গ্রহণ করতেন। ভূস্বামীর গৃহে "বিবাহ, আদ্যকৃত, দেবোৎসব বা প্রকারন্তর পুণ্যক্রিয়া ও উৎসব ব্যাপার" উপস্থিত হলে প্রজাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হত, কারণ "তাহারদিগকেই ইহার সমুদয় বা অধিকাংশ ব্যয়" সম্পন্ন করতে হত। "ইহা মাঙ্গন বলিয়া প্রসিদ্ধ।" 'মাঙ্গন' কথার অর্থ ভিক্ষা। জমিদাররা ভিক্ষার নাম করে বলপূর্বক অপহরণ করতেন—"ভিক্ষুক নাম গ্রহণ করিয়া দস্যু-বৃত্তি সাধন করেন।" যে বছর দু'তিনবার এরকম 'মাঙ্গন' না হয়, সে বছর বছরই নয়। ঠিক রাজস্ব আদায়ের মতো "নির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে" এই মাঙ্গন আদায় করা হত। এর চেয়েও বিচিত্র ব্যাপার হল, দরিদ্র প্রজাদের গৃহে বিবাহ শ্রাদ্ধ বা যে-কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান হলে তার জন্য ভূস্বামীদের 'শুল্কদান' করতে হত। কেবল ধর্মকর্মের উপর নয়, কুকর্মের উপরেও ভূস্বামীরা 'কর' স্থাপন করতেন। চুরি-ডাকাতি, কলহ-বিবাদ, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি সমস্ত কুকর্মের বিচারক হতেন তাঁরা, এবং বিচারকদের লোভানলে আহুতি দিতে পারলেই খুনের অপরাধ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যেত। অনেক ভূস্বামী নিজেদের জমিদারীর মধ্যে পথের শুল্ক, দ্রব্যের কর, একচেটে বাণিজ্য ইত্যাদি নিজেদের ইচ্ছামত স্থাপন করতেন।

ভূস্বামীদের এই অত্যাচারের উপরে ছিল নায়েব-গোমস্তা-সরকার প্রভৃতি আমলাদের অকথ্য জুলুম। তাঁদের "নিয়োজিত ব্যাঘ্রসম নিষ্ঠুর-স্বভাব কর্মচারিদিগের কঠোর হস্তে" সর্বদাই প্রজাদের "পতিত হইতে হয়। তাহারদের কর্ণ কুহরে গোমস্তা ও নায়েব শব্দ বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ভয়ানক বোধ হয়।"

আমলারা নিরীহ প্রজাদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। "বন্ধন, প্রহার, কারারোধ, অনশন ইত্যাদি দুঃসহ দুশ্চিন্তা যন্ত্রণার আলোচনায় আর ধৈর্য্য রাখা অসাধ্য।"

ইজারাদারদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাঁদের "অতি প্রভূত লোভরূপ হুতাশন শিখা ভূস্বামীর অপেক্ষায় দীর্ঘ হওয়ায় সম্ভাবিত।" ভূস্বামীর শোষণ-কৌশল ইজারাদারের হাতে আরও দ্বিগুণ-তিনগুণ বৃদ্ধি পায়, তা না হলে ভূস্বামীকে নির্দিষ্ট 'কর' দিয়ে ইজারাদারের মুনাফা থাকে না। সাধারণত ভূস্বামীকে দেয় করের চতুর্থাংশ বেশী তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করেন। "কল্য যে ভূম্যধিকারির লক্ষ মুদ্রা রাজস্ব ছিল, অদ্য তাহাতে আর পঞ্চবিংশতি সহস্র যুক্ত হইল! অতএব ইজারার নাম শুনিলে প্রজাদের হৃৎকম্প না হইবে কেন? এক্ষণে যাহারদিগকে উপর্য্যুপরি জমিদার, পত্তনিদার, ইজারাদার ও দরইজারাদার এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়, তাহারা যে কি প্রকারে প্রাণধারণ করে তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। তাহারদের দারুণ দুর্দশা বাক্যপথের অতীত।"

উপদ্রবের এইখানেই শেষ নয়। এসব ছাড়াও "ফৌজদারি উপদ্রব" আছে, অর্থাৎ থানা-পুলিশ দারোগার উপদ্রব। "পঞ্চম-বর্ষীয় বালকও থানা ও দারোগার প্রসঙ্গ শুনিয়া সভয়ে মাতৃক্রোড়ে গিয়া নিলীন হয়।" দারোগাদের "দীর্ঘোদর পূরণার্থে" প্রজাদের কিছু কিছু দান না করলে নিষ্কৃতি নেই। এর পরে আছে "মহাজন সংজ্ঞক বিষদ-বৈদ্য।" একবার মহাজনের হাতে পড়লে নিষ্কৃতির আর কোনো পথ থাকে না, "মূলধনের বৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি" হয়ে প্রজাদের বিনাশের কারণ হয়ে ওঠে।

ভূস্বামীদের অপকীর্তি ও প্রজাদের দুঃখদুর্দশার বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম দফায় এখানে শেষ হলেও, দ্বিতীয় দফায় তার আরও বৈচিত্র্য প্রকাশ করা হয়েছে। প্রজাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, ভূস্বামীরা তাদের দেহ ও দৈহিক মেহনতকেও কিভাবে নিজেদের অধিকারভুক্ত কেনা বস্তু বলে মনে করতেন তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হয়েছে যে বিনা মূল্যে ও বিনা বেতনে গোয়ালরা দুধ দেবে, জেলেরা মাছ দেবে, নাপিতে ক্ষৌর করবে, যানবাহন বহন করবে, চর্মকার চর্মপাদুকা দেবে—এইভাবে প্রত্যেককে জীবিকার ভাগ দিতে হবে জমিদারকে। "ক্রীতদাসকেও এরূপ দাসত্ব করিতে হয় না।" দয়া করে ভূস্বামীরা বা তাঁদের আমলারা যদি

কোনো মূল্য বা মজুরি গ্রাম্য কারিগরদের দেন, তাহলে তা এত সামান্য যে তাতে মজুরি বা লাভ তো দূরের কথা, কাঁচামালের দামটুকুও তারা পায় না। ভূস্বামীদের এই স্বেচ্ছাচারী দ্রব্যমূল্যের নাম 'সরকারী মূল্য'। নিষ্ঠুর অত্যাচারী জমিদাররা প্রজাদের উপর যে কতপ্রকারের দৈহিক পীড়ন করে থাকেন তার একটি ১৮-দফা দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হয়েছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়:

১। দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত ২। চর্মপাদুকা প্রহার ৩। বাঁশ ও কাঠ দিয়ে বক্ষঃস্থল দলন ৪। খাপরা দিয়ে নাসিকা-কর্ণ মর্দন ৫। মাটিতে নাসিকা ঘর্ষণ ৬। পিঠে হাত বেঁকিয়ে বেঁধে বংশদণ্ড দিয়ে মোড়া দেওয়া ৭। গায়ে বিছুটি দেওয়া ৮। হাত-পা নিগড়বদ্ধ করা ৯। কান ধরে দৌড় করানো ১০। কাটা দু'খানা বাঁধা বাখারি দিয়ে হাত দলন করা ১১। গ্রীষ্মকালে ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে, পিঠ বেঁকিয়ে পিঠের উপর ও হাতের উপর ইট চাপিয়ে রাখা ১২। প্রচণ্ড শীতে জলমগ্ন করা ও গায়ে জল নিক্ষেপ করা ১৩। গোণীবদ্ধ করে জলমগ্ন করা ১৪। বৃক্ষে বা অন্যত্র বেঁধে লম্বা করা ১৫। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা ১৬। চুণের ঘরে বন্ধ করে রাখা ১৭। কারারুদ্ধ করে উপোস রাখা ১৮। গৃহবন্দী করে লঙ্কা-মরীচের ধোঁয়া দেওয়া।

পাষণ্ডতার কোন্ স্তর পর্যন্ত এদেশের জমিদাররা পৌছেছিলেন তা প্রজাদের দৈহিক নির্যাতনের এই ভয়াবহ শ্রেণীবদ্ধ তালিকা থেকে বোঝা যায়। তালিকাটি দীর্ঘতর করা যায় না যে তা নয়, কিন্তু যেটুকু করা হয়েছে তা থেকেই জমিদারী নৃশংসতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া "প্রজাদিগকে দাসবৎ-মৃত্যুবৎ করিয়া রাখিবার নিমিত্তে ভূরি ভূরি যাষ্টিক (লেঠেল) নিযুক্ত" রাখা হয় এবং কোনো কোনো ভূস্বামী "প্রকৃত দস্যুদিগকেই পোষণ করেন।" নিজ ধনাগার থেকে অর্থ দিয়ে যে তাদের পোষণ করতে হয় তাও নয়, প্রজাদেরই এই ভূস্বামী-আশ্রিত দস্যু-লেঠেলদের ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

তৃতীয় দফায় তত্ত্ববোধিনীর লেখক "দুর্বৃত্ত নীলকরদিগের ব্যবহারের" বর্ণনা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে ভূস্বামীদের পূর্বকথিত অত্যাচারের চেয়ে নীলকরদের অত্যাচার আরও ভয়ানক, তাঁদের দৌরাত্ম্যে প্রজাকুল নির্মূল হবার উপক্রম হয়েছে। নীলকর সাহেবরা দাদন দিয়ে প্রজাদের দ্বারা নীলচাষ করেন। দাদন যৎসামান্য, কিন্তু তারও অর্ধেকের বেশী দালাল-গোমস্তারা উদরসাৎ করেন। উৎকৃষ্ট চাষের জমিতে প্রজারা নীলচাষ করতে আপত্তি করে,

কিন্তু সাহেবের অত্যাচারের ভয়ে করতে বাধ্য হয়। নীলের মুনাফা থেকে সাহেব নিজের উদর ফাঁপিয়ে তোলেন, কাজেই প্রজারা কদাচ নীলের ন্যায্য মূল্য পায় না। নীল চাষ করে প্রজাদের পেটও ভরে না, জমির উৎপাদিকা-শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রজাদের সর্বস্বান্ত করে নীলকর সাহেব মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি করতে থাকেন। প্রজাদের কাকুতি-মিনতিতে সাহেব কর্ণপাত করেন না, কালা ও বোবা হয়ে থাকেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রজারা নীলচাষ করতে বাধ্য হয়, কারণ "প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবল-পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবের অনিবার্য্য অনুমতির অন্যথাচরণ করা কি দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য?" যদি প্রজারা প্রাণরক্ষার দায়ে ক্ষেতে শস্য বপন করে তাহলে "নির্দয় নীলকরের প্রেরিত নিদারুণ লোকেরা" তাদের অজ্ঞাতসারে সেই ক্ষেতে উপস্থিত হয়ে নীলের বীজ বপন করে যায়। ধান্যাদি শস্য বপন করা হয়েছে এমন জমিতেও নীলকররা লোকজন নিয়ে এসে যখন জোর করে নীলবীজ বপন করে যান তখন কৃষাণের মনে হয় "যেন ঐ হলযন্ত্র তাহার হৃদয়ক্ষেত্রেই চালিত হইল।"

এত বিপদ মাথায় নিয়ে প্রজাদের নীলচাষ করেও শান্তি নেই। উৎপন্ন নীল সাহেবের নীলকুঠিতে পৌঁছে দেওয়ার পরেও "বিষম বিপত্তি" দেখা দেয়। "হিংস্র জন্তুবৎ নৃশংসস্বভাব আমলারা" দাদন দেওয়ার সময় প্রজাদের কাছ থেকে একদফা দালালি আদায় করেন, তারপর তারা যখন কুঠিতে নীল নিয়ে আসে তখন তা মাপার সময় আর-এক দফা 'সেলামি' বা 'প্রণামি' চান। প্রজারা দিতে বাধ্য হয়, কারণ তা না হলে সাহেবের আমলারা "২৫ মণ পরিমাণোপযোগি নীল দেখিয়া পাঁচ মণ মাত্র লিখিতে চাহে।" অবশ্য সেলামি দিয়েই যে প্রজারা স্বস্তি পায় তা নয়, কারণ সেলামিটি বেমালুম উদরস্থ করে আমলারা নীলকর সাহেব প্রভুর পক্ষে ওজন কমিয়ে লিখে রাখেন, ২৫ মণ নীল খাতাকলমে ১৫ মণের বেশী হয় না। প্রজারা ক্রমে ঋণের জালে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে তাদের "পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতিও তৎপরিশোধে সমর্থ হয় না।" এরপর নীলকর সাহেবদের ও তাঁদের এদেশীয় আমলাদের নানাপ্রকার অত্যাচারের আরও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বাংলার গ্রাম্যসমাজের একরকম নিখুঁত অর্থনীতিক জীবনচিত্র উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে আর কোনো বাঙলা সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় দেখা যায় না। প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতার জন্য তো বটেই, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের জন্যও এই রচনাগুলি অদ্বিতীয়।

গ্রাম্যসমাজ ও নাগরিক সমাজ। মধ্যবিত্তের চরিত্রচিত্রণ

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের সামাজিক চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে। প্রধানত এই চিত্র ভূস্বামী-কৃষকশ্রেণীর পারস্পরিক অর্থনীতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও, অন্যান্য শ্রেণীর কথা, বিশেষ করে নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণীর (middle-classes) চরিত্রব্যাখ্যাও রচনার মধ্যে করা হয়েছে। সনাতন ও পুরাতন গ্রাম্যসমাজের স্তম্ভগুলি ব্রিটিশ আমলের ভূমিরাজস্বনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে ভেঙে পড়েছে, কিন্তু সেই ভগ্নস্তূপের উপর তার কোনো নূতন কাঠামো গড়ে ওঠেনি। পরাধীন অর্থনীতির প্রতিবন্ধের জন্য সেরকম কোনো নূতন সামাজিক কাঠামো সবল ভিত্তির উপর গড়ে ওঠার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। পূর্বের সমাজব্যবস্থায় বিত্তের (money) কোনো সামাজিক কৌলীন্য বা মর্যাদা (social status) ছিল না, কুলমর্যাদা বা স্তরবিন্যস্ত জাতিবর্ণ-মর্যাদা (hierarchical caste-status) ছিল প্রধান। নূতন সমাজব্যবস্থায় বিত্ত শ্রেষ্ঠ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হল এবং তার ফলে পুরাতন জাতিগত-বৃত্তিভিত্তিক সমাজে ধীরে ধীরে ফাটল ধরতে লাগল। নূতন বিত্তভিত্তিক সমাজে স্বভাবতঃই উপরের ধনিক ও নিচের দরিদ্রের মধ্যে এক মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব হল। এই মধ্যশ্রেণীর মধ্যেও বিত্তগত মর্যাদার তারতম্য অনুসারে ক্রমে স্তরভেদ হতে থাকল—যেমন 'উচ্চ-মধ্য' (Upper Middle), 'মধ্য-মধ্য' (Middle-Middle), 'নিম্ন-মধ্য' (Lower-Middle)। কিন্তু আপাতত এই স্তরভেদের জটিলতা বিগত শতকের সামাজিক ইতিহাসের সাধারণ গতিনির্দেশ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের বিচার্য হল, পরাধীন পরিবেশে এদেশে যে নূতন গ্রাম্য-মধ্যবিত্তশ্রেণী ও নাগরিক-মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হল, তার চারিত্রিক গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য। একথা ঠিক যে আধুনিক যুগে সামাজিক অগ্রগতির প্রধান চলনশক্তি যুগিয়েছে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং যে সমস্ত চারিত্রিক গুণ তার সহায় হয়েছে তার মধ্যে প্রধান হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, শিক্ষালব্ধ উদারতাবোধ ইত্যাদি। পোলার্ডের বিখ্যাত উক্তির কথা মনে পড়ে: "Without commerce and industry there can be no middle class; where you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation."[৮] কিন্তু কতকগুলি চারিত্রিক অগুণও আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের গোড়া থেকে মধ্যবিত্তের চরিত্রে শ্রেণীগতভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে—যেমন স্বার্থপরতা, যন্ত্রবৎ হৃদয়হীনতা,

পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি। সমাজ যদি বিত্তকেন্দ্রিক হয় এবং সেই বিত্ত উপার্জনের স্বাধীন ও স্বাভাবিক পথগুলি রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য অবরুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে মধ্যবিত্তচরিত্রের গুণ অপেক্ষা দোষগুলি বেশি প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে তাই হয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে। কারণ ব্রিটিশ আমলে আধুনিক মধ্যবিত্তের বিকাশের সুযোগ বাংলাদেশে যতটা প্রশস্ত ছিল, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে তা ছিল না। সেই কারণে একসময় মধ্যবিত্তের চারিত্রিক গুণ বাংলাদেশে যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে দোষগুলিও তেমনি অতিক্রত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মধ্যবিত্তের এই চারিত্রিক দোষগুলিকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নির্মমভাবে কশাঘাত করা হয়েছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মুখ্যত মধ্যবিত্তের মুখপত্র, সুতরাং এই সমালোচনা কতকটা আত্মসমালোচনার মতো।

ভূস্বামী-কৃষকশ্রেণীর শোষক-শোষিতের সম্পর্ক বর্ণনাকালে তত্ত্ববোধিনীর লেখক মধ্যে মধ্যে বাংলার গ্রাম্যসমাজের যে চিত্র লেখনীর আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, বাস্তব জীবন্ত চিত্র হিসেবে তা অতুলনীয়। তিনি লিখেছেন যে কেবল ভূস্বামীরা নন, "তদ্ভিন্ন অন্য অন্য লোকেও প্রজাদিগকে ক্লেশ দিতে ত্রুটি করে না।" এই "তদ্ভিন্ন অন্য অন্য লোকেও" যে গ্রাম্য মধ্যবিত্তশ্রেণী তা বলাই বাহুল্য। পল্লীগ্রামে যাঁর "যৎপরিমাণে সম্পত্তি ও প্রভুত্ব বৃদ্ধি হয়, তৎপরিমাণে তিনি লোকের উপর অত্যাচার" করে নিজের ক্ষমতা "প্রদর্শনার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন। সমস্ত লোক আমার আয়ত্ত ও বশীভূত থাকুক, ইহাই সকলের নিতান্ত বাসনা।" এই গ্রাম-মধ্যবিত্তরা (rural middle-class) কারা? "ভূস্বামীর সংসার-সংক্রান্ত কোন ক্ষুদ্রকর্মেও যিনি নিযুক্ত থাকেন," বা যাঁরা নিযুক্ত থাকেন তাঁরা এই মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ। অর্থাৎ গ্রাম্য-মধ্যবিত্তের একটি অন্যতম স্তর হল ভূস্বামীদের আমলাগোষ্ঠী। ভূস্বামীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে তাঁদের "প্রভাবের আর পরিসীমা থাকে না; বাজার-সরকারও রাজার তুল্য প্রভুত্ব ও পরাক্রম প্রকাশ করে।" 'টিপিকাল' মধ্যবিত্তচরিত্রের বর্ণনা—জমিদারের বাজার-সরকারও গ্রাম্যসমাজে রাজার মতো প্রভুত্ব করতে চায়। "গ্রামের মধ্যে যিনি অন্যান্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ধনবান"—অর্থাৎ বিত্তের দিক থেকে 'মধ্যবিত্ত'—তাঁর অভিলাষ যে আর সকলেই তাঁর দ্বারস্থ থাকুক এবং তাঁর দাস হয়ে সেবা করুক। এও মধ্যবিত্তচরিত্রের আর-একটি বড় বৈশিষ্ট্য। লেখক দুঃখ করে বলেছেন যে

এককালে গ্রামে যে-ব্যক্তি অতি-দরিদ্র ছিল, "সেও দৈবাৎ সান্ন" হলে "যাবতীয় লোকের উপর বিষম অত্যাচার আরম্ভ করে।" জমিদারের অনুগ্রহপুষ্ট অর্থলোলুপ আত্মাভিমানী মধ্যবিত্তের পদার্পণে বাংলার গ্রাম্যজীবন যে কতদূর কলুষিত হয়েছিল তা এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়। পল্লী অঞ্চলে যতরকমের উৎপাত-উপদ্রব হত, তার প্রধান সৃষ্টিকর্তা ছিলেন এই মধ্যবিত্তশ্রেণী, এবং তাঁদের মধ্যে আবার প্রতাপ-প্রতিপত্তিতে অন্যতম ছিলেন মধ্যস্বত্বভোগীর দল, জমিদারদের আমলাগোষ্ঠী এবং থানা-পুলিশের কর্মচারীরা। এই মধ্যবিত্তরা স্বদেশী ও বিদেশী প্রভুর ক্ষমতার দর্পণে সর্বদাই নিজেদের মুখ দেখতেন এবং সেই ক্ষমতার প্রতিবিম্বকে কায়া মনে করে গ্রাম্যসমাজে প্রয়োগ করতে দ্বিধা করতেন না। নীলকর সাহেবদের প্রজাপীড়নের যে বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পাওয়া যায়, তাতেও দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহেবদের চেয়েও এদেশীয় গোমস্তা-দালালশ্রেণী বেশি অত্যাচারী ছিলেন এবং কার্যক্ষেত্রে অত্যাচারের বিচিত্র কৌশল উদ্‌ভাবনে তাঁদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। এঁদেরই বলা হয়েছে, নীলকরদের আশ্রিত 'নিদারুণ লোক।' নীলকররা অবশ্যই দারুণ, কিন্তু তাঁদের এদেশীয় আমলারা নিঃসন্দেহে নিদারুণ। এঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত, কিন্তু গ্রাম্য-মধ্যবিত্তের বিস্তৃত বনেদ এঁদের দ্বারাই গঠিত হয়েছিল এবং অদম্য অর্থলালসা এঁদের হৃদয়টিকে একটি বিকট শোষণযন্ত্রে পরিণত করেছিল।

অর্থ উপার্জনের কলাকৌশল ছাড়া এই গ্রাম্য-মধ্যবিত্তের আর কোনো গুণ ছিল না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই মধ্যবিত্তের চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—"তাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া বিখ্যাত বটেন, কিন্তু ব্যবহারানুসারে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করিতে হইলে তাঁহারদিগকে এ আখ্যা প্রদান করা কোনক্রমেই উচিৎ নহে। যৎকিঞ্চিৎ অঙ্ক শিক্ষা মাত্র তাঁহারদের বিদ্যার সীমা; তাঁহারা বিদ্যারসের স্বাদ গ্রহণও করেন না, নীতিশাস্ত্রেও শিক্ষিত হয়েন না। বিদ্যা ও ধর্মহীন লোকের যে প্রকার আচরণ হওয়া সম্ভব, তাহা কাহার অগোচর আছে? তাঁহারদের মুখশ্রীতে কেবল লোভ ও নির্দয়তার নিদর্শনই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, জ্ঞান ও ধর্মের চিহ্নমাত্রও দৃষ্টি করা যায় না। তাঁহারদের সন্তানরাও প্রায় তদনুরূপ প্রকৃতিপ্রাপ্ত হয়, তাঁহারদিগেরই ন্যায় বিদ্যা শিক্ষা করে, এবং তাঁহারদের নিকট শিক্ষা লিখিয়া ক্রমে ক্রমে…কোন একটা সামান্য কার্যে নিযুক্ত হইয়া পিতা পিতৃব্যাদির ন্যায় অহিতাচার আরম্ভ করে।" এই হল গ্রাম্য-

মধ্যবিত্তের স্বরূপ, আধুনিক বিদ্যা বা শিক্ষার বালাই নেই যাঁদের, কেবল কিঞ্চিৎ নগদ অর্থের জোর আছে এবং তার চেয়েও বেশী জোর আছে সামাজিক ক্ষমতার, যদিও সেই ক্ষমতাটুকু প্রভুর ক্ষমতার অবাস্তব ছায়ামাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শহরের পত্রিকা এবং শহুরে মধ্যবিত্তরাই পত্রিকার পরিচালক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অর্থনীতিক ও সামাজিক সমস্যা-বিচারে তত্ত্ববোধিনীর দৃষ্টি গ্রামাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহরের প্রতি কখনও নিবদ্ধ হয়নি। যখনই অর্থনীতিক সুখসমৃদ্ধি ও অভাব-অনটনের কথা পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে, তখনই গ্রাম ও গ্রামবাসীর কথা তার দৃষ্টিপথে ভেসে উঠেছে, এবং বাহ্যশ্রীর জৌলুস অথবা শহর-নগরের দৃশ্যমান সমৃদ্ধিকে কখনও সে সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি বলে ভুল করেনি। ব্রিটিশ আমলে বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে এদেশের বাস্তব (material) জীবনযাত্রার যে উন্নতি হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক লিখেছেন :

"যে বাষ্পীয় রথের লৌহবর্ত্ম এতদ্দেশীয় পূর্বকালীন লোকের মনেতেও কল্পনা করে নাই, এক্ষণে বঙ্গদেশবাসী আপামর সাধারণ লোকে সেই রথে আরোহণ করিয়া সর্বদা গতায়ত করিতেছে এবং যে অদ্ভুত তাড়িত বার্তাবহ পূর্বকালীন লোকে সন্দর্শন করিলে বোধ হয় দেবকীর্তি বলিয়া মনে করিত, এক্ষণে বঙ্গভূমির নানাস্থানে সেই তাড়িত তার সঞ্চালিত হইয়া রহিয়াছে। যে বাষ্পীয় যন্ত্র সাংসারিক দুঃখ হরণের এক প্রধান উপায়, যে যন্ত্রের সাহায্যে বহুসংখ্যক মনুষ্য অনেক প্রকার দৈহিক শ্রম হইতে মুক্ত হইয়া অক্লেশে সংসারের কার্য্যোপযোগী বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে এবং যে মুদ্রাযন্ত্র সাধারণরূপে বিদ্যাপ্রচারের একমাত্র উপায়, যাহার সহায়তাক্রমে একদিবসের মধ্যে সহস্র সংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সহস্র স্থানে প্রচারিত হইতে পারে, এক্ষণে বঙ্গদেশে উক্ত বাষ্পীয় যন্ত্র ও মুদ্রাযন্ত্রেরও বিলক্ষণ প্রচার হইয়াছে।···এক্ষণে এদেশে যেমন নানাবিধ সুখভোগের উন্নতির চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানোপার্জন বিষয়েও শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।"—'বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা', শ্রাবণ ১৭৭৮ শক।

যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানানো হয়েছে, এবং 'সবই আমাদের বেদে আছে' এরকম বিসদৃশ ধারণার বশবর্তী হয়ে এই প্রগতিকে তাচ্ছিল্য করার কোনো প্রয়াসও এর মধ্যে নেই। কিন্তু বাস্তব জীবনের এই টেকনিকাল উন্নতির ফলে সমগ্র দেশ ও দেশবাসী কতদূর উন্নত ও

উপকৃত হয়েছে, সেই প্রশ্নই আসল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরে তত্ত্ববোধিনীর লেখক বলেছেন, "যখন বঙ্গরাজ্যের প্রতি গ্রাম, প্রতি পল্লী ও প্রতি পরিবারের" দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তখন "অনবরত দুঃখ দাবানলের অসহ্য যন্ত্রণার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করা যায়।" সমৃদ্ধি শহরে-নগরে যেটুকু দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে তাও দেখা যায় না। সুতরাং যাঁরা শুধু কলকাতার মতন শহরের দিকে চেয়ে থাকেন এবং শহরের মুষ্টিমেয় ধনিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সাহেবিয়ানা দেখে চমৎকৃত হন, তাঁরাই বাংলাদেশের বিশেষ উন্নতির কথা বলতে পারেন। "যাহারা কেবল কলিকাতাস্থ ও কতিপয় অন্য নগরস্থ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লোকের সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্গদেশের শুভাশুভের বিষয় আলোচনা করে, যাহারা কেবল নগর মধ্যে সর্বদা কতিপয় সধন লোকের সহিত একত্রিত হইয়া কথোপকথন করে, এবং যে সমস্ত লোক আধুনিক নব্যসম্প্রদায়ীদিগকে ইংরেজদিগের বেশভূষা ও আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিয়া মহানন্দে আনন্দিত হয়, তাহারাই বলে যে অধুনা বঙ্গদেশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে—।" কিন্তু গ্রাম ও গ্রামবাসীর প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করলে এই ধারণা ভুল মনে হয় এবং 'বিশেষ উন্নতি' তো দূরের কথা, মনে হয় বিশেষ অবনতি হয়েছে। "কিন্তু যে সমস্ত লোক বঙ্গদেশের অন্তর্বর্তী সমস্ত পল্লীগ্রামস্থ মনুষ্যের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া দেখে এবং যাহারা মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া নানাপ্রকার দুঃখের বার্তা শ্রবণ করে, তাহারা আর কখনই বলিতে পারে না যে এক্ষণে বঙ্গরাজ্যের বিশেষ দুর্দশা ভিন্ন কোন অংশে ইহার উন্নতি হইয়াছে।"

কলকাতা শহরের কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানকার ধনিকদের বিলাসিতার সঙ্গে গ্রামের সাধারণ লোকের দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনযাত্রার তুলনাও করা হয়েছে। "অধুনা কলিকাতা প্রভৃতি কোন কোন প্রকাশ্য স্থানস্থ কতিপয় ব্যক্তি যেমন উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় বাস করিয়া উত্তমোত্তম উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া এবং সুচারু পরিচ্ছদ ধারণ ও সুন্দর যানবাহনে আরোহণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুখী হইয়াছে, সেইরূপ পল্লীগ্রামের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি উপযুক্ত অন্নাচ্ছাদনাভাবে বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।" সমাজের এই বিষম বৈষয়িক উন্নতি তত্ত্ববোধিনীর কাম্য ছিল না। যে বৈষয়িক উন্নতি সামাজিক বৈষম্যের পথ প্রশস্ত করে তা কখনও দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর কাম্য হতে পারে না। অর্থনীতিক উন্নতির পথে দেশের শহর-নগর ও গ্রামের অগ্রগতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হোক এবং সমাজের ধনভাণ্ডারের

বণ্টনে দেশের সর্বসাধারণের প্রতি সমদৃষ্টি থাকুক, এই আদর্শই তত্ত্ববোধিনী অনুসরণ করতে চেয়েছে মনে হয়। অন্তত তার অর্থনীতিবিষয়ের রচনাবলীতে এই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। কোনো জলাশয়ে "কুম্ভীরাদি ভীষণ জলজন্তু" প্রবেশ করলে "তত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীবর্গের" যেমন অবস্থা হয়ে থাকে, বাংলাদেশের সমাজে হঠাৎ বিত্তশালী আরামপ্রিয় একশ্রেণীর লোক প্রবেশ করাতে সাধারণ লোকের ঠিক সেইরকম অবস্থা হয়েছে, এই তার ধারণা।

অর্থনীতিক সমৃদ্ধির উপায় নির্দেশ। শিল্পকর্ম ও বাণিজ্য

'বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা' প্রবন্ধে বলা হয়েছে, যে সমস্ত জাতি "স্বকীয় বলবীর্য দ্বারা" বিত্তলাভ করতে সমর্থ হয়, তারাই ক্রমে উন্নত হতে থাকে এবং "দুর্বল ও তেজবিহীন জাতি" নিজেদের জীবিকা অর্জনে অসমর্থ হয়ে অল্পে অল্পে ধ্বংস হয়। তারপরেই বলা হয়েছে, "এক্ষণে যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা সমধিক অর্থাগম হইতে পারে, প্রায় তাহার অধিকাংশই এদেশীয় লোকের পক্ষে অবলম্বন করা অসাধ্য ও অনায়ত্ত। ইহারা যেমন কোন বিস্তীর্ণ বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে অপটু এবং উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া সমধিক ধন উপার্জন করিতে অক্ষম, সেইরূপ কোন রাজকীয় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেও অসমর্থ।"

এই উক্তির বিশেষ গুরুত্ব আছে। শিল্পকর্ম (industry) ও বাণিজ্য (trade) ছাড়া যে কোনো জাতির উন্নতি হতে পারে না তা পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে অধিকাংশ শিল্প-বাণিজ্যই এদেশীয় লোকের 'অসাধ্য' ও 'অনায়ত্ত'। এই অসাধ্য ও অনায়ত্ত কথার তাৎপর্য হল ব্রিটিশ শাসনাধীনে অর্থনীতিক স্বাধীনতার অভাব। স্বাধীনতা যে একেবারে ছিল না তা নয়, ব্রিটিশপূর্ব যুগের তুলনায় বরং বেশী ছিল এবং তা ছিল বলেই দেশের খানিকটা বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু শিল্পবাণিজ্যে অবাধ স্বাধীনতা হল ধনতান্ত্রিক যুগের মূলনীতি। এই মূলনীতি এদেশে ব্রিটিশ শাসকরা নিজেদের অর্থনীতিক স্বার্থে অবাধে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। সেইজন্য ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে, বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকে, এদেশের লোক যাঁরা শিল্পবাণিজ্যকর্মে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন তাঁরা পরবর্তীকালে নিরুৎসাহ হয়ে গেলেন এবং তাঁদের সঞ্চিত মূলধন কিছুটা স্থাবর ভূসম্পত্তিতে নিবদ্ধ হয়ে গেল, কিছুটা 'conspicuous consumption'-এর

পিচ্ছিল পথে এবং দীর্ঘমেয়াদী দেওয়ানী মামলা-মোকদ্দমায় উড়ে গেল। এঁদের বংশধররা, উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে, অবস্থাচক্রে বাণিজ্যবিমুখ ও নিষ্কর্মা হয়ে সুদখোর-খাজনাখোরে পরিণত হলেন। এই পরিণতির পরের চিত্রই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আঁকা হয়েছে। এদেরই কথা মনে করে মন্তব্য করা হয়েছে যে স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ ধরে অবস্থার উন্নতি করতে এরা 'অপটু' এবং উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মের অনুষ্ঠান করে সমধিক ধন উপার্জন করতে এরা 'অক্ষম'।

মধ্যবিত্ত বাঙালীর অর্থনীতিক জীবনের এই শোচনীয় অবস্থা বিগত শতকের মধ্যভাগেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। এমন কি মধ্যবিত্তের মধ্যে সুযোগ্য ব্যক্তিরা পর্যন্ত যে "রাজকীয় উচ্চপদ" লাভে বঞ্চিত, সেকথাও এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। "আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এক ব্যক্তি ইংরাজ যে কর্ম সম্পাদন করিয়া সাদরে সহস্র মুদ্রার অধিক মাসিক বেতন প্রাপ্ত হয়, এদেশীয় লোকে সেই কার্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন করিয়া ১০০।১৫০ টাকার অধিক বেতন পায় না।" লেখক বলেছেন যে রাজা রাজবল্লভ, রাজা নবকৃষ্ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতির মতন পদমর্যাদা বা ক্ষমতা ইংরেজদের কাছ থেকে পাওয়া এযুগে (অর্থাৎ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে) আর সম্ভব হবে না। তার কারণ কি? রাজবল্লভ-নবকৃষ্ণের যুগে আধুনিক মধ্যবিত্তের বিকাশ হয় নি, বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের। যখন তার বিকাশ হল এবং তার পাশাপাশি ইংরেজদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা হল, তখন এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর 'অধঃশ্রেণীভুক্ত' সরকারী চাকুরিজীবী-শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকলেন। 'ডেপুটির' স্তর পর্যন্ত তাঁদের পদোন্নতির সীমা প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেল। প্রধানত এই ডেপুটিত্বের চূড়ান্ত পরিণতির কথা মনে করেই তত্ত্ববোধিনীর লেখক দুঃখপ্রকাশ করেছেন—"এদেশীয় লোকে সুচারুরূপে রাজনিয়ম পরিচিত হউন বা এক্ষণকার অপেক্ষা সহস্রগুণে কর্মক্ষম ও বিষয়দক্ষ হউন, তাহাদিগকে চিরদিনই অধঃশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া এইরূপে অল্প বেতনে রাজকর্ম নির্বাহ করিতে হইবেক।" ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের আগে পর্যন্ত এদেশের ব্রিটিশ শাসকদের সরকারী কর্মনিয়োগনীতি ছিল ভারতীয়-বিরোধী, অর্থাৎ সাদা-কাল জাতিবৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অ্যাক্টে এই বৈষম্যনীতি দূর করার সদিচ্ছা ঘোষিত হলেও, কার্যক্ষেত্রে তা যে পুরোপুরি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি, তত্ত্ববোধিনীর ১৮৫৬ সালের সমালোচনা

থেকে তা বোঝা যায়। তাই ১৮৪৪ সালে হার্ডিঞ্জ যখন উচ্চশিক্ষাকে সরকারী কর্মযোগ্যতার অন্যতম মাপকাঠি বলে ঘোষণা করেন, তখন শিক্ষিত বাঙালীরা সভা আহ্বান করে সেই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করেন। 'এজু-রাজ' (এডুকেটেড-দের রাজা) রামগোপাল ঘোষ সভায় ধন্যবাদ-প্রস্তাব পেশ করলে কিশোরীচাঁদ মিত্র তা সমর্থন করে বলেন: "Among the formidable obstacles which oppose themselves to the progress of education in our country, the absence of all connection between education and pecuniary success in the world is one of the principal···I hail therefore this resolution···." [৯] কিন্তু আরও বার বছর পরে এদেশীয় শিক্ষিতশ্রেণীর মনে যে কতখানি বিক্ষোভ জমা হয়েছিল, তত্ত্ববোধিনীর রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবশ্য বাঙালীজাতি একটি পরনির্ভর চাকুরিজীবীশ্রেণীতে পরিণত হোক, তত্ত্ববোধিনীর তা কাম্য ছিল না। স্বাধীন শিল্পকর্ম ও বাণিজ্য ভিন্ন যে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়, এ-বোধ তত্ত্ববোধিনীর খুব প্রখর ছিল। 'অতীতে আমাদের সবই ছিল'—এরকম গণ্ডমূর্খোচিত কোনো ধারণা তার ছিল না। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনীর মন্তব্য লক্ষণীয়: "এতদ্দেশীয় শিল্পনৈপুণ্যে অতি উৎকৃষ্ট সুখসেব্য নানাবিধ বিলাস-সামগ্রী উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু উপযুক্ত উপকরণের অল্পতা হেতুই হউক বা অন্য কারণেই হউক, যে সকল সামগ্রী মনুষ্য জীবনের আপাততঃ অবশ্যম্ভাবী অভাব বিমোচনের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার নির্মাণে আমাদের শিল্পবিদ্যা সেরূপ স্ফূর্তি পায় নাই। এই জন্য আমরা জীবনের নানাবিধ সুখ-স্বচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি ও সভ্যতার পথও কিয়দংশে রুদ্ধ রহিয়াছে।" এই বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক ও অর্থতত্ত্বানুগামী। প্রাচীন ভারতের গৃহশিল্পোৎপন্ন যে-সব সামগ্রী বহির্বাণিজ্যে ব্যবহৃত হত তা সাধারণ লোকদের জন্য নয়, রাজা-বাদশাহদের বিলাস-সামগ্রী। সাধারণ মানুষের উপভোগ্য বস্তু খুব সামান্যই ছিল এবং তা নিজেরাই তারা উৎপাদন ও উপভোগ করত। উৎপাদন-উপভোগের (production-consumption) ক্রিয়া সাধারণত গ্রাম্যসমাজের সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে যেত না এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানও খুব অনুন্নত ছিল। শুধু তাই নয়, ভারতের চিরদিনের আধ্যাত্মিকতা ভোগবিথমুতা ও সন্ন্যাস-বৈরাগ্যপ্রবণতা তার বস্তুগত সমৃদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় ছিল। তাই আক্ষেপ করে

তত্ত্ববোধিনীর লেখক লিখেছেন "বিদেশীয়রা সর্বকালে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যকে এত সমাদর করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা স্বয়ং ইহার প্রতি সমুচিত মনোযোগ প্রদান করি নাই।"

ভারতের বাণিজ্যিক অবনতির তিনটি কারণ তত্ত্ববোধিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম কারণ—প্রকৃতি এদেশকে সুজলা সুফলা করেছে, তাতে বিনা আয়াসে লোকের মোটা অভাব মিটে যায় এবং অতিরিক্ত আয়াসে কিছু করার প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয় কারণ—আমাদের দেশের জলবায়ু মানুষকে শ্রমবিমুখ করে তোলে। তৃতীয় কারণ—আমাদের দেশাচার আর্থিক উন্নতির পরিপন্থী। দেশাচারের জন্য বিদেশযাত্রা নিষেধ, সমুদ্রযাত্রায় জাতিনাশ, বংশানুক্রমিক বর্ণগত বৃত্তি স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক; অর্থাগমের অধিকাংশ প্রশস্ত পথই এই কারণে অবরুদ্ধ। তা না হলে ইয়োরোপীয়দের মতোই আমাদের চরিত্রে সাহস ও উদ্যম এতদিনে নিশ্চয়ই দেখা দিত এবং তাহলে আমাদের আর্থিক জীবনও অনেক উন্নত হত।*

১। Modern India and the West: L. S. S. O'Malley, London 1941, p. 57.

২। W. W. Hunter: Bengal M S. Records. London 1894, vol. I, pp. 24-25

৩। Hunter: *op. cit.* p 111

৪। Hunter: *op. cit.* p. 32

৫। Karl Marx: Notes on Indian History, Moscow (*n.d.*), p. 101

৬। 2nd Report of Select Committee of House of Commons, 1808-12, app. 9, p. 103

৭। Bengal Administration Report, 1872-73, p. 73

৮। A. F. Pollard: Factors in Modern History, 3rd ed. London 1932, p. 43

৯। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র প্রথম খণ্ড: বিনয় ঘোষ: 'প্রাসঙ্গিক তথ্য', ৪৯৫-৯৬

* লেখক-কৃত "সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র" দ্বিতীয় খণ্ড (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার রচনা-সংকলন) গ্রন্থের (শীঘ্র প্রকাশিতব্য) সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একাংশ।

তরুণ সান্যাল

'নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্র' : সাম্রাজ্যবাদী মূলধনের তত্ত্ব

মূলধনতন্ত্রী অর্থনীতির মধ্যে মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে বলে সামাজিক অসাম্য প্রভৃতি দূরীকরণের জন্য যেমন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন ঘটছে, তেমনি সর্বপ্রকার বাণিজ্য বা কর্মসংস্থান সঙ্কটের সর্বরোগহর সালসার সন্ধান মিলেছে—এমন কথা পত্র-পত্রিকায়, বক্তৃতায় প্রতিদিনই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মূলধনতন্ত্রের মূলে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে কিনা, এবং তার বাহ্যিক বর্ণাঢ্যতা যথার্থ নব যৌবনের চিহ্নযুক্ত কিনা—এ সমস্ত বিষয় আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল মহলে বেশ কয়েক বছর ধরে বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছে। সমাজতন্ত্রীগণ মূলধনতন্ত্রের কল্যাণমূলক নবরূপায়ণে যেমন ক্রমশ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন, এমন কি ব্রিটেনের লেবার দলের সম্মেলনে রাষ্ট্রীয়করণ বিষয়ে বাদানুবাদের মধ্যে সরকারী উদ্যোগে ক[illegible] এবং ঋণ ব্যবস্থার সহযোগে জাতীয় আয় বণ্টনের দিকে বেশি নজর ও জো[illegible] দেওয়া হয়েছে। বামপন্থী কীনসপন্থীগণ শ্রমিকশ্রেণীর সপক্ষে আয়বণ্টনে[illegible] কথা মূলধনতন্ত্রের সঙ্কটমোচনের জন্য স্থায়ী প্রতিষেধক বলে মনে করেন, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী কীনসপন্থীগণ অধিকতর সুদের হার এবং রাষ্ট্র নি[illegible] উৎপাদনের দায়িত্ব না নিয়ে কর প্রসূত অর্থ কমে আসা চাহিদাকে ঠেক[illegible] দিতে উৎপাদনকারীদের হাতে তুলে দিতে চান। দক্ষিণপন্থীদের নিক[illegible] আজ অস্ত্রসজ্জা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক।

মূলধনতন্ত্রের এবম্বিধ উদ্বর্তনের বিচারে মার্কসবাদীদের মধ্যেও এক ধরনে[illegible] যান্ত্রিক যুক্তিবিস্তার লক্ষ্য করা যায়। মূলধনতন্ত্রের মূলে না হলেও কাঠামোতে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটেছে যা মার্কসপন্থীদের এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

Theories of "Regulated Capitalism" : Edited by I. G. Blyum[illegible] Foreign Languages Publishing House, Moscow.

ইউরোপের মার্কসবাদীদলগুলি বহুবিচারের পর মূলধনতন্ত্রের নব বস্ত্রধারণের বিষয়টি যেমন পরিষ্কার হয়েছে, এশিয়ার বহু দেশের মার্কসবাদীগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ মূলধনতন্ত্রের অভিজ্ঞতার অভাববশত মূলধনতন্ত্রের ভোলবদলের গুরুত্ব-টুকুও বুদ্ধিবৃত্তিতে লোপ পেতে বসেছে। এবং উদ্ধৃতি কণ্টকিত বাগ্‌বিস্তারে তাঁরা বহু ক্ষেত্রেই রণং দেহি রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমাদের দেশেও অনুরূপ যান্ত্রিক চিন্তানুসারীদের অভাব নেই। এমতাবস্থায় খোদ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক আই. জি. ব্লিউমিন কর্তৃক সম্পাদিত Theories of "Regulated Capitalism" বইখানির প্রকাশ নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়েছে। মূলধনতন্ত্রের জরাগ্রস্থ বলিরেখা কণ্টকিত নৃসংশ অবয়ব 'নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্র' নামধেয় প্রসাধনের উগ্রতা যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য, সেটা নানা নিবন্ধের মাধ্যমে বইখানিতে লিখিত হয়েছে। বইখানিতে চারটি প্রবন্ধ লিখেছেন আর. কাফিঝভ, আই. ওসাদকায়া, ডি. স্মিস্‌লভ এবং এ. পোক্রোভস্কি। এঁরা প্রত্যেকেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের Candidate of Economic Sciences, এবং যথাক্রমে 'নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্রের' তত্ত্ব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ ঘটিত সমস্যা, ব্রিটেনে অধিক ও লগ্নিমূলক মূলধনের প্রশ্নাবলী সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা এবং আধুনিক ফ্রান্সে সরকারী উদ্যোগে শিল্পসংহতি প্রবর্তনা বিষয়ক নিবন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক মূলধনতন্ত্রের রঙবেরঙের বাহারী সাজপোশাক কাটিয়ে দিয়ে এঁরা গলিত নখদন্ত মূলধনতন্ত্রের ভোলবদলানো স্বরূপ অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখাতে পেরেছেন। নিরস্ত্রীকরণ যে আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলকশীর্ষ এবং নিরস্ত্রীকরণের ফলেই মূলধনতন্ত্রকে একেবারে চূড়ান্তভাবে আঘাত করা যেতে পারে, আধুনিক মূলধনতন্ত্রে সমরসজ্জার ভূমিকা আলোচনার মধ্য দিয়ে লেখকগণ সুচারুভাবে তা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন।

মূলধনতন্ত্রের সমর্থকদের গলাবাজি বিভিন্ন যুগে বিভন্ন ধর্মী ছিল। এই কিছুদিন পূর্বেও এঁরা অর্থনীতিতে সরকারী অনুপ্রবেশ অসহ্য এবং মূলধনতন্ত্রবিরোধী বলে মনে করেছেন। যখন সরকারী প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয় মনে করেছেন তখন এঁরা সে সহায়তা নিতে কুণ্ঠিত হন নি, সরকার তো এঁরাই গঠন করেন, সরকার প্রভাবিত রাষ্ট্রযন্ত্র মূলধনতন্ত্রীদের সময়মত

সহায়তা করতে তো আসবেই। মূলধনতন্ত্রের আদিযুগের নাম নানা কারণে অনেকে সওদাপুঁজির যুগ বা Mercantilism দিয়েছেন। সে যুগে স্বর্ণই, বা কেনা-বেচার জগতের বিনিময় মাধ্যমকেই সম্পদ বলা হত। যে দেশে বেশি সোনা, সে দেশই তত বড়লোক। সওদাগরগণ বিদেশে বেশি জিনিস বিক্রয় করে বেশি সোনা আনতে পারতেন বলে, সরকার তাঁদের সমর্থক ছিল। দেশের মজুরদের খুব কম মজুরী দিলে, বিদেশে বেশি দামে দ্রব্য বিক্রী হলে মুনাফার পরিমাণ যেমন বাড়ে, দেশে সোনাও ঢের আসে। আবার বিদেশের বাজার বন্দুকের জোরে, ছলেবলেকৌশলে দখল করে প্রত্যক্ষ লুঠতরাজের মাধ্যমে শোষণে, পরোক্ষে কর, খাজনা এবং বিক্রীত দ্রব্যের উচ্চ দাম আদায়ের মাধ্যমে ঢের বেশি বেশি সোনা দেশে আনা চলত। মূলধনতন্ত্রের আদিযুগে দেশের শ্রমিকশ্রেণীও বিদেশ শোষণের দস্তুর পৈশাচিকতায় মূলধনতন্ত্রীরা রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার সহায়তা চেয়েছেন। এর পরের ধাপে দেখা দিয়েছে প্রতিযোগিতামূলক মূলধনতন্ত্র। উর্ধ্বতনের পরবর্তী ধাপে মূলধনতন্ত্রীদের নিকটে রাষ্ট্রের অর্থনীতি ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়েছে। ফলে, দেখানো হল মূলধনতন্ত্রে বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের সঙ্কট দেখা দেবার কোনও আপাত কারণ নেই। স্বল্পস্থায়ী সঙ্কট দেখা দিলেও, তার কারণ অন্যত্র। এক্ষেত্রে অর্থনীতির নমনীয়তাই বাণিজ্যসঙ্কটের বিরোধী। অর্থনৈতিক জগতে একের যোগান অপরের চাহিদারই প্রতিফলন, বা উল্টোটা। ফলে যদি দেশে উৎপাদনের উপাদানগুলির এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্বতঃ গমনাগমন স্বচ্ছন্দ থাকে, তবে ক্রেতাদের রুচি অনুযায়ী, যে দ্রব্যের চাহিদা বেশি সে দিকেই তাদের সঞ্চালন ঘটবে। এবং প্রতিটি উদ্যোক্তা বাজারের অতি অল্প দ্রব্যের যোগান দেয় বলে তারা দাম নির্ণয়ে প্রভাবিত করতে পারবে না। মজুরের মজুরী বাড়াবার প্রয়োজন নেই, কেন না যে শিল্পে মজুরী বেশি হবে, অন্যান্য সুবিধা অসুবিধা স্থির থাকলে, সে শিল্পে মজুরের যোগান বেড়ে যাবে, ফলে বর্ধিত মজুরী কমে যাবে। বলা বাহুল্য, এই শ্রবণসুভ্যা, নয়নসুখকর, উচ্চারণে কণ্ঠরুচি তত্ত্বের গভীরে নজর এড়ানোটাই ছিল লক্ষ্য। উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদন-সম্পর্কের বৈপরীত্য কেন এ অবস্থার সঙ্কট আনবে, সে বিষয় প্রগতিশীল পাঠকের অজানা নয়। রাষ্ট্র কেন মজুরদের সুখসুবিধার দিকে নজর দেবে না তার কারণও এই Laissez faire-এর তত্ত্বের মধ্যে

বিস্তৃত। এই ধাপের পরের ধাপ একচেটিয়া মূলধনের ক্ষমতার যুগ, লেনিন যাকে 'সাম্রাজ্যবাদ, মূলধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর' বলে আখ্যা দিয়েছেন। মূলধনতন্ত্রের আদি যুগের তত্ত্ব যেমন সওদাগরী মূলধনতন্ত্র, মধ্যযুগের তত্ত্ব যেমন অবাধ প্রতিযোগিতার তত্ত্ব, তেমনি একচেটিয়া মূলধন নির্দেশিত অর্থনীতির তত্ত্বই হল 'নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্রের' তত্ত্ব।

'নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্রে'র তত্ত্বের প্রবক্তাগণ অবশ্য মূলধনতন্ত্রে যে স্থায়ী পূর্ণকর্মসংস্থান সম্ভবপর নয় তা প্রথমেই স্বীকার করে নেন। মুনাফার হার যদি হ্রাস পায়, এবং তদনুপাতে অর্থ বিনিয়োগগত অত্যধিক আয়, অর্থাৎ সুদের হার [বৃদ্ধি পায়, স্থির থাকে কিংবা হ্রাস পায়] পরিবর্তন সাহায্যকারী না হয়, তবে কর্মসংস্থান অবশ্যই হ্রাস পাবে। কীনসীয় তত্ত্বানুসারে জাতীয় আয় নিরূপিত হয় সমগ্র ভোগ্য দ্রব্য ও সমগ্র মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনমূল্যের যোগফলে; এবং এ জাতীয় আয় যখন ব্যক্তিগত আশ্রয়প্রার্থীগণ কর্তৃক ব্যয়িত হয় তখন সমগ্র অর্থনীতির আয়-ব্যয় হয় দুভাগে, ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে এবং সঞ্চয়ে ভাগ হয়ে যায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা এবং উৎপাদন মোটামুটি একই পরিমাণ থাকে, কিন্তু মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা (marginal efficiency of capital) এবং প্রচলিত সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। প্রথমটি যদি দ্বিতীয়টির বেশি, সমান ও কম হয়, তবে যথাক্রমে উৎপাদন, ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে, স্থির থাকবে এবং কমে যাবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ আর্থিক কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে যদি সুদের হার কমাতে পারে তবে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াতে পারে। আবার বড়লোকদের উপরে কর বসিয়ে, বা সরকারী ঋণ করে যদি সরকার সামাজিক সঞ্চয় পরিমাণ থেকে টাকা এনে নিজে উৎপাদন করে, কিংবা উদ্যোক্তাদের নিকটে দ্রব্য উৎপাদনের বরাত দেয়, তবে কর্মসংস্থান বাড়তে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর ব্যক্তিগত বর্ধিত আয়ের গরিষ্ঠাংশই ভোগের জন্য ব্যয় করে, সুতরাং তাদের হাতে এই টাকা এলে তা গুণকের সহযোগিতায় আরও চাহিদা বাড়াতে পারে। [ধরা যাক কোনো ব্যক্তির বর্ধিত আয় ১০০ টাকা, ঐ ব্যক্তি এবং এ সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিগণ বর্ধিত আয়ের $\frac{৩}{৪}$ অংশ ভোগ্য দ্রব্যে ব্যয় করে। ফলে প্রথম ব্যক্তি তার আয়ের ১০০×$\frac{৩}{৪}$ বা ৭৫৲ ভোগ করবে, যা তার নিকটে বিক্রেতাদের আয়, তারাও পুনরায় ৭৫×$\frac{৩}{৪}$ বা

৫৬ টাকা ২৫ ন. প. ব্যয় করবে। এইরূপে সমগ্র বর্ধিত আয় হবে

$$১০০+\frac{৩}{৪}.১০০+\frac{৩}{৪}.^{২}১০০\cdots = ১০০\left[\frac{১}{১-\frac{৩}{৪}}\right],$$

এই $\left[\frac{১}{১-\text{প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা}}\right]$ কে গুণক বলা হয়]।

ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মূলধনী দ্রব্যেরও চাহিদা বেড়ে যাবে। এবং মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভোগব্যয় বৃদ্ধির ফলে ত্বরণ ঘটবে। এই তথাকথিত ফলপ্রসূ তত্ত্বে বিশেষ ভাবে কর, ঋণ এবং সরকার কর্তৃক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বরাত দেওয়াই বেশি উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক জনসাধারণের উপরে কর বসিয়ে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমে যে সরকারী আয় হবে, তার পুনর্ব্যয়ের ফলে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়। নিম্নজীবনযাত্রার মানসম্পন্ন শ্রমিকশ্রেণীর সঞ্চয়ের পরিমাণ শূন্য কিংবা ঋণাত্মক। সুতরাং তার নিকটে কর আদায় করে তাকেই ফিরিয়ে দেওয়াতে গুণকের কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যাবে না। কিন্তু মূলধনতন্ত্রীদের কর দানের ক্ষেত্রে চাপ দিলে উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষা তাদের কমে যেতে পারে। আর কাফিঝভের মতে তাই, শ্রমিকদের উপরে যে কর বসে, তার জন্য সরকার কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ করেন না, এবং যে পরিমাণ শ্রমিকদের চাহিদা কমে সেই পরিমাণ সরকারের চাহিদা বাড়ে মাত্র, ফলে সাধারণ বিচারে দেশে ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটে না। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি পরিমাণ আয়কর বেড়েছে, এবং শ্রমিকশ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা সরকার কতখানি নিজের কুক্ষিগত ক্রয়ক্ষমতায় পরিবর্তন ঘটিয়েছে নিচে তার তালিকা দেওয়া হল :

মজুরীর উপরে আয় করের বৃদ্ধি

সরকারী আয়ব্যয় বৎসর পূর্তি ৩০শে জুনের হিসাবে

	১৯৪৩	১৯৪৭	১৯৫২	১৯৫৫	১৯[illegible]
ব্যক্তিগত আয়কর (হাজার মিলিয়ন ডলার হিসাবে)	৬'৬	১৯'৩	২০ ৩	৩১'৬	৩[illegible]
নিয়োগকারীদের দ্বারা আটক রাখা টাকা (হাজার মিলিয়ন হিসাবে)	০'৭	৯'৮	১৭'৯	২১'৩	২৪[illegible]

	১৯৪৩	১৯৪৭	১৯৫২	১৯৫৫	১৯৫৬
মজুরীর উপরে করের পরিমাণ এবং সমগ্র ব্যক্তিগত আয়করের শতকরা অনুপাত	১০'৬	৫০'৮	৬১'১	৬৭'৪	৬৮'০

অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র আয়করের দুই তৃতীয়াংশ শ্রমিকশ্রেণীই বহন করে, পরোক্ষ করের পরিমাণও ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সালে ৪১০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে গিয়ে ১০৭০ ডলারে দাঁড়িয়েছে।

মূলধনতন্ত্রের অন্যতম সঙ্কটের কারণ নিম্নভোগের সঙ্কট। সুতরাং শ্রমিক-শ্রেণীর ভোগের পরিমাণ কমিয়ে অতি উৎপাদনের সঙ্কটের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের অনুপাতে বলা যায় যে দেশের এক বৃহৎ অংশের জীবনযাত্রার মান নিম্নস্তরের। ১৯৫৪ সালের মার্কিন কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত কমিটির বিচারে দেখা যায় যে হেলার কমিটি নির্ণীত বেঁচে থাকার মানের ঢের নিচুতে মার্কিন দেশের ২ কোটি ৬৩ লক্ষ মার্কিন পরিবার, অর্থাৎ সমগ্র পরিবার-সংখ্যার ৬৩ শতাংশ, অবস্থিত আছে। অধিকন্তু ৮৩ লক্ষ পরিবার (সমগ্রের ২০ শতাংশ) হেলার কমিটি নিরূপিত পারিবারিক বাজেটের অনুকূল আয়ের শতকরা ৩৭ ভাগ কম উপার্জন করে। ১৯৫৪ সালে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ মার্কিন পরিবারের কোনরূপ সঞ্চয়ই ছিল না। অপর দিকে সমগ্র পরিবারের ৪ শতাংশের (২২ লক্ষ পরিবারের) সঞ্চয় ছিল গড়ে দশ হাজার ডলার। ভোগকারীদের ঋণ ১৯৫৬ সালে ৩৪৪০ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। এতে বোঝা যায় কী বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিকে ভোগ্যদ্রব্য কেনার জন্য ঋণগ্রস্ত হতে হয়। সুতরাং বিপুল সংখ্যক শ্রমিকশ্রেণীকে দ্রব্য ক্রয়ে বঞ্চিত করে দ্রব্য ক্রয় বৃদ্ধির এই পন্থাটি সঠিক হল না।

এ ছাড়া মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টিও ভাবা প্রয়োজন। প্রতি বছর যে বিপুল সঞ্চয় মার্কিন অর্থনীতিতে দেখা যায়, তা হল বেকার মূলধনের স্তূপ। বেকার মূলধনকে কাজে লাগাবার জন্য মার্কিন সরকার শ্রমিকশ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতা না বাড়িয়ে ঐ বেকার মূলধনকে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা করছেন। মূলধনী দ্রব্য যখন ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে অপারগ, কেননা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য বর্ধিত ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি হচ্ছে না, সে জন্য বেকার মূলধনকে ব্যবহার করা যেতে পারে অন্যবিধ কাজে অর্থাৎ অস্ত্রসজ্জার কাজে। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূলধনের একাংশ সরকার

নানাবিধ করের সহায়তায় বরাত পাঠিয়ে কাজে লাগিয়ে দিতে পারে, তা ছাড়া ঋণ গ্রহণ করেও (তাও অধিকক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত মূলধন থেকে আসে) তা কাজে লাগানো যায়। এমন কি অস্ত্র বিদেশে পাঠিয়ে, সহায়তার নামে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন চালু রাখা যায়—ফলে দেশে সংকট ঠেকা দেওয়া এবং বিদেশে বাজার রক্ষা করা সম্ভবপর। এবং একান্ত এই জন্যই ঠাণ্ডা যুদ্ধ জীইয়ে রাখা কর্তব্য বলে মার্কিন রাজনীতিকগণ মনে করেন। যৌথ মুনাফার উপরে সরকার কর বৃদ্ধি করেছেন, ফলে ১৯২৯, ১৯৩৯, ১৯৪৯ সালের যৌথ মুনাফার (হাজার মিলিয়ন ডলার বা ১০০ কোটি ডলার হিসাবে) ১·৩, ১·৪, ১০·৪ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৬ সালে দাঁড়িয়েছে ২২·০ ; ডিভিডেণ্ড ৫·৮, ৩৮, ৭·৫ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১·৯ ; অবণ্টিত মুনাফা ১৯২৯ সালের ২·৫ থেকে ১৯৫৬ সালে ৯··এ বর্ধিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই যৌথ মুনাফা যে বিপুল পরিমাণে সৃষ্ট হয়, নিচে তার সঙ্কীয়ন দেওয়া হল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ মুনাফার উপরে কর

	১৯২৯	১৯৩৯	১৯৪৯	জাতীয় গড় ১৯৫১—৫৬
জাতীয় আয় (১০০ কোটি ডলারে)	৮৭·৮	৭২·৮	২১৬·২	৩০৫·৬
যৌথ মুনাফার উপরে কর (১০০ কোটি ডলারে)	১·৪	১·৪	১০·৪	২০·৬
মুনাফার শতকরা	১৪·৬	২১·৯	৩৯·৭	৫৩·১
জাতীয় আয়ের শতকরা	১·৬	১·৯	৪·৮	৬·৭

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে শ্রমিকশ্রেণীর উপরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর কেবলমাত্র ক্রয়ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটায়—শ্রমিকশ্রেণীর হাত থেকে সরকারের হাতে। কিন্তু মুনাফার উপরে করের প্রকৃতি অন্যবিধ। উদ্বৃত্ত মূলধনের বিচারে এর সদুত্তর মিলবে। লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ, মূলধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ ধাপ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে মূলধনতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে ব্যাপক উৎপাদনের এবং মূলধনের সংহতি প্রথমত একচেটিয়া ব্যবসার পত্তন করে ; ব্যাঙ্কিং এবং শিল্পমূলধনের সংযোগ ঘটিয়ে দ্বিতীয়ত লগ্নি মূলধন বা ফিনান্স ক্যাপিটালের পত্তন ঘটায়। এই স্তরে, লেনিন দেখিয়েছেন 'অধিক পক্ক মূলধনতন্ত্র মূলধনের সঞ্চয়ন ঘটিয়ে অগ্রচারী মূলধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে উদ্বৃত্ত মূলধনের সৃষ্টি করে এবং ঐ মূলধন দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় মুনাফা লাভের

মতো লগ্নির স্থান না পাওয়ায় তৃতীয়ত মূলধনের বিদেশে রপ্তানী প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 'নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্রে' লেনিন কথিত দ্বিতীয় ধাপে সরকারী বরাত সম্মত সামরিক দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে মূলধন স্বাভাবিক সঞ্চালনের চেয়ে কিছুটা বেশি সক্রিয় থাকতে পারে। এই উদ্বৃত্ত মূলধন মূলত আপেক্ষিক এবং স্বদেশে সম্পূর্ণ লগ্নির অসম্ভাব্যতার জন্য দায়ী স্বদেশের জনগণের গরিষ্ঠাংশের নিম্ন জীবনযাত্রার মান এবং অসম উন্নয়ন, এই অসম উন্নয়ন শিল্পের চেয়ে কৃষির পাশ্চাদ্‌বর্তিতার লক্ষণাক্রান্ত। এর ফলে উৎপাদন যন্ত্রের অপূর্ণ ব্যবহার, ব্যাপ্ত বেকারী, মূলধনতন্ত্রী উৎপাদন সংগঠনে ও ব্যাঙ্কে প্রচুর লগ্নিগত বেকার মূলধন জমা পড়ে থাকে, সুতরাং বিদেশে মূলধনরপ্তানীর প্রচেষ্টা এবং টাকার বাজারে চূড়ান্ত ফাটকাবাজী দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং যৌথ মূলধনের মুনাফার উপরে কর, এই উদ্বৃত্ত মূলধনের একাংশ সরকারের হাতে গিয়ে পুনর্ব্যয়িত হবার ফলে বেকার মূলধনের সামান্য লগ্নি সম্ভবপর হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই কর আবার ছোট কর্পোরেশনগুলি থেকে বেশি তোলা হয়, এবং বরাত পাঠানো হয় বড় বড় কর্পোরেশনের দপ্তরে বেশি হারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৫১-৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৮০টি বৃহৎ যৌথ উৎপাদন সংগঠন ১১·৭ হাজার মিলিয়ন ডলার কর দিয়েছে বটে (মোট করের ১৮·৪ শতাংশ), কিন্তু সরকারী বরাত পায় সামরিক উৎপাদনের ৫৭·৯ হাজার মিলিয়ন ডলার (শতকরা কণ্ট্রাক্টের ৫৮·৮ ভাগ) ; বাকি কর্পোরেশনগুলি ৫১·৮ হাজার মিলিয়ন ডলার কর দিলেও (মোট করের শতকরা ৮১·৬ ভাগ) কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে ৪০·৫ হাজার মিলিয়ন ডলারের। অর্থাৎ বৃহৎ কর্পোরেশনগুলি ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের উপর আরোপিত করের গরিষ্ঠাংশ নিজেদের কোলে টেনে নিতে পারে।

সরকারী বাজেটের ঘাটতি মেটাতে সরকারী ঋণের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু ভবিষ্যতের ব্যয় বর্তমানের ব্যয়ের ফলে দেশের ঋণ-ব্যবস্থায় যেমন চাপ পড়ে, তেমনি ঋণ-প্রবাহ চিরটা কাল তো সমান চলতে পারেনা। ঋণ পরিশোধের জন্য কর দিতে হয় শ্রমিকদের, পরিশোধের কালে এবং ব্যয়ের কালে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে শ্রমিকশ্রেণীর আসল আয়ের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিগত ও সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির ভয়ও অনেক।—যদি আর্থিক অবস্থায় চাপ পড়ে তবে দেশের ট্রেজারি দেউলিয়াও হয়ে পড়তে পারে।

স্থতরাং নিয়ন্ত্রিত মূলধনতন্ত্রের ভাষাটি শ্রবণস্থখকর হলেও, বর্মমূলক না অস্থায়ী ভাবে অনুকূল ব্যবস্থা চালু রাখলেও তার পতন অবশ্যম্ভাবী, কেন ক্রমাগত বৈপরীত্য ও সংঘাত অর্থনীতিতে বেড়েই ওঠে। এমতাব দেশের অভ্যন্তরে যদি কোনোও পক্ষ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চাপ স্থষ্টি ক সরকারকে সামরিক কণ্ট্রাক্টের দায়মুক্ত করতে পারে, তবে অতি অল্পসম মূলধনতন্ত্রের এই অবস্থা ভেঙে পড়বে। উদ্বৃত্ত মূলধন ব্যবহারের স্থা সঙ্কুলান না হলে, সংকটের সূত্রপাত হবে, যে বিপুল ঋণব্যবস্থা গ উঠেছে, তার তলার এই মাটি বড় নরম। মিলিটারি কণ্ট্রাক্টের চোরাবা ধসিয়ে দিলে মূলধনতন্ত্রের ঋণব্যবস্থাও বহুলাংশে ধসে পড়তে বাধ্য। ফ অতি উৎপাদনের স্থায়ী সংকট দূরীভূত হতে পারে না। এর সমাধান মার্কি জনগণেরই হাতে।

আই. ওসাদস্কায়া মার্কিন অর্থনীতির অন্যবিধ সংকটের প্রতি দৃষ্টি নিব করেছেন। মুদ্রাস্ফীতিতে কাগুজে টাকার মূল্য হ্রাস পায়, এবং চাহিদা চেয়েও ঐ টাকার অধিক প্রচলন ঘটে বলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং জাতী আয় শ্রমিকশ্রেণীর স্বপক্ষে না বণ্টিত হয়ে মূলধনতন্ত্রীদের স্বার্থের স্বপ যায়। যাই হোক, মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করার জন্য নানাবিধ পন্থা বুর্জো অর্থনীতিবিদগণ প্রণয়ন করেছেন। মূল্যনিয়ন্ত্রণ তাদের মধ্যে অন্যতম কোনো কোনো লেখকের মতে শ্রমিকশ্রেণীর উপরে কর আরোপ কর ঐ টাকা, মূলধনতন্ত্রীরা মূল্যনিয়ন্ত্রণের ফলে যে মুনাফা অর্জন করতে পার না, সেজন্য তাদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া হোক। বলা হয়, শ্রমিকশ্রে মজুরীবৃদ্ধি হেতু মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়ে। স্থতরাং মজুরদের উপরে ক বাড়ুক। কিন্তু অনুৎপাদক ব্যয়মূলক সামরিক অস্ত্রসজ্জাজনিত ব্য মার্কিন অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি জীইয়ে রাখতে চায়। এবং সেজন্যই উদ্বৃ টাকা প্রচলনধারা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় না।

ডি. স্মিসলভ ব্রিটেনের সাম্প্রতিক আর্থিক ও লগ্নিগত মূলধনের বিষ আলোকপাত করেছেন। ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যে ডলার ঘাটতি ক্র দেশের অর্থব্যবস্থার উপরে চাপ স্থষ্টি করেছে। ব্রিটেনের আর্থিক ও বৈদেশি মুদ্রাবিনিময়ের বাজারের সঙ্কট মূলত মার্কিন মূলধনের প্রবেশ এবং অ

প্রতিযোগিতার ফলেই ঘটেছে। স্থতরাং এই সঙ্কট মোচনের পন্থাগুলি হলো : "immediate cessation of the arms race, the restriction of fabulous monopoly profits, and the broad expansion of trade with the socialist countries."

ফরাসী দেশে নিয়ন্ত্রিত মূলধনতান্ত্রিক অর্থনীতির তত্ত্বকে *DIRIGISME* বলা হয়েছে। শ্রী. এ. পোক্রোভস্কি দেখিয়েছেন, সরকারী চাপের ফলে কার্টেল সমবায় এবং সরকারী বিভাগে উৎপাদন মূলত একচেটিয়া মূলধন-তন্ত্রীদের স্বার্থেই স্থষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মূলধনতন্ত্র বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা নিবন্ধটিতে রয়েছে। যাই হোক, dirigisme-এর প্রবক্তাদের নিকটে মূলধনবাদী অর্থনীতির উৎপাদনের অরাজকতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষাকারী অর্থনীতিতে যথাযথ পরিকল্পনার অসম্পূর্ণতা বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদগণের বহু চীৎকৃত সংকটনিরোধী প্রতিষেধক রূপে 'নিয়ন্ত্রণী' শক্তি ব্যর্থ করে দিতে বাধ্য। তবু মূলধনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার এই পরিকল্পনা-মুখী আগ্রহ স্পষ্টত দেখিয়ে দিচ্ছে যে ব্যাপ্ত পরিকল্পনা বিধৃত উৎপাদন-ব্যবস্থার শিশু মূলধনতন্ত্রের জঠরে পরিণত হয়ে গর্ভবাস অবসানের কামনা করছে।

Regulated Capitalism বইখানি মূলধনতন্ত্রের স্বরূপ নিরূপণে কৌতূহলী পাঠকের খুবই উপকারে আসবে ॥

দিলীপ বসু

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ইতিহাস

অধ্যাপক ফ্লেমিং আমেরিকার ভ্যান্ডেরবিল্ট বিশ্ববিত্থালয়ের "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক" (International Relations) বিষয়ে শিক্ষকতা করছেন ১৯২৮ সাল থেকে এবং গত কয়েক বছর ধরে একই বিষয়ে রিসার্চ-প্রফেসারও তিনি। প্রসঙ্গত, এই ভ্যানডেরবিল্ট বিশ্ববিত্থালয় আমেরিকার এমন এক অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত যেখানে ডারউইনের ক্রমবিবর্তনের মতবাদের পঠন-পাঠনও আইনত নিষিদ্ধ।

প্রফেসর ফ্লেমিং মার্কস্‌বাদে বিশ্বাসী নন, এমন কি সোস্থালিস্ট ও তাঁকে বলা চলে না—অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মালিকানার যথেষ্ট সামাজিক ভবিষ্যত আছে বলেই তাঁর বিশ্বাস; এক কথায় আমেরিকার একটি বিশেষ রক্ষণশীল বিশ্ববিত্থালয়ের তিনি একজন বিশিষ্ট, গণ্যমান্য, 'রেসপেক্‌টেবল্‌' প্রফেসর, যাঁর মতামতকে মার্কিন দেশের কর্তৃপক্ষ ভালো চক্ষেই দেখবেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীকে বড়ো জোর উদারনৈতিক রুজভেল্‌টিয় 'নিউ ডিল্‌' ধরনের মতবাদের সমপর্যায়ভুক্ত করা চলে।

পাঁচ শতাধিক করে প্রায় ১১ শত পাতার এই দুইটি বইয়ের প্রায় প্রতি ছত্রেই রয়েছে বিশেষ শ্রমসাধ্য ও খুঁটিয়ে তথ্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টার স্বাক্ষর। ফলে সাম্প্রতিক ইতিহাসের যে কোনো ছাত্রের পক্ষে বইটি খুবই মূল্যবান। উদারনৈতিক বুর্জোয়া মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে অনেক মার্কসিস্টও একমত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। সত্যান্বেষণের যথার্থ বিষয়মুখী দৃষ্টিভঙ্গীর আর গোঁড়ামির একপেশে মনোভাব ছেড়ে ইতিহাসের মার্কসীয় বস্তুবাদী ব্যাখ্যার আশ্রয় নিলে, মূলত একই সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে—প্রফেসর ফ্লেমিংয়ের আলোচ্য পুস্তকটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

The Cold War and its Origins : Prof. D. F. Fleming. (Vol. I—1917-1950 ; Vol. II—1950-1960). Doubleday & Co. Inc. New York. 110 sh.

অবশ্য প্রফেসর ফ্লেমিংয়ের বিরাট পুস্তকের প্রতিটি ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যার সঙ্গে সবাই একমত হবেন তা নয়। বিশেষ করে প্রথম দু'টি পরিচ্ছেদে রুশ বিপ্লবের যে মূল্যায়ন তিনি করেছেন অনেকেই তা-অগ্রাহ্য করবেন।

১৯১৭-এর রুশ বিপ্লব

তবে রজনী পাম্‌ দত্তের ('সাম্প্রতিক ইতিহাস') মত মার্কসবাদীর সঙ্গে এক বিষয়ে কিন্তু তিনি একমত। তিনিও সাম্প্রতিক ইতিহাসের পর্বকাল ধরেছেন ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লব থেকে। তবে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন, যাকে বলা যেতে পারে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যাত্রারম্ভ করে।

অধ্যাপক ফ্লেমিংয়ের মতে অবশ্য রাশিয়ান্‌ বিপ্লবই যতো নষ্টের গোড়া; বিপ্লবের দ্বারা মূলোচ্ছেদ করাতে তাঁর মতে যে বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা তিনি পছন্দ না করলেও ফরাসী বিপ্লবের 'Liberty, Equality, Fraternity'-র মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের যে আপস ছিল সেটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি; এবং আর তা ছিল বলেই ১৯৪০-এ ভিসি গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল তাও তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে সঠিকভাবেই ধরা পড়েছে।

তবে রাশিয়ান বিপ্লবকে একটা প্রকাণ্ড আপদ মনে করলেও তিনি পরিষ্কার মত দিয়েছেন যে, বিপ্লবের সঙ্গে একসঙ্গে ঘর করতে হবে এবং না করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। শুধু তাই নয়, এই বিপ্লবকে অস্বীকার করার ফলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরে স্নায়ুযুদ্ধের (cold war) উৎপত্তি হয়েছে এই বিস্তারিত বিশ্লেষণের উপর তাঁর পুস্তকের প্রধান কাঠামো নির্ভর করছে। এবং আজকের দিনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ না করলে পৃথিবী ও মানবসভ্যতা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এই সিদ্ধান্তের বাস্তবতাকে তিনি স্বীকার করেছেন অকপটে।

রুশ বিপ্লব থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১৯১৭-তে রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই বিপ্লবের আগুন দাবানলের মতো সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ে। জার্মানিতে রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণীর হাতের মুঠোয় এলেও প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবে ক্ষমতা তাদের হাতে রইল না, গিয়ে পড়ল সাইড্‌ম্যান, নস্কে ইত্যাদি সোস্থাল ডেমোক্রাটদের হাতে; তাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করলেন সৈন্যদের (অধ্যাপক ফ্লেমিংও

স্বীকার করেছেন, পৃঃ ৩৬-৩৭) এবং ষোল বছর ধরে ক্রমাগত শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্যে ভাঙন ধরিয়ে শেষ অবধি ১৯৩৩-এ ফ্যাশিজমের ক্ষমতা দখলের পথ সুগম করে দিলেন।

১৯১৯-এ বেলাকুনের নেতৃত্বে শিশু হাঙ্গারিয়ান সোভিয়েত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হল রুমানিয়ার ফ্যাসিস্ট ঝটিকা বাহিনী, বুলগেরিয়াতেও প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। ওদিকে ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে ইওরোপের আটটি দেশের সৈন্যবাহিনী শিশু সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুগপৎ আক্রমণ করল। পূর্বে জাপান ও আমেরিকার সৈন্য এবং পশ্চিমে কোলচাক্‌-ডেনিকিন্‌ নামে জারের আমলের সেনানীদের আড়ালে ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ পুরোদমে শুরু হল। রাশিয়াতে আভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্রিটেনের ও ফরাসী শ্রমিকশ্রেণীর প্রবল আন্দোলন এই 'হস্তক্ষেপ'-কে রুখে দেয়। রুশ বিপ্লবের প্রথম তরঙ্গাঘাতে ইওরোপের অন্যান্য দেশে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট কায়েম না হলেও, সেই সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণী অন্তত রাশিয়ার বিপ্লবের রক্ষার্থে নিজ শক্তির পরিচয় দেয়।

এ-সমস্তই আমাদের কালের গত পঞ্চাশ বছরের জানা ইতিহাস, তবু হয়তো এক নজরে এর পর্যালোচনা করবার প্রয়োজন আছে; আলোচ্য পুস্তকেও যে চলতি বিবরণ পাওয়া যাবে, সেটার সঙ্গে ঘটনার বিবরণী হিসাবে আমরা একমত হতে পারি।

১৯২৪-এর পরে রুশিয়ার বিপ্লবের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের চরিত্র খানিকটা পাল্টে গিয়ে, সরাসরি সামরিক আক্রমণাত্মক হস্তক্ষেপের বদলে শুরু হয় জঘন্য কুৎসা প্রচার। জাল দলিলের সাহায্যে (যেমন কুখ্যাত জিনোভিয়েভ চিঠি ও আরকস তল্লাসী) বিদেশে সোভিয়েত রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে জঘন্য পীড়ন ও অত্যাচার শুরু হয় এবং আমেরিকা সোভিয়েত রাষ্ট্রকে স্বীকার করতে অসম্মত হয়। কুৎসার নমুনা হিসাবে আলোচ্য পুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠাতে অধ্যাপক ফ্লেমিং শিকাগো ট্রিবিয়ুনের ১৯২৫, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালের বহু শিরোনামা তুলে ধরে মন্তব্য করছেন :

The *Tribune* published a stream of articles which would lead its widespread readers to conclude that there was a never-ending series of revolts in Russia."

১৯৩৩ সালে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েত গভর্নমেন্টকে স্বীকৃতির

কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে ফ্লেমিংয়ের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন :

"...twenty-one other Governments, including Britain, France and Japan, had recognised the Government of the Soviet Union but that made no difference to the United States...A series of economic and political earthquakes was required to change this outlook.

"The first of there world-shaking events was the tremendous explosion of paper values in Wall Street in October 1929,···In these years of bitter bread it appeared also that the Soviet Union was not filled with unemployment and want. Under the regimentation of the Soviet planned economy everybody had a job and life went on as usual, except for some hardships caused by the disruption of world trade, this phenomenon led multitudes of Americans to develop a great interest in this strange economy which had been supposed to collapse presently, but instead our own had. What made this new system tick? Many people were not so certain that Washington should never speak to Moscow." (পৃঃ—৪৬-৪৭)।

'Regimented' এবং 'Strange economy'-র যে প্রভাব তখনকার ১৯৩৩-এর জগতে ধনতান্ত্রিক সমাজের ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর পড়েছিল তারই জন্য ধনতান্ত্রিক জগতের মুকুটমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শেষ অবধি স্বীকার করে নিতে হল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে। ত্রিশ বছরের ব্যবধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে বিশেষ করে মহাকাশ জয়ের পরে সেই আরো সঙ্কুচিত ধনতান্ত্রিক জগতকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব পরোক্ষে স্বীকার করতে হচ্ছে তার নিজের অর্থনীতিক ব্যবস্থাপনাতেও পরিকল্পনার ধারণাকে চালু করে ও অনেকাংশে প্রয়োগ করে। গতবারে যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল, এবারে তেমনি সমস্ত সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে উত্তরোত্তর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথাও তাদের চিন্তা করতে হচ্ছে।

অধ্যাপক ফ্লেমিংয়েরও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও এটা ধরা পড়েছে এ দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৮৫ পৃষ্ঠা থেকে পুস্তকের শেষ অবধি তাঁর সমস্ত জোর সেদিকে পড়েছে। তিনি বলেছেন যে, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৭-তে (সোভিয়েত ইউনি যেদিন মহাকাশে প্রথম স্পুট্নিক নিক্ষেপ করে):

"an event occurred which registered the end of 'Th American Century' (পৃঃ ৮৮৫)..."The Sputniks compelled to begin a reassessment of our paramountcy" (পৃঃ ৮৮৭); 'Th new Russia could not be 'contained' as the old had been (পৃঃ ৮৯২)।

ফ্যাশিজমের অভ্যুত্থান

১৯৩৩-এ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্কটের ফলে একদিকে যেমন সোভিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক জগৎ স্বীকার করে নিল তেমনি অন্যদি জার্মানিতে হিটলারি ফ্যাশিজমের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরে (১৯২২ সা ইতালীতে মুসোলিনী ক্ষমতা দখল করলেও) সারা ইওরোপে ফ্যাশিজমে বিভীষিকা তার আসল নগ্ন রূপে দেখা দিল।

লীগ অব নেশন্সে সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী লিটাভিন্ভ্ "সমষ্টিগ নিরাপত্তা (collective security) ব্যবস্থা গড়ে তোলবার চেষ্টা কর লাগলেন; 'বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ কন্ফারেন্সে' ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে তি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং বিশেষ করে 'আগ্রাসন"-এর সংজ্ঞা যেভা নির্ধারণ করেছিলেন, পশ্চিমী কূটনীতিকরা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে অধ্যাপক ফ্লেমিংয়ের মতে, "They (পশ্চিমী কূটনীতিকরা—সমালোচক found it impossible to believe that the dreaded Communis state really had pacific purposes•••Yet there is no reason to question the sincerity of his (অর্থাৎ লিট্ভিন্ভের তথা সোভিয়ে রাষ্ট্রের—সমালোচক) desire to prevent another war, the Sovi Union had nothing to gain by it and much to lose" (পৃঃ ৫০)।

ফ্যাশিজমের অভ্যুত্থানের জন্য ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তোষ নীতি যে মূলত দায়ী, একথা কেউই আজ আর অস্বীকার করবেন না ১৯৩৩-এ হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতা দখলের পরে ১৯৩৫ সালে ব্রিটেন জার্মানি

সঙ্গে নৌ-শক্তি চুক্তি (Anglo-German Naval Treaty) করে প্রকারান্তরে ঘোষণা করে যে, অতঃপর হিটলারের সাম্রাজ্যলিপ্সাকে চরিতার্থ করবার জন্য পূর্বদিক, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে অগ্রসর হতে হবে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করার নীতির দ্বারা ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর ক্ষমতায় আসার পথও সুরাহা হয়।

তারপর কুখ্যাত মিউনিকে চেম্বারলিনের চেক্ গণতন্ত্রকে কোরবানি করার দ্বারা কার্যত সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইওরোপের রাজনীতি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ফ্যাশিজমকে খতম করতে গিয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সোভিয়েত ইউনিয়নকে এবং একমাত্র তারই বলে ইওরোপের তথা বিশ্বরাজনীতিতে অন্যতম বৃহৎ শক্তি হিসাবে সে ফিরে আসতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের বা পরের বিশদ ইতিহাস আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, তবে আজকের স্নায়ুযুদ্ধের উৎপত্তির মূলসূত্র খুঁজতে সাম্প্রতিক ইতিহাসের এই পর্যালোচনা করা দরকার।

স্নায়ুযুদ্ধের আরম্ভ

অধ্যাপক ফ্লেমিংয়ের মতে স্নায়ুযুদ্ধের শুরু রুজভেল্টের মৃত্যুর পরে, চার্চিলের ৫ই মার্চ, ১৯৪৬ সালে আমেরিকার ফুলটন শহরের কুখ্যাত বক্তৃতায়। সত্য বটে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিত্রপক্ষের ত্রিশক্তির (সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা ও ব্রিটেন) বন্ধুত্ব ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা বিশেষ করে করেছিল জার্মান ফ্যাশিস্টরা এবং সে সময়ে কেবল সোভিয়েট নয়, আমেরিকা ও ব্রিটেনের কাছ থেকেও বারবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, যুদ্ধকালীন মিত্রতাকে তাঁরা যুদ্ধোত্তর যুগেও চালিয়ে নিয়ে যেতে চান। সেদিক থেকে চার্চিলের ফুলটন্ বক্তৃতার পূর্বে কেউ স্নায়ুযুদ্ধের ভাষা ব্যবহার করেন নি। ফুলটনে চার্চিল বললেন যে, ইংরেজীভাষী জনসাধারণের মৈত্রী ছাড়া পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নেই, তাহলে আবার প্রস্তর যুগে ফিরে যেতে হবে, কারণ ইতিমধ্যেই অর্ধ-ইউরোপে স্টাটিন্ থেকে ত্রিয়েস্ত অবধি 'লৌহ-যবনিকা' টানা হয়েছে। প্রসঙ্গত, লৌহ-যবনিকা শব্দটি চার্চিলের নিজস্ব নয়, রজনী পাম্ দত্ত পরে প্রমাণ করেছেন যে, কথাটি নাৎসীদের প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েব্‌ল্স্ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

যাই হোক, প্রফেসর ফ্লেমিংয়ের সঙ্গে এই বিষয়ে আমাদের সামান্য কিছু

মতভেদ আছে। প্রথমত, ১৯৪৫ সালের ৬ই ও ৯ই আগস্ট,হিরোশিমা-নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা হয়, সেটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে শেষ করবার জন্য নয়, তৃতীয় মহাযুদ্ধের মহড়া হিসাবে স্নায়ুযুদ্ধের প্রথম ঘোষণা। কারণ পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করার পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতে এই বোমা আসার আগে পর্যন্ত আমেরিকান কূটনীতির মূলকথা ছিল যে, তার হাতে এমন অস্ত্র আছে যার বিরুদ্ধে আর কারুর কথাটি চলবে না।

রজনী পাম দত্তের Studies in Contemporary History-র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ও পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত অধ্যাপক. ব্ল্যাকেটের 'Atomic Weapons and East-West Relations'-এও এ সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যাবে। আমেরিকার পরমাণু-বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারকে ১৯৪৪-এ যখন আন-আমেরিকান একটিভিটিস কমিটির সামনে সোভিয়েতের গুপ্তচর হিসেবে অভিযুক্ত করবার চেষ্টা করা হয়, তখন জেনারেল গ্রোভস তাঁর জবানবন্দীতে বলছেন :

"I think it important to state—I think it is well-known—that there was never from about two weeks from the time I took charge of the project any illusion on my part but *that Russia was the enemy and that the project was conducted on that basis.* I didn't go along with the attitude of the country as a whole that Russia was a gallant ally. I always had suspicions and the project was conducted on that basis, *of course, that was reported to the President.*" (Atomic Weapons and East-West Relations, by Prof. P. M. S. Blackett, পৃঃ ৭০, বাঁকা হরফ আমার)।

পারমাণবিক বোমা তৈয়ারির উদ্দেশ্য তাহলে পরিষ্কার ছিল—দরকার মতো পারমাণবিক বোমা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা যেতে পারবে; প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টেরও সেটা অজানা ছিল না। প্রসঙ্গত এই উদ্দেশ্য বা "terms of reference" নিয়ে পারমাণবিক বোমা তৈরি করবার জন্য জেনারেল গ্রোভসের নেতৃত্বে যে 'ম্যানহাট্টান প্রোজেক্ট' নামে আমেরিকার পারমাণবিক বোমার তৈরির যে রিসার্চ শুরু হয়, সেটা ঘটেছিল আগস্ট

১৯৪২-এ,—যখন ইউরোপের পূর্ব রণাঙ্গনে স্টালিনগ্রাদে ফ্যাশিজমের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিচ্ছে সোভিয়েতের লাল ফৌজ এবং তার বীরত্ব গাথা বর্ণনায় ইঙ্গ-মার্কিন গভর্নমেণ্ট সে সময় পঞ্চমুখ।

অবশ্য ১৯৩৯ সালে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও বিশেষভাবেই প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টকে অনুরোধ করেছিলেন এই গবেষণা হাতে নেবার জন্য। কারণ জার্মানিতে বৈজ্ঞানিক অটো হানের পরমাণু-কেন্দ্রীনকে ভাঙ্গতে পারার ফলে তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, হিটলার জার্মানি হয়তো পারমাণবিক বোমা তৈয়ারি করার পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। জার্মানির পরাজয়ের পর অবশ্য দেখা গেল যে, জার্মানি অটো হানের রিসার্চের ওপর বেশি ঝোঁক না দেওয়াতে পারমাণবিক বোমা তৈয়ারিতে তাদের কাজ প্রায় কিছুই এগোয় নি।

ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার হতে পারে—এই মনোভাব জেনারেল গ্রোভসের থাকলেও এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের তা অজানা না থাকলেও ইউরোপের যুদ্ধান্তে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বারবার যুদ্ধকালীন মিত্রশক্তির মৈত্রীকে যুদ্ধোত্তর যুগে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথাই বলেছেন। সেটা যে আন্তরিক ছিল, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করবার কোনো কারণ দেখি না।

রুজভেল্টের মৃত্যু আমেরিকার নীতি পরিবর্তনের সূচনা করল।

নাগাসাকি-হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধকালীন মৈত্রী নীতি থেকে পুনরায় সোভিয়েত-বিরোধী নীতিতে প্রত্যাবর্তন হিসাবে ছাড়া আর কোনো ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। অধ্যাপক ফ্লেমিংয়ের অবশ্য এই ব্যাপারে স্ববিরোধিতা আছে। তিনি বলছেন :

"In midsummer 1945 four powerful urges pushed our leaders toward the swift use of the atomic bomb: (1) to save American lives; (2) to shorten the war; (3) to announce the atomic fittingly; and (4) to minimise the expansion of Russian power in the Far East.

"In the earlier stages of the decision the first two motives were the strongest; in the final stages the last two

appear to have become decisive. At the time the first three purposes seemed to have been brilliantly achieved and the fourth in part. In perspective our success seems more doubtful." (পৃঃ ৩০৬)

আসলে প্রফেসার ফ্লেমিং-এর মনের এই দোদুল্যমানতা তাঁর উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্ববিরোধিতার পরিচয়। তবে আনন্দের কথা এই যে, সেটা কাটিয়ে উঠে তিনি অবশেষে পরিষ্কার বলছেন :

"The military results of Hiroshima were comparatively minor. The inevitable surrender of Japan was hastened a little. The political fission which flowed from Hiroshima helped powerfully to split the world by inaugurating a new balance of power conflict and arms race under conditions more dangerous than before.

"*The American decisions concerning the use of the atomic bomb definitely marked the end of the war-time alliance with the Soviet Union and the beginning of the post-war balance of power struggle.*" (পৃঃ ৩০৮)

১৯৪৫ সালে আগস্ট মাসে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করার পর বিশ্ব-রাজনীতিতে যে নতুন কূটনৈতিক পর্বের সূচনা, তাকে মোটামুটি চারটি স্তরে ভাগ করা যায়। তা হল আমাদের মতে :

(১) ১৯৪৫ সালে, যখন একমাত্র আমেরিকার হাতেই পারমাণবিক বোমা ছিল ;

(২) ১৯৪৯-১৯৫৩, যখন সোভিয়েতের হাতেও পারমাণবিক বোমা আসার পরেও হয়তো পরিমাণগত ও গুণগত হিসাবে আমেরিকাই এগিয়ে ছিল ;

(৩) তাপ-পারমাণবিক হাইড্রোজেন বোমা দু-পক্ষেরই হাতে থাকার ফলে পারমাণবিক যুদ্ধক্ষমতা দু-পক্ষেরই তুল্যমূল্য অবস্থায় পৌছল ;

(৪) তাপ-পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রও বিশেষ করে মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণের পরে তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঘটলে মানবসভ্যতার নিশ্চিত ধ্বংসপ্রাপ্তি হবেই, এই স্থির সিদ্ধান্ত।

অধ্যাপক ফ্লেমিংও নিশ্চয়ই এই স্তরভাগে আপত্তি করবেন না, কারণ তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে পারমাণবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার বিশদ ইতিহাসের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পারমাণবিক ও তাপ-পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকার একাধিপত্য ও শক্তি ঠিক যে পরিমাণে কমেছে, সেই পরিমাণেই সে ক্রমশ সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তির দিকে এগোতে বাধ্য হয়েছে।

বিষয়টি আলাদা একটি প্রবন্ধ ছাড়া স্বল্প পরিসরে পুরা আলোচনা করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে, ১৯৪৫ সালে এচিসন লিলিয়েনথাল, পরে বারুক প্ল্যানে পারমাণবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার নামে সোভিয়েত ইউনিয়নের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করার প্রচ্ছন্ন ও খানিকটা প্রকাশ্য চেষ্টাও ছিল। বলা হয়েছিল যে, কোনো দেশ (অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন) যদি আক্রমণ করে তাহলে তাকে তৎক্ষণাৎ ও সমুচিত (instant and condign) শাস্তি দেওয়া হবে পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে।

১৯৪৯ সালের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে সমর্থ হল, তখন থেকেই আমেরিকা উঠে-পড়ে লাগলো হাইড্রোজেন বোমা বা তাপ-পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে। নভেম্বর ১৯৫২ সালে আইনট-কে তাপ-পারমাণবিক বোমার পরীক্ষাও সফলভাবে সমাধা হল। কিন্তু ১৯৫৩ সাল শেষ হবার পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়নও যখন তাপ-পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ করল, তখন থেকেই দু-পক্ষের যুদ্ধক্ষমতা সমান (atomic parity) হয়ে দাঁড়ালে। এর পরে হয় সর্বাত্মক ধ্বংস, নয় সর্বাত্মক নিরস্ত্রী-করণের পথে পৃথিবীতে চিরশান্তি, এবং শ্রেণীবিহীন ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থানের পটভূমিতে নিজ নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সংগ্রামের নিষ্পত্তি—মানব সমাজের সামনে মাত্র এই দুটো পথ খোলা রইল।

নাগাসাকি-হিরোশিমাতে ধ্বংস

নাগাসাকি-হিরোশিমার পারমাণবিক বোমা (ধ্বংসক্ষমতা ২০,০০০ টন TNT Trinitrotoluene) আজকে মাত্র ক্ষেপণাস্ত্রের 'পারমাণবিক মাথা' (atomic warhead) হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা হয়েছে, কারণ সাধারণ একটি তাপ-পারমাণবিক হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসক্ষমতা হচ্ছে ন্যূনপক্ষে ৪০ লক্ষ টন TNT। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দু পক্ষ মিলিয়ে সর্বসাকুল্যে

৩০ লক্ষ টন বা তিন মেগাটন TNT ব্যবহার করা হয়েছিল আর আজকে আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরে হয়তো ব্রিটেন ও ফ্রান্সের হাতেও কয়েকটি মেগাটন বা এমন কি স্থপার-মেগাটন ধ্বংসক্ষমতা যুক্ত তাপ-পারমাণবিক বোমা আছে।

হিরোশিমাতে ইউরেনিয়াম্-২৩৫ বোমার একটি আঘাতে ৭০,০০০ লোক আর নাগাসাকিতে প্লুটোনিয়াম বোমার আঘাতে মারা যায় ৪০,০০০ লোক। ভূপৃষ্ঠের ১,০০০ থেকে ২,০০০ ফিট ওপারে এই দুটি বোমার বিস্ফোরণ করান হয় এবং বিস্ফোরণের স্থান থেকে ১½ মাইলের মধ্যেই মোট নিহত লোকের শতকরা ৯০ জনকে পাওয়া যায়। অবশ্য বোমার বিস্ফোরণের আগুনের ঝলসানিতে পরে আরো বহু লোক মারা যায়। বোমাটি যে স্থানের উপরে ফাটে, সেটিকে কেন্দ্র করে ছয় বর্গ মাইল জুড়ে সাধারণ বাড়িগুলি একেবারে ধুলিসাৎ হয়, কেন্দ্রের এক বর্গ মাইলে কোনো বাড়িই টেঁকে নি, তার বাইরে ছয় মাইলের মধ্যে দু একটি রিইন্‌ফোর্সড্ কন্‌ক্রীটের বাড়ি আধা ভেঙ্গে যায়।

অসম্ভব কোনো প্রতিরক্ষা

হিসাবে দেখা যায়—যে বৃত্ত জুড়ে ধ্বংস হয় (radius of destruction) সেই বৃত্ত ধ্বংসশক্তির তৃতীয় মূলের অনুপাতে বাড়ে কমে। এই হিসাব অনুসারে অধ্যাপক ব্ল্যাকেট লিখেছেন :

"Let us compare the number of successful aircraft sorties required to destroy an area of 400 square miles when the three types of bombs are carried. The relative number of sorties are 1 for H-bombs 50 for A-bombs and 10,000 for chemical bombs carried by bombers with a ten-ton load. These figures are alone sufficient to show why the problem of effective defence against H-bombs is almost insoluble—so few bombers can be permitted to get through." (Atomic Weapons and East-West Relations, পৃঃ ৪৭-৪৮)।

অধ্যাপক ব্ল্যাকটের উপরি উক্ত পুস্তক লেখবার সময় আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র তেরি হয় নি; অর্থাৎ বোমারু বিমানকেই মেগাটন বোমাগুলি

বয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা করা যাবে—এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেও অধ্যাপক ব্ল্যাকেটকে শেষ অবধি সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, অন্তত একটি বোমারু বিমানও যদি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এড়িয়ে তার লক্ষ্যস্থলে পৌছতে পারে তো তার হাইড্রোজেন বোমার আঘাতেই ভয়াবহ ধ্বংস হবে এবং নিশ্চয়ই এটা দু পক্ষেই হবে।

আর আজ আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশগমনকারী শক্তিশালী রকেটে আমেরিকা-সোভিয়েটের মধ্যবর্তী দূরত্ব পার হতে পারে মাত্র কয়েক মিনিটে, এবং বলা বাহুল্য, সেই ক্ষেপণাস্ত্রের শীর্ষদেশে সুসজ্জিত থাকবে স্থপার মেগাটন বোমা। এই অবস্থাতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে সময় পাওয়া যাবে মাত্র এক মিনিট বা তার চেয়ে সামান্য বেশি সময়। অবশ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলতে কেবলমাত্র সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথাই এখানে বলা হচ্ছে, জনপদ ও জনসাধারণকে বাঁচানোর ব্যবস্থার চেষ্টা করাও বাতুলতা মাত্র হবে।

ভবিষ্যতের পথনিদেশ

এমত অবস্থায় মানবসভ্যতার আত্মনিধনের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অধ্যাপক ফ্লেমিং বাস্তববাদী হিসেবে তা বুঝেছেন। স্পুটনিক উৎক্ষেপণের পর থেকেই তিনি বুঝেছেন যে, 'American Century'-রির কোনো আশা নেই, কাজেই "ভবিষ্যৎ" (the future) নামে পুস্তকের শেষ পরিচ্ছেদের একেবারে শুরুতেই বলছেন : "That the coming era will not be 'the American Century' seems to be already decided." (পৃঃ ১০৭৫)।

আজকের পৃথিবীতে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক যতগুলি সমস্যা আছে, যেমন বার্লিন, কোরিয়া, লাওস, ইত্যাদি, সেগুলি একের পর এক আলোচনা ও সমাধানের রাস্তা বাৎলে (শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্তি বজায় রাখবার দিক থেকে) দিয়ে তিনি লিখছেন :

"Antagonistic coexistence is a welcome advance from the white heat of the cold war. It is a carefully reasoned and moderately stated position, but the question remains whether it is more than a transitional program toward a more friendly

coexistence. It was an excess of antagonism which lost us the cold war." (পৃঃ ১১০৫)।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দ্বারা যুদ্ধের সম্ভাবনাকে দূরীভূত করতে হলে চাই সর্বাত্মক নিরস্ত্রীকরণ এবং অবিলম্বে অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ। অধ্যাপক ফ্লেমিং-এর সঙ্গে একমত হয়ে আমরাও বলতে পারি :

"We have reached the point in the words of Noel-Baker's informed warning, where the politics misnamed defence may bring the final consummation of the use of force, the end of man. This is the fate for which we are all lived up, attempting to defend the undefendable and to be always ready to destroy the enemy totally. Nothing less than a sweeping world disarmament treaty can restore the safety of mankind and this will never be achieved unless we constantly remember that the the romanticists are those who still believe that modern armaments can make a nation safe.' It will not be achieved either without the powerful compulsion of public opinion and without resolute leadership." (পৃঃ ১১১৩)।

সুজয় মিত্র

সমাজবাদ ও যুদ্ধ

বেশ কয়েক বছর ধরে চীনা নেতারা যুগোশ্লাভিয়াকে "আধুনিক শোধনবাদের" কেন্দ্র বলে অভিহিত করে তীব্র রাজনৈতিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম প্রথম এই অভিযানে বিশ্বের প্রগতিশীল মহল বিশেষ বিচলিত হন নি, কারণ যুগোশ্লাভিয়া সম্বন্ধে একটা সন্দেহের ভাব অনেকের মধ্যে বহুদিন থেকে ছিল। বোধহয় সেই কারণেই যুগোশ্লাভিয়াতে টিটোর পরেই যাঁর স্থান, সেই এড্ওয়ার্ড্ কার্দেলি লিখিত 'সমাজবাদ ও যুদ্ধ' নামক বইটি প্রথম প্রকাশের সময় আমাদের দেশে অন্তত বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি।

১৯৬০-এর তুলনায় আজ অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কার্দেলির একটি কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে—চীনাদের কাছে যুগোশ্লাভিয়া ছিল উপলক্ষ্য মাত্র, তাঁদের অভিযানের আসল উদ্দেশ্য হল গোটা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আন্তর্জাতিক নীতির সংশোধন। চীনের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে যাঁরাই একমত হতে পারছেন না, আজ তাঁদেরই বলা হচ্ছে শোধনবাদী। স্বাভাবিক ভাবেই এই অবস্থায় যুগোশ্লাভিয়ার নেতাদের বক্তব্য কি, ছুৎমার্গ পরিহার করে তা জানবার ইচ্ছা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলে দেখা দিয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা কার্দেলির লেখার মধ্যে হয়তো সত্যই কিছু শোধনবাদের আভাস খুঁজে পাবেন, তাঁর প্রত্যেক যুক্তির সঙ্গে নিশ্চয়ই সকলে একমত হবেন না। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে যুদ্ধরোধের সম্ভাবনা, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিভিন্ন পথ, ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নে চীনা নীতির এত বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা একটি লেখার মধ্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য যুগোশ্লাভিয়ার নেতার পক্ষে একটা

Socialism and War : Edvard Kardelj (August 1860). Indian Edition, Hans Publishers, Bombay (1961)

সুবিধা আছে—কূটনৈতিক কারণে চীনকে আলবেনিয়া বলে ঝিকে মো বৌকে শেখানোর কৌশল তাঁকে গ্রহণ করতে হয় নি। পরবর্তী ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্দেলির যুক্তিকে আরো শক্তিশালী করেছে, নাকচ করেনি। চীনা নীতির বাস্তব প্রতিক্রিয়া, আর মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিনের বক্তব্যে সঙ্গে তার বিরাট প্রভেদ, এই দুই দিক থেকে আলোচনা করে কার্দে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, যে চীনের বর্তমান নেতৃত্বকে শুধু গোঁড়ামি বা মতান্ধতার জন্য অভিযুক্ত করলে সবটা বলা হয় না। কয়েকটি মৌলিক ক্ষেত্রে তাঁরা মার্কস্‌বাদের ধ্রুপদী নীতি থেকে পর্যন্ত বিচ্যুত হয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কার্দেলি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন চীনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান অবদানের কথা, আশা প্রকাশ করেছেন যে শীঘ্র হোক কিছু দেরিতে হোক, চীনের জনগণ ও পার্টি তাঁদের ভুল শুধরে নেবার ক্ষমতা নিজেদের মধ্যেই খুঁজে পাবেন। চীনকে কোনঠাসা করে রাখবার পশ্চিমী নীতির কঠোর সমালোচনাও তিনি করেছেন। মনে রাখতে হবে চীনা সংবাদপত্রে যুগোশ্লাভিয়ার নেতাদের অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের দালাল ইত্যাদি বলে হামেশাই বর্ণনা করা হয়। তাই কার্দেলির সংযম ও ভদ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। গালাগালি অপেক্ষা যুক্তিতর্ক তাঁর অস্ত্র, প্রকৃত মার্কস্‌বাদীর মতো তিনি চীনা বিচ্যুতির কারণ খুঁজবার চেষ্টা করেছেন সে দেশের বাস্তব অবস্থার মধ্যে। সব মিলিয়ে বইটির বহু প্রচার নিশ্চয়ই কাম্য—অবশ্য ইংরাজি অনুবাদটি আর একটু ভালো ও সুখপাঠ্য হলে সুবিধা হত।

যুগোশ্লাভিয়ার (আর আজ বিশ্বের বেশির ভাগ কমিউনিস্ট পার্টির) বিরুদ্ধে চীনের অভিযোগ কি? সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধকে তাঁরা ভয় পান তাই যুদ্ধ যে অনিবার্য সেই লেনিনীয় নীতি পরিত্যাগ করে তাঁরা নতজানু হয়ে আমেরিকার কাছে শান্তি ভিক্ষা করছেন। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ও সমাজতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৌছুবার কথা বলে তাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম থেকে দূরে চলে আসছেন, মার্কসবাদ সংশোধন করছেন। চীনা নীতিতে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরাই একমাত্র প্রকৃত বিপ্লবী—বাকীরা সুবিধাবাদের পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছেন। তিন বছর পরে আজ ভাষার আরো কিছু উন্নতি হয়েছে—এখন

তাই সরবে বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর কমিউনিস্ট নেতাদের একটা বড় অংশ "ইঁদুরের মতো ভীতু"।

লেনিন থেকে কিছু উধৃতি দিয়ে চীনের নেতারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, যে যুদ্ধ আজও অনিবার্য, কারণ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র তো বদলায় নি। সাম্রাজ্যতন্ত্র সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবার আগে যুদ্ধবিহীন অস্ত্রবর্জিত পৃথিবী স্থাপনের আশা তাই অলীক ভাববিলাস মাত্র। কিন্তু লেনিন তো শুধু একটা ফতোয়া জারি করেন নি, পঞ্চাশ বছর আগেকার পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করেই তিনি দেখিয়েছিলেন, যে শান্তির শক্তি সেদিন ছিল আপেক্ষিকভাবে দুর্বল, তাই যুদ্ধের দিকে সাম্রাজ্যবাদের স্বাভাবিক ঝোঁক পরাস্ত করা ছিল কঠিন। আজকের দিনের অবস্থা সম্যক পর্যালোচনা না করে শুধু লেনিনের সে যুগের সিদ্ধান্তটুকু তুলে ধরার অর্থ কি? বাস্তব পর্যালোচনা বাদ দিয়ে মন্ত্র আওড়ানো কি প্রকৃত লেনিনবাদ?

কার্দেলির মতে, যুদ্ধ অনিবার্য এ তত্ত্ব আজ আঁকড়ে ধরার পেছনে দুই ধরনের কারণ থাকতে পারে। হতে পারে চীনের নেতারা আমাদের যুগের নতুন সম্ভাবনাকে সত্যিই বুঝছেন না, যে-যুগে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমবর্ধমান পরাক্রম, সদ্যস্বাধীন জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির নীতি, বিশ্বজোড়া শান্তি আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি ও সংগ্রাম, সব মিলিয়ে যুদ্ধের পথে এক প্রবল বাধা সৃষ্টি করছে, আবার অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রমেই হয়ে পড়ছে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন। অথচ এই চীনারাই বলেন, যে সাম্রাজ্যবাদ হল "কাগুজে বাঘ" মাত্র! তর্কের মধ্যে অসংগতিটা লক্ষণীয়। পারমাণবিক যুগে যুদ্ধের প্রকৃতির যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে, যার ফলে সামরিক টেক্‌নিক্‌ই এক হিসেবে যুদ্ধের পথে বাধা সৃষ্টি করছে, এ কথা মানতে বাধা কোথায়? উধৃতি সহকারে কার্দেলি দেখিয়েছেন, যে মার্কসের মতে ১৮৭০-এর পর ইওরোপে আপেক্ষিক শান্তি প্রতিষ্ঠার একটা কারণ ছিল নতুন সামরিক টেকনিক, যার ফলে যুদ্ধের ঝুঁকি কিছুদিন সহজে কেউ নিতে চাইছিল না। [পৃঃ ৪১]

কিন্তু চীনা মতবাদের অপর একটি ভিত্তি থাকতে পারে, যা বোধহয় আরো সাংঘাতিক। চীনের নেতারা কি ভাবছেন, যে যুদ্ধই হল সমাজবাদের বিপ্লবী অস্ত্র, বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমেই সব থেকে সহজে ও তাড়াতাড়ি সাম্রাজ্যতন্ত্রকে ধ্বংস করে সুখি পৃথিবী গঠন করা যাবে? কোনো কোনো চীনা লেখা পড়লে সে রকম ধারণাই তো হয়। পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ চরিত্রের কথা বললে

চীনারা প্রতিবাদ করেন—"সাম্রাজ্যবাদীরা পারমাণবিক যুদ্ধ আরম্ভ করলে তাদেরই অতিদ্রুত পতন হবে, মানবজাতি কখনই ধ্বংস হবে না… সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপের উপর বিজয়ী জনসাধারণ খুবই তাড়াতাড়ি হাজারগুণ উন্নত এক সভ্যতা গড়ে তুলবে…।" ['লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক,' এপ্রিল ১৯৬০] সঙ্গে সঙ্গে চীনারা বলেন, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান একটা সাময়িক কৌশল মাত্র, সমাজতন্ত্রের মৌলিক নীতি নয়। কিন্তু কার্দেলি ঠিকই লিখেছেন, নিছক সাময়িক সহঅবস্থানের জন্য কোনো চেষ্টার প্রয়োজন নেই, তা তো আপনা থেকেই এখনো রয়েছে। প্রশ্ন হল, সহঅবস্থানকে মৌলিক নীতি বলে গ্রহণ করে আমরা কি কার্যক্ষেত্রে সমস্ত সম্ভবপর উপায়ে যুদ্ধ আটকানোর চেষ্টা করব, নাকি 'যুদ্ধ হলেও ক্ষতি নেই' এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপস-প্রস্তাব মাত্র অগ্রাহ্য করে পৃথিবীকে যুদ্ধের কিনারায় ফেলে রাখব? দ্বিতীয় পন্থাটির সঙ্গে ডালেস নীতির পার্থক্য কোথায়?

কার্দেলি বলেছেন, যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দায়িত্বও অনেক বেড়ে যাচ্ছে, তাদের উপরে সমগ্র বিশ্বের ভাগ্য, মানব সমাজের ভবিষ্যৎ, এখন অনেকটা নির্ভর করছে। এই অবস্থায় চীনা নীতি, সজ্ঞানে না হলেও বাস্তব পরিণামে, পৃথিবীকে কোন দিকে নিয়ে যাবে? ১৯৬০-এর পরের তিন বছরের চীনা লেখা এবং কাজ এই প্রশ্নের উত্তরকে আরো স্পষ্ট, আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। তাঁদের সর্বাধুনিক কিছু লেখায় [যথা—'কমরেড তোগলিয়াত্তির সহিত আমাদের মতপার্থক্য'—ডিসেম্বর ১৯৬২] চীনারা স্বীকার করেছেন যে বিশ্বযুদ্ধ রোধ করা সম্ভব, কিন্তু শান্তি রক্ষার উপায় সম্বন্ধে তাদের মতটি এখনও যথেষ্ট ভীতিপ্রদ। আপসহীন সংগ্রাম, "আঘাতের বদলে আঘাত", "মুখোমুখি সংঘর্ষ" ("blow for blow", "head-on clash")—এ রকম কথার ছড়াছড়ি তাদের রচনায়। কার্যক্ষেত্রে এ-সবের অর্থ তো ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে বেশ ভালো করে বোঝা গেছে। আগুন নিয়ে খেলতে খেলতে আগুন লেগে গেলে দাম দিতে হয় অবশ্য তত্ত্ববিদদের নয়, অসংখ্য জনসাধারণকে। লক্ষ্যসিদ্ধির অন্য পথ আদৌ থাকলে যুদ্ধের পথে পা বাড়ানো মূঢ়তা ছাড়া আর কি।

যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ দেশজয় করে গায়ের জোরে বিপ্লব রপ্তানি করা—চীনা তর্কগুলি যে তাদের নিজস্ব লজিকে এই বক্তব্যে গিয়ে পৌঁছয়, এই সিদ্ধান্ত আরো দুটি তত্ত্ব আলোচনা

করে কার্দেলি প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন। চীনের নেতাদের একটি অভিযোগ হল, ঢালাওভাবে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার চালিয়ে "আধুনিক শোধনবাদীরা" ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্যের মার্কসবাদী তত্ত্বটি অস্বীকার করছেন। তাঁরা অন্যায় যুদ্ধের বিপক্ষে, কিন্তু ন্যায়যুদ্ধ সমর্থন করেন। প্রথম দৃষ্টিতে বিশেষ আপত্তিকর না হলেও এই তর্কের মধ্যে দুটি গলদ আছে। প্রথমত, সমাজতন্ত্র আক্রান্ত হলে তার রক্ষার জন্য যুদ্ধের ন্যায্যতা সম্বন্ধে কোনো মার্কসবাদীর মনে সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোনো যুদ্ধ ন্যায্য বলেই কি সেটা কাম্য, বিশেষ করে আজকের দিনে, সভ্যতাধ্বংসকারী পারমাণবিক অস্ত্রের যুগেও? বরং যুদ্ধ আটকানোর সাধ্যমত চেষ্টা করাই কি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রাথমিক কর্তব্য নয়? দ্বিতীয়ত, কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের পক্ষে একটি অন্যায় যুদ্ধ আরম্ভ করা কি তত্ত্বগত দিক থেকে একেবারে অসম্ভব? কার্দেলির এই প্রশ্ন আজকের দিনে আমাদের দেশে ভবিষ্যৎবাণীর মতো শোনায়। সকলেরই জানা আছে, সমাজতান্ত্রিক দেশ কখনো কোনো অবস্থাতেই আক্রমণকারী হতে পারে না, এই অন্ধবিশ্বাস ভারতীয় মার্কসবাদী মহলে কি পরিমাণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। সমাজতন্ত্রের পক্ষে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, এই সত্যটি থেকে এমন সিদ্ধান্ত টানার কি কোনো যৌক্তিকতা ছিল, যে কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতারা একটি বিশেষ সময় এমন একটা ভুল করতে পারেন না? সমাজবাদী নেতারা কি কোনো ব্যাপারে কখনও ভুল করেন নি? বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ লেনিনের মনে এধরনের মোহ কোনোদিন স্থান পায়নি—"সামাজিক বিপ্লব করে ফেললেই প্রলেটারিয়েট দুর্বলতা বা ভুলের সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পাবে না। তবে শেষ পর্যন্ত নিজের ভুলই (আর স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যের ঘাড়ে চাপার ব্যর্থ চেষ্টা) তাকে সত্য পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। [কার্দেলি কর্তৃক উধৃত, পৃঃ ৭৭]

"আধুনিক শোধনবাদের" বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ, অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ উপায়ে, পার্লামেন্টকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে, সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু চীনাদের মতে বিপ্লবের অর্থই হল "বিপ্লবী যুদ্ধ", শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সম্ভাবনা এতই কম যে সে-বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহঅবস্থান, আর দেশের ভিতরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা;

দুটোই হল "আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রাম" পরিত্যাগ করার নামান্তর। অথচ একথা সুবিদিত যে, বিপ্লবের রূপ সব দেশে সব কালে এক হয় না (যেমন বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া বিপ্লবের ইতিহাসে ফ্রান্সের মতো তীব্র সংগ্রাম আমরা আর কোথাও দেখি না)। আর অবস্থাবিশেষে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ রূপান্তরের সম্ভাবনা স্বয়ং মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিন কেউই তো একেবারে নাকচ করেন নি। সমাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সম্ভাবনা অন্তত কোনো কোনো দেশে বাস্তব রূপ গ্রহণ করতে পারে না কি? যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নের সঙ্গে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সমস্যাকে চীনারা যেভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই "শোধনবাদের" বিরুদ্ধে যেরূপ তীব্র অভিযান তাঁরা আরম্ভ করেছেন, কার্দেলির মতে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রশ্ন জাগে, "আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রাম", যার থেকেই নাকি "শোধনবাদীরা" বিচ্যুত হয়েছেন, এই কথাটি বলতে চীনারা ঠিক কি বুঝছেন? এর অর্থ কি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এক চূড়ান্ত শক্তি-মীমাংসা (অর্থাৎ যুদ্ধের) জন্য প্রস্তুত হওয়া, যার অংশরূপে প্রত্যেক দেশে সশস্ত্র বিপ্লব দেখা দিতে বাধ্য?

চীনা লেখায় তাহলে বিশ্বযুদ্ধ ও সমাজতন্ত্রের বিশ্বজয়, সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তর, সব কিছু এক করে দেখা হচ্ছে। মার্কসবাদের প্রামাণ্য সাহিত্য থেকে বিস্তর উধৃতি দিয়ে কার্দেলি প্রমাণ করেছেন যে, এই ধরনের অতি-বাম মতবাদের তীব্র সমালোচনা আগে বহুবার করা হয়েছে। চীনের নীতি তাই শুধু মতান্ধতার দোষে দোষী নয়, ট্রটস্কিবাদের মতো তা মার্কসতত্ত্ব থেকে গুরুতর এক বিচ্যুতি। এখানে লেনিনের দুটি স্বল্প-পরিচিত উধৃতি তুলে দেবার লোভ সংবরণ করা গেল না। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা, অথচ পড়লে মনে হয় লেখাগুলি যেন আজকের দিনের চীনা নীতি ও তার সমর্থকদের উদ্দেশ্যেই লিখিত।

"এই লেখকেরা বোধহয় মনে করেন, আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনোমতেই শান্তি স্থাপন করা উচিত নয়।...এ মত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।...এঁরা বুঝি ভাবেন, আন্তর্জাতিক বিপ্লবকে বাইরে থেকে খুঁচিয়ে তোলা দরকার, আর খোঁচানোর উপায় সর্বদাই যুদ্ধ, কোনোমতেই শান্তি নয়, কারণ শান্তি স্থাপিত হলে জনসাধারণের মনে সাম্রাজ্যবাদকে 'আইনসম্মত' করে তোলা হবে? এ রকম কোনো থিওরি মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। মার্কসবাদ বিপ্লবকে খুঁচিয়ে তোলার বিরুদ্ধে, কারণ শ্রেণী-

সংঘাত একটা পর্যায়ে না পৌছলে বিপ্লব সম্ভব নয়। এ যেন এমন এক থিওরি, যার মতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানই হল গিয়ে সর্ব অবস্থায় সংগ্রামের একমাত্র রূপ।" [কার্দেলি, পৃঃ ৫৬]

এস্টোনিয়ার সঙ্গে এক সীমান্ত-চুক্তির সমর্থনে লেনিন বলছেন—

"এই চুক্তিতে আমরা বেশ কিছু এলাকা ছেড়ে দিয়েছি, এমন সব এলাকা, যা জাতিগত আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুযায়ী আমরা ত্যাগ করতে বাধ্য ছিলাম না। কিন্তু এইভাবে আমরা কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করলাম যে, আমাদের কাছে সীমানার প্রশ্ন বড় কথা নয়। আমাদের কাছে বড় হল শান্তিপূর্ণ সম্পর্কস্থাপন, প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ বিকাশের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে প্রস্তুত। তাছাড়া এই নীতি দ্বারা আমরা শত্রুদেশেরও আস্থা অর্জন করতে পারলাম।" [কার্দেলি, পৃঃ ৫৪]

যথার্থ মার্কসবাদের সঙ্গে এই অসঙ্গতি ছাড়াও বাস্তব কার্যক্ষেত্রে চীনা নীতির পরিণাম কি? প্রথমত বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কাবৃদ্ধি—আর কার্দেলির মতে সে-যুদ্ধে পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশের জয় হলেও বিশ্ব-অর্থনীতির এত প্রচণ্ড ক্ষতি হবে যে তার ভিত্তিতে উন্নত সমাজ-গঠন হাজার-গুণ কঠিন হয়ে উঠবে। কারণ মার্কসবাদের একেবারে গোড়ার কথা হল, সমাজতন্ত্র শুধু সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তার জন্য চাই উন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাই দেখিয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে চীনা নীতির বিষময় ফল। সহঅবস্থান নীতির জন্য বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষতি হয় নি—আন্তর্জাতিক উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হবার যুগেই আফ্রিকা ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল চূর্ণ করে দিচ্ছে, লাটিন আমেরিকায় দেখা দিয়েছে সমাজতন্ত্রের আলোকবর্তিকা। অথচ ঠিক একই সময়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সীমানা ইত্যাদি প্রশ্নে ঝগড়া খুঁচিয়ে তোলার ফলে এশিয়ার মানুষের মনে চীন সম্বন্ধে দেখা দিচ্ছে বীতশ্রদ্ধ ভাব, সন্দেহ, এমনকি ভয়।

চীনা নেতাদের মতে শান্তি আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ খুলে দেওয়া। সামগ্রিক অস্ত্রবর্জন ইত্যাদি দাবির এর বেশি সার্থকতা নেই, সাম্রাজ্যতন্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস হবার আগে তা কার্যকরী হতে পারে এমন কোনো আশা পোষণ করা হল গিয়ে বুর্জোয়া প্যাসিফিজম। অর্থাৎ কমিউনিস্টরা একথা পরিষ্কার মনে রাখবে আর বলবে যে শান্তি

আন্দোলন তাদের কাছে শত্রুকে বেকায়দায় ফেলার একটা রাজনৈতিক কৌশল মাত্র, আসলে যুদ্ধ অনিবার্য। তার পরেও অবশ্য বাইরের লোকে ভেড়ার মতন দলে দলে তাদের আন্দোলন সমর্থন করবে! কার্দেলি আরো প্রশ্ন তুলেছেন, পশ্চিমী দেশের শ্রমিক-আন্দোলনের গুরুত্বের বিষয়ে চীনারা অনেক কিছু বললেও সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে তাদের ধারণা কি অনেকটাই মনগড়া নয়? শ্রমিকেরা সর্বদাই বিপ্লব করতে ইচ্ছুক, বিশ্বযুদ্ধ হলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র অভ্যুত্থান আরম্ভ করে দেবেন—এসব কথা ভাবতে ভালো লাগতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণীর উপর কমিউনিস্টদের তুলনায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রভাব কিছু কম নয়, এবং শ্রমিকশ্রেণীর অন্তত একটা বিরাট অংশ মোটেই পারমাণবিক ধ্বংসের ঝুঁকি নিয়ে সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত নয়। উগ্রবিপ্লবী বাক্যবাণ বা গালাগালি তাঁদের শুধু আরো দূরে সরিয়ে দেবে—বরং শান্তি-আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই এই শ্রমিকদের ক্রমশ সমাজতন্ত্রের দিকে টেনে আনতে পারে। শান্তি আন্দোলনের লক্ষ্য মোটেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখা নয়, কার্যকরী দাবির পিছনে পৃথিবীর জনসাধারণের বিরাট অংশকে সমবেত করে পদে পদে সাম্রাজ্যবাদকে পিছু হটিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। তাই শান্তি আন্দোলন আজকের দিনে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য সংগ্রামেরই একটি অংশ, দু-এর মধ্যে চীনে-দেওয়াল সৃষ্টি করা উচিত হবে না।

অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্যদানের কোনো আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার কথা উঠলেই চীনা নেতারা তাকে সাম্রাজ্যতন্ত্রী মূলধন রপ্তানি বলে উড়িয়ে দেন। সে ভয় যে আছে তা কার্দেলি স্বীকার করেছেন, কিন্তু কথা হল আজকের দিনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা পশ্চিমী দেশকেও সাহায্যের শর্ত কিছুটা পরিবর্তিত করতে বাধ্য করছে। তাই পশ্চিমী সাহায্য নিলেই কোনো দেশ তৎক্ষণাৎ তাঁবেদার হয়ে যায় না, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আকর্ষণ ভারসাম্য বজায় রাখে। উগ্র বামপন্থীদের মনে বোধহয় আর একটি ভয় আছে—অর্থনৈতিক কিছু উন্নতি হলে যদি জনসাধারণের বিপ্লবী মনোভাব নষ্ট হয়ে যায়! (আমাদের দেশে এ-ধরনের চিন্তার নিদর্শন বেশ সহজেই মেলে না কি? একে পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবীত্ব বলা অন্যায় হবে না।) ইতিহাসে বিপ্লব কিন্তু দুর্দশার যান্ত্রিক প্রতিফলন নয়, আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য চাই সংগঠিত আধুনিক শ্রমিক-শ্রেণী—

তাই বৈদেশিক সাহায্যলাভের ফলে যদি সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি পুরনো ধরনের পুঁজিবাদের দিকেও অগ্রসর হয়, পিছিয়ে-পড়ে থাকার চেয়ে তাও শ্রেয়। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণের ফলে আজ অনগ্রসর দেশে অ-ধনতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক শিবির যদি সাহায্য বন্ধ করে দেয়, সদ্য-স্বাধীন দেশের জাতীয় বুর্জোয়াকে একেবারে শত্রু বলে গণ্য করে, তাহলে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তাদের নিজের দলে টেনে নেওয়া বিশেষ কঠিন হবে না।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাহলে দেখা যাচ্ছে, উগ্রবামপন্থী বাগাড়ম্বরের ফল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা, কার্যক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া—এবং এ-অবস্থা থেকে সুবিধাবাদী কার্যক্রমে পৌছতে অনেক সময়ে বেশি দেরি হয় না। কার্দেলির বই বেরোবার কিছুদিন পরে এর উদাহরণ আমরা পেলাম চীন-পাকিস্তান মৈত্রীতে। অথচ এই ভ্রান্ত নীতিই চীনা নেতারা চাপানোর চেষ্টা করছেন সমগ্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর।

ঐতিহাসিক কারণে যুগোশ্লোভিয়া কমিউনিস্ট আন্দোলনে কোনো একটি দেশ, পার্টি বা নেতার আধিপত্য (hegemony) বিস্তারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে খুবই—হয়তো কিঞ্চিৎ অতিমাত্রাতেই—সচেতন। বিরাট পৃথিবী-জোড়া আন্দোলনের যে আজ আর এক বা একাধিক কেন্দ্র থাকতে পারে না, মার্কসবাদের মূলনীতির কাঠামোর মধ্যে থেকে প্রত্যেক পার্টিকে যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজ অবস্থা অনুযায়ী নিজের মতো চিন্তা করতে হবে, কোনো রকম গুরুবাদ (সে মস্কো বা পিকিং—যেখান থেকেই আসুক না কেন) যে আজ অচল—এই ধরনের চিন্তা আজ অনেক দেশের মার্কসবাদীদের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে। কার্দেলির পুস্তকেরও এই হল একটি প্রধান বক্তব্য।

চীনা নীতির সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে সে-নীতির বাস্তব কারণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কার্দেলি করেছেন। এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো বোধহয় সম্ভব নয়, তবে কার্দেলির বক্তব্যগুলি নিশ্চয়ই প্রণিধানযোগ্য।

তাঁর বইয়ের গোড়াতেই [পৃঃ ১১] কার্দেলি মন্তব্য করেছেন, কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে গুরুতর বিচ্যুতি ঘটলে প্রগতিশীল মহলে অনেক সময়ে দুই ধরনের ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হয় চেষ্টা চলে বুর্জোয়া অপপ্রচার বলে সব কিছু উড়িয়ে দেবার, অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরা হয় এমন সব 'যুক্তি'-কে,

যে সমাজতান্ত্রিক দেশে কখনও অত্যাচার থাকতে পারে না, সমাজতান্ত্রিক দেশ কিছুতেই আক্রমণকারী হতে পারে না, ইত্যাদি। যখন বাস্তবকে অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন আবার এক লাফে অন্য প্রান্তে চলে গিয়ে অনেকে বলতে শুরু করেন, দেশটা আদৌ সমাজতান্ত্রিক নয়, কিংবা হয়তো মার্কসবাদের মধ্যেই কোথাও গলদ আছে। উভয় ভুলের সূত্র কিন্তু একই—সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে অতি-রোমান্টিক এক ছবি, যেন বিপ্লবের পরদিন থেকেই নতুন সমাজ একেবারে দোষমুক্ত হয়ে দেখা দিতে বাধ্য। আসলে সমাজতন্ত্র কিন্তু বিমূর্ত আইডিয়া নয়, অত্যন্ত জটিল এক বাস্তব প্রক্রিয়া, যার মধ্যে আবার অন্তর্দ্বন্দ্ব ডায়েলেক্‌টিক্‌স্‌-এর নিয়ম অনুযায়ীই না থেকে পারে না। স্রোতের গতি মোটামুটি ঠিক দিকে, কিন্তু পথে আবর্ত থাকতে পারে, জলটাও হতে পারে বেশ কিছুটা ঘোলাটে। সমাজতান্ত্রিক গঠনপর্বে পুরাতন সমাজের ভগ্নাবশেষ তো অনেক দিন পর্যন্ত বাধা দিতেই থাকে, তাছাড়া কার্দেলির মতে গঠনপ্রক্রিয়ার নিজস্ব কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে—যেমন পার্টি-নেতৃত্ব ও শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজন একটা পর্যায়ে থাকলেও তার থেকে আমলাতান্ত্রিক বিচ্যুতির সম্ভাবনা যথেষ্ট। [পৃঃ ১৩১-১৩২] সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে মতপার্থক্য অস্বাভাবিক বা সর্ব অবস্থায় ক্ষতিকরও নয়—কারণ প্রত্যেক দেশের নিজের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার দ্বারা সেখানে মার্কসবাদী ইডিওলজি কতকটা প্রভাবিত হবেই। ঠিক সেই কারণে কোনো বিশেষ পার্টির একছত্র আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা কার্দেলির মতে সৃজনশীল মার্কসবাদ আর সমাজতান্ত্রিক জগতের সজীবতার পক্ষে এত ক্ষতিকর। সমাজতন্ত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের স্থান সম্বন্ধে কার্দেলির সমস্ত বক্তব্য মেনে না নিয়েও বলা যায়, যে এ বিষয়ে মার্কসীয় অনুসন্ধানের খুবই প্রয়োজন আছে। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এ নিয়ে আলোচনা ১৯৫৭ সালে মাও ৎসে-তুংই আরম্ভ করেছিলেন। শত পুষ্পের সঙ্গে সে ধারাও বুঝি আজ শুকিয়ে গেছে!

মার্কসীয় দর্শনের ভাষায় কার্দেলির মতে চীনা নেতারা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কার্যত পরিত্যাগ করে বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণের উপরে স্থান দিচ্ছেন মনগড়া কল্পনাকে; তাঁদের কাছে পৃথিবীটা পরিবর্তনবিহীন, বড় বেশি যান্ত্রিক, সব হয় শাদা নয় কালো। ডায়েলেক্‌টিক্‌স্‌-এর কথা তুলে চীনারা মাঝে মাঝে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করেন—বিপরীতের মধ্যে দ্বন্দ্বই যখন বড়

কথা, ঐক্যটা নেহাৎই আপেক্ষিক, তখন সহঅবস্থান ইত্যাদির কথা এত বলা মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি নয় কি? কিন্তু কার্দেলি অতি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন [পৃঃ ৩৬-৩৯] যে এই তর্কে মার্কসীয় দর্শনের দু-ভাবে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমত, ঐক্যের মধ্যেও বিরোধ চলতে থাকে, লেনিনের ভাষায় আপেক্ষিক আর চিরন্তনের তফাৎটাও আপেক্ষিক—তাই সহঅবস্থান বা শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের অর্থ শ্রেণী-সংগ্রাম পরিত্যাগ করা নয়। দ্বিতীয়ত, বিরোধ বা সংগ্রামের রূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হতে পারে, পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলিরও কিছু পরিবর্তন সংঘাতের ভিতর দিয়ে হতে থাকে গুণগত রূপান্তরের পূর্বেই। প্রকৃত শোধনবাদীরা অবশ্য নতুনের দোহাই দিয়ে মার্কসবাদকেই অচল ঘোষণা করেন—কিন্তু তাই বলে পরিবর্তনকে অস্বীকার করাও কি সৃজনশীল মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি নয়?

চীনের নেতাদের কেউ কেউ স্তালিনপন্থী বলে থাকেন, কিন্তু আসলে জ্ঞানত না হলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁদের নীতি মিলে যাচ্ছে বরং ট্রট্‌স্কিবাদের সঙ্গে, যার প্রমাণ আমরা পাই ১৯৬০ সালে 'চতুর্থ আন্তর্জাতিক' নামক পত্রিকায় চীনের সপ্রশংস উল্লেখে। [কার্দেলি পৃঃ ৮৮-৮৯] স্তালিন নীতিগতভাবে কোনোদিন শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের লেনিনীয় তত্ত্ব অস্বীকার করেন নি। কিন্তু একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়া অসম্ভব ট্রট্‌স্কির এই বিখ্যাত যুক্তির উল্টো পিঠ ছিল সহঅবস্থানের সম্ভাবনা অস্বীকার করা, যুদ্ধ অনিবার্য ভেবে তার মধ্য দিয়ে 'বিশ্ববিপ্লব' ঘটানোর দুরাশা। ট্রট্‌স্কির নীতি জয়যুক্ত হলে দেখা দিত এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক 'বোনাপার্টিজম্'—বিপ্লব-রপ্তানি, দেশজয় করে সমাজতন্ত্র প্রসারের চেষ্টা। আজ অবশ্য এককভাবে সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন ঘটনার স্রোতে অবান্তর হয়ে গেছে, কিন্তু সহঅবস্থান চললে বিশ্ববিপ্লব বাধাপ্রাপ্ত হবে, চীনা এই যুক্তিকে নয়া-ট্রট্‌স্কিবাদ বললে কি খুব ভুল হয়?

চীনের বর্তমান নীতির বাস্তব সামাজিক ভিত্তি কি? বিশ্ব-পরিস্থিতি ও চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, এ দু-দিক থেকে কার্দেলি প্রশ্নটির জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন।

প্রথমত, বিশ্বরাজনীতিতে শক্তির ভারসাম্য আজ ক্রমেই সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এর থেকে স্থায়ী শান্তি ও নতুন উপায়ে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা ভাবাই হল স্থিরচিন্তার লক্ষণ। কিন্তু

অতিবিপ্লবীদের মনে হতে পারে—আমাদের যখন শক্তি বেশি, তখন এক ধাক্কায় 'ন্যায় যুদ্ধে' পুঁজিবাদকে চিরতরে ধ্বংস করে ফেললে হয় না? (অবশ্য এই ধরনের যুদ্ধকামনা কস্মিনকালে মার্কসের মনে আসেনি, কারণ তিনি ছিলেন মানবিকবাদের অকুণ্ঠ ধারক ও বাহক।) তাছাড়া স্বার্থান্বেষী নেতারা সমাজতন্ত্রের নতুন শক্তিকে সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারে ব্যবহৃত করবেন, এমন সম্ভাবনাও দেখা দিতে পারে। সমাজবাদকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে জাতিদম্ভ, রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা, অন্যের উপর সর্দারির প্রবৃত্তি।

অশুভ সম্ভাবনাগুলি চীনের ক্ষেত্রে বাস্তব রূপ গ্রহণ করল কেন, এই হল দ্বিতীয় প্রশ্ন। প্রচণ্ড সংগ্রাম, অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্রধানত নিজেদের চেষ্টাতেই চীনে বিপ্লব জয়লাভ করেছে। সে দেশের নেতা, পার্টি, ও জনগণের মধ্যে তাই যথেষ্ট পরিমাণ আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অল্প সময়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে যুগ-যুগান্তরের দারিদ্র্য দূর করার স্বাভাবিক ইচ্ছার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল চীনের বিপুল আয়তন ও অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ অর্থনীতি। এদিকে পশ্চিমী অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক অবরোধের ফলে চীনের সমস্যা বহুগুণ বেড়ে গেল। ফলে দেখা দিল সাব্‌জেক্‌টিভিজম্‌, অতিবিপ্লবী কার্যক্রম, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যার সব থেকে বিখ্যাত নিদর্শন গণ-কমিউন—সাময়িক ভাবে কিছু সার্থকতা থাকলেও কার্দেলির মতে একে সাম্যবাদের বীজ বলা হাস্যকর, কারণ উৎপাদনের বিপুল অগ্রগতি ছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টনের নীতি মার্কসের মতে কার্যকরী হতে পারে না। ক্রমে ক্রমে চীনা পার্টির গুণগুলি রূপান্তরিত হল দোষে, আত্মবিশ্বাস পরিণত হল অহঙ্কার ও জাত্যাভিমানে। অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিপ্লবী শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে আজ এই পার্টির নেতারা ক্রমশই নয়া-ট্রট্‌স্কিবাদ ও বোনাপার্টিস্ট কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, রাশিয়াকে কোণঠাসা করে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় তাঁরা আজ মশগুল।

যুগোশ্লাভিয়ার নিজস্ব যে সমস্ত বক্তব্য ও নীতি তাকে অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশ ও বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন থেকে এতদিন কিছুটা বিচ্ছিন্ন রেখেছে, কার্দেলির বইয়ে তার উল্লেখ থাকলেও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নেই। আমাদের

আলোচনার পরিসর থেকেও তাই মোটামুটি এদিকটা বাদ দেওয়া গেল। তবে কয়েকটা প্রশ্ন থেকে যায়। "সক্রিয় সহঅবস্থান" কথাটা যুগোশ্লাভ নেতারা খুব ব্যবহার করেন—চীনা অপব্যাখ্যার জবাব দিয়ে কার্দেলি বলছেন, "সক্রিয়" কথাটির অর্থ শান্তি আন্দোলনের লক্ষ্য যুগোশ্লাভিয়ার মতে শুধু স্থিতাবস্থা বজায় রাখা নয়, আর তাঁদের এই নীতির সঙ্গে ক্রুশ্চেভ তোগলিয়াত্তি বা তোরেজের বক্তব্যের বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই। [পৃঃ ৯০-৯৩] মৌলিক তফাৎ বিশেষ নেই, তবে অদূর ভবিষ্যতে দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যতখানি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা যুগোশ্লাভ নেতারা সম্ভবপর মনে করছেন, তা যেন একটু বেশি আশাবাদী। দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা নিশ্চয়ই ভোলা উচিত হবে না, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার মৌলিক বিরোধের তুলনায় এগুলিকে প্রায় এক পর্যায়ে ফেলা কিছুটা বাড়াবাড়ি নয় কি? [পৃঃ ১২৬] তৃতীয়ত, কার্দেলির মতে সমাজতান্ত্রিক দেশে শুধু আমলাতন্ত্র নয়, "রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদের" লক্ষণ অনেক সময়ে দেখা যায়। [পৃঃ ১৩১] বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পর "রাষ্ট্রীয়-পুঁজিবাদ", আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ—দু-এর মধ্যে কিন্তু পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? সর্বশেষে প্রশ্ন জাগে—সমাজতন্ত্রের ভিতরে প্রত্যেক দেশের বিকাশের স্বাধীনতা নিশ্চয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বিপদ যতদিন আছে, ততদিন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হবে না কি? যুগোশ্লাভিয়া জোট-নিরপেক্ষ থাকায় সমাজতন্ত্রের হয়তো কিছু ক্ষতি হচ্ছে না; ১৯৪৮এর পর বিকল্প পথও তার বিশেষ ছিল না (মার্কিন শিবিরে যোগ দেওয়া ছাড়া)—কিন্তু অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে জোটবদ্ধ হয়ে থাকা আত্মরক্ষার জন্যই আজও প্রয়োজনীয়।

যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে কিছু মতপার্থক্য থেকে গেলেও, ঠিক আজকের দিনে আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল আন্দোলনে (এবং আমাদের দেশে তো বটেই) "প্রধান বিপদ" যে মতান্ধতা ও নয়া-ট্রট্‌স্কিবাদ, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুব অল্প। এই প্রসঙ্গে এডওয়ার্ড কার্দেলির বইখানি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং কিছুটা ইতিমধ্যেই করেছে। সামাজিক অগ্রগতির সম্বন্ধে উৎসাহী পাঠকমাত্রের তাই এ-বই সযত্নে পড়ে দেখা উচিত।

অমল দাশগুপ্ত

আইনস্টাইন ও শান্তি

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এবং বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্ ও পরবর্তীকালে দার্শনিক ও মানবপ্রেমিক আলবার্ট আইনস্টাইনের সকল বাক্য ও কর্মের অনুপ্রেরণা ছিল যুদ্ধ-বিরোধিতা। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান শান্তিবাদী। এজন্যে প্রায়শই তাঁকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেয়ে শান্তির সপক্ষে দায়িত্বপালনকেই অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে। ভাবলে অবাক হতে হয় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরে প্রায় একই সঙ্গে তাঁর যুদ্ধবিরোধী ঘোষণা ও জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি প্রচার। তার পরের চল্লিশটি বছরেও তাঁর অক্লান্ত তৎপরতা সমভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল যেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তেমনি যুদ্ধ-বিরোধিতায়। বিজ্ঞানী ও মানবপ্রেমিকের এমন সমন্বয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাঁর জীবনটি শুধু বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্যেই স্মরণীয় নয়, পৃথিবীকে যুদ্ধহীন করবার জন্যে অনলস সক্রিয়তার এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত হিসেবেও অনুকরণীয়। অকৃত্রিম যুদ্ধ-বিরোধিতায় এক সময়ে তিনি এমনকি অস্ত্রসজ্জার পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে নিজের হাতে চিঠি লিখে পারমাণবিক বোমার ধ্বংসাত্মক শক্তিকে মানুষের আয়ত্তাধীন আনার প্রচেষ্টাকে আনুকূল্য করেছিলেন। এজন্যে তাঁকে কম নিন্দা ও জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয়নি। অন্য দিকে, জাতিবিদ্বেষ, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও জাত্যাভিমানকে তিনি সর্বক্ষেত্রে তীব্রতম ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছিলেন। তাঁর আন্তর্জাতিকতা ছিল অতিমাত্রায় উদার আর এই উদার আন্তর্জাতিকতার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি রচনা করেছিলেন এক সর্বব্যাপ্ত বিশ্ব-সরকারের পরিকল্পনা। তাঁর এই

Einstein on Peace—Edited by Otto Nathan and Heinz Norden. Simon and Schuster, New York, 1960, $ 8.50.

আইনস্টাইন : জীবন-জিজ্ঞাসা—সংকলক ও অনুবাদক : শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানি। জানুয়ারি, ১৯৬৩। আট টাকা।

সমস্ত বাক্য ও কর্মের জন্যে এমনকি বন্ধুভাবাপন্ন মহলের অপ্রত্যাশিত বিরূপতা ও আক্রমণও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে তিনি প্রতিটি বিরূপতার মূল উৎপাটিত করেছিলেন, প্রতিটি আক্রমণকে জয় করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতো একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে বিজ্ঞান-বহির্ভূত বিষয়ে এতখানি সময় দেওয়া প্রায় আত্মদানের সমতুল্য। সম্প্রতি বর্তমান শতাব্দীর এই মহত্তম আত্মদানের খণ্ড খণ্ড পর্বগুলোকে একসূত্রে গেঁথে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে দুটি গ্রন্থের মাধ্যমে। বর্তমান যুগকে উপলব্ধি করার জন্যে এই দুটি গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য।

'আইনস্টাইন অন পীস' গ্রন্থটি সুবৃহৎ, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭০৪। গ্রন্থটি শুরু হয়েছে আইনস্টাইনের পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, ১৯১৪ সালে, যখন তিনি সুইজারল্যাণ্ড ত্যাগ করে এসে বার্লিনে বসবাস শুরু করেছিলেন। গ্রন্থটি শেষ হয়েছে ১৯৫৫ সালে আইনস্টাইনের শেষ অসমাপ্ত রচনার (ইস্রায়েলের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভাষণ) প্রতিলিপি দিয়ে। মাঝখানের পৃষ্ঠাগুলোতে রয়েছে আইনস্টাইনের যুদ্ধবিরোধিতার ও শান্তিপ্রচেষ্টার বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। আর তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাতায়াত করেছেন পৃথিবীর এই চল্লিশ বছরের ইতিহাসের অজস্র স্বনামধন্য ব্যক্তি, যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর ঘটনা-রূপায়ণে যাঁদের অনিবার্য প্রভাব কোনো-না-কোনো ভাবে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন সুবিখ্যাত বার্ট্রাণ্ড রাসেল। প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখেছেন : "আইনস্টাইন শুধু যে তাঁর যুগের সবচেয়ে কৃতী বিজ্ঞানী ছিলেন তাই নয়—উপরন্তু ছিলেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। অর্থাৎ বিজ্ঞানী হওয়া ছাড়াও অন্য কিছু। রাষ্ট্রনেতারা যদি তাঁর কথা শুনে চলতেন তাহলে পৃথিবীর মানুষের জীবনে দুর্যোগের মাত্রা আরো অনেক কম হতে পারত।"

আইনস্টাইন সম্পর্কে এই অন্যতর স্বীকৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বিজ্ঞানী তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছুও। সম্পাদকের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই।

"আইনস্টাইন জানতেন তিনি কতখানি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিজে এ-ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না এবং মনে মনে ভাবতেন যে এতখানি সম্মান তাঁর প্রাপ্য নয়। তবে এক্ষেত্রে তাঁর নিজের যতোই অস্বস্তি থাকুক, সঙ্গে সঙ্গে এও তিনি বুঝতে পারতেন যে সমাজে ও বিশ্বে তাঁর এই অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা তাঁর কাছে ব্যক্তি-মানুষের পক্ষে এবং সমগ্রভাবে

সমাজের পক্ষে কাজ করবার বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে। এই কারণে, যখনই তাঁর মনে হত যে তিনি যদি চেষ্টা করেন বা প্রভাব বিস্তার করেন তাহলে কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে—তখনই তৎপর না হয়ে পারতেন না। এ-বিষয়ে তাঁর গভীর দায়িত্ববোধ ছিল। এজন্যে বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটলেও তিনি নিরস্ত হতেন না, যদিও অন্য যে-কাজেই ব্যস্ত থাকুন না কেন তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে থাকত বৈজ্ঞানিক বিষয়। ব্যক্তির জন্যে ও সমাজের জন্যে সময় ও উদ্যোগ ব্যয় করতে তিনি ছিলেন সতত প্রস্তুত। লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, রিপোর্ট ও বক্তৃতা পড়া, বিবৃতি ও বক্তৃতা তৈরি করা, বা অন্য যে-কোনো ভাবেই হোক কাজে লাগতে পারা—এতে তিনি ক্লান্তি বোধ করতেন না। বা কখনো বিচার করতে বসতেন না যে যাঁর জন্যে তাঁকে সময় ব্যয় করতে হচ্ছে তিনি মস্ত পণ্ডিত ও সুবিখ্যাত ব্যক্তি, না, একেবারেই অজ্ঞাত অখ্যাত? যে ব্যক্তিই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করুন, তিনি যতো নিচুতলারই হোন, সহৃদয়সংবেদনার সঙ্গে তিনি অবিলম্বে তৎপর হয়ে উঠতেন।

যে-সব দায়িত্বপালনে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করতেন তার সবগুলিই ছিল জরুরি, সবগুলিই আশু কর্তব্য। যেমন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ইহুদীসমস্যা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, অধিকতর ফলপ্রসূ ও সার্থকতামণ্ডিত জীবনের জন্যে সাধারণ শিক্ষা। কিন্তু যতই সময় পার হয় ততই যুদ্ধকে লোপ করার সংগ্রামটাই আইনস্টাইনের কাছে সবচেয়ে জরুরি বলে মনে হতে থাকে। তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি এই যে যে-সব মস্ত মস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে তাঁর অবদান ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য, সেগুলো তাঁর জীবনকালের মধ্যেই নিয়োজিত হয়েছিল মানুষের জীবনধারণের মানকে আরো উন্নত করে তোলার জন্যে নয়, সন্ত্রাস ও ধ্বংসের উপায়গুলিকে আরো পরিবর্ধিত করার জন্যে। আইনস্টাইনের জীবনের শেষ কয়েকটি বছরে সামরিক প্রস্তুতি হয়ে উঠেছিল বহুগুণ তীব্র আর বিশ্বশান্তি ক্রমেই সংকটাপন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ক্রমেই হয়ে উঠেছিল দুরূহ ব্যাপার। শান্তির পক্ষ নিয়ে কথা বলাকেই মনে করা হত দেশদ্রোহিতা আর তার ফলে ভোগ করতে হত রাজনৈতিক নির্যাতন। শান্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা যতই কমেছিল ততই আইনস্টাইন অনুভব করেছিলেন ক্রমবর্ধমান একাকীত্ব। বিশেষ করে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিষ্ক্রিয়তা

আর জাতীয়তাবাদী প্রচারে যারা বিভ্রান্ত তাদের অজ্ঞতা আইনস্টাইনকে দুঃখিত করেছিল। যখন তিনি দেখতেন, যুদ্ধপ্রস্তুতি বা পারমাণবিক অস্ত্রধারীদের নিছক উন্মত্ততার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ নেই তখন তিনি অধৈর্য হয়ে উঠতেন। কিন্তু কোনো সময়েই সত্যিকারের হতাশ হন নি। আমার মনে হয়, তিনি যে হতাশ হতেন না তার কারণ মানুষের ন্যায়বোধের উপরে তাঁর আস্থা অটুট ছিল। তিনি মনে করতেন, অবিসম্বাদী সাফল্যে ও কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল একদল মানুষ যদি বিশ্বের বিবেকের উদ্দেশে আবেদন জানান তাহলে সেই আবেদন ব্যর্থ হবার নয়। এই কারণেই বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি মানবতাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, ঘনায়মান সর্বনাশের বিপুলতা সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছিলেন মানুষকে। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে।…এইটিই ছিল আইনস্টাইনের শেষ প্রয়াস।”

সম্পাদকীয় ভূমিকায় অতঃপর বলা হয়েছে যে আইনস্টাইনের শান্তি-বিষয়ক রচনাগুলিকে একত্রিত করে তাঁরা আইনস্টাইনের উদ্দেশ্যকেই সিদ্ধ করতে চেয়েছেন। আস্থা রেখেছেন মানুষের ন্যায়বোধে। আশা প্রকাশ করেছেন যে পৃথিবীর শান্তি বজায় রাখার জন্যে পৃথিবীর এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষটির উদ্বেগ ও উদ্যোগ মানুষকে বিচলিত, অনুপ্রাণিত ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে। এই আশা নিয়েই সম্পাদকদ্বয়ের এই বিপুল প্রয়াস—১৯১৫ থেকে ১৯৫৫ এই চল্লিশ বছরে আইনস্টাইনের শান্তি-প্রয়াসের পূর্ণাঙ্গ একটি বিবরণ। বলা বাহুল্য, এজন্যে প্রচুর পরিশ্রম ও অভিনিবেশের প্রয়োজন হয়েছিল। সম্পাদকদ্বয় উভয়তই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

। দুই ।

আইনস্টাইনের যুদ্ধ-বিরোধিতার কর্মকাণ্ডে চারটি পর্ব লক্ষ্য করা যেতে পারে। (১) ১৯১৫ থেকে ১৯৩৩—অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে জার্মানিতে ফ্যাশিবাদের উদ্ভব পর্যন্ত; (২) ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯—জার্মানিতে ফ্যাশিবাদের উদ্ভব থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ, (৩) ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে শেষ, এবং (৪) ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে আইনস্টাইনের মৃত্যু (১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে। যুদ্ধের গোড়ায়

দিকে সামরিক সুবিধালাভের জন্যে জার্মান বাহিনী বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতাকে অমান্য করে বসে। জার্মান সংস্কৃতির বাণীর সঙ্গে জার্মান বাহিনীর কার্যকলাপের এই অসঙ্গতির দৃষ্টান্তে সারা পৃথিবীতে প্রবল একটা বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়। এমন কি তৎকালীন জার্মান গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ফলে প্রচারিত হয় 'সভ্য জগতের উদ্দেশে ইস্তাহার' নামে একটি ঘোষণা। ইস্তাহারটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'কুলটুর-ভেলট'। জার্মান শব্দ 'কুলটুর' তারপর থেকেই পৃথিবীর মানুষের কাছে কালিমালিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেছিলেন ৯৩জন শিল্পী, বিজ্ঞানী, ধর্মযাজক, কবি, আইনজীবী, পদার্থবিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ। স্বাক্ষরকারীরা প্রায় সকলেই ছিলেন নিজস্ব ক্ষেত্রে খ্যাতিমান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বিবর্তনবাদী আর্নস্ট হেকেল, রঞ্জনরশ্মির আবিষ্কর্তা ভিলহেলম্ রোয়েণ্ট্‌গেন, জীববিজ্ঞানী পাউল এরলিথ, সঙ্গীতজ্ঞ এঙ্গেলবার্ট হুম্পার্‌ডিঙ্ক এবং আরো অনেকে। এঁরা জার্মান জাতীয়তাবাদের সমর্থক না হয়েও জার্মানবাহিনীর যুদ্ধাপরাধকে অস্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের ও জনসাধারণের মনোভাব কী ছিল।

কিন্তু অন্য একটি কণ্ঠস্বরও এই ইস্তাহার প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যেই শোনা গিয়েছিল। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক জর্জ ফ্রীডরিখ নিকোলাই ছিলেন সেকালের সুপরিচিত শান্তিবাদী। তিনি রচনা করলেন 'ইউরোপীয়দের উদ্দেশে ইস্তাহার' নামে একটি উদার প্রতিবাদী ঘোষণা। কিন্তু অধ্যাপক নিকোলাই নিজে সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ঘোষণায় স্বাক্ষর পাওয়া গেল আর মাত্র তিনজনের। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন আইনস্টাইন। যুদ্ধবিরোধী ঘোষণায় এইটিই আইনস্টাইনের প্রথম স্বাক্ষর। ইস্তাহারের প্রথম অনুচ্ছেদটি ছিল এই :

"ইতিপূর্বে আর কোনো যুদ্ধে সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সূত্রগুলি এমন সম্পূর্ণভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় নি। আর এই ব্যাপারটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন প্রযুক্তিবিদ্যা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। এই স্বীকৃতি স্বভাবতই একটি সর্বজনীন বিশ্বব্যাপী সভ্যতার দিকে আমাদের

নিয়ে যেতে পারত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অনেকগুলো বন্ধন ইতিপূর্বে গড়ে উঠেছিল বলেই হয়তো বর্তমানের এই বিচ্ছেদ আমাদের কাছে আরো বেশি তীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক।"

ইস্তাহারের শেষদিকে গ্যেটের নাম করে সকল সৎ ইউরোপীয়কে আহ্বান জানানো হয়েছিল যেন তাঁরা সশস্ত্র সংঘাতের বিরুদ্ধে মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ ও ইউরোপকে বাঁচাবার জন্যে 'ইউরোপীয়দের লীগ' গড়ে তোলেন।

অন্যদিকে এই যুদ্ধের বছরগুলিতেই আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তৎপরতা প্রায় একটি শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল। ১৯১৫ সালে 'জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি' প্রচার করা ছাড়াও ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে তিনি প্রায় ত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করেছিলেন।

অথচ এই মানুষটিই একই সঙ্গে যুদ্ধবিরোধী তৎপরতাতেও দাঁড়িয়েছিলেন প্রথম সারিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সময়ে জার্মানির সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধবিরোধী পার্টি ছিল সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হতেই জাত্যভিমানের বিষাক্ত আবহাওয়ায় এই পার্টি পঙ্গু হয়ে যায়। তবে পার্টি পঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও এমন কিছু কিছু মানুষ থেকে গিয়েছিলেন যাঁদের চিন্তাশক্তি পঙ্গু হয় নি। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন নতুন একটি সংগঠন যার নাম 'বুণ্ড নয়েস ফাটারলাণ্ড' (নিউ ফাদারল্যাণ্ড লীগ)। আইনস্টাইন ছিলেন এই সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ও প্রধান স্তম্ভ। ১৯১৪ সালের ১৬ই নভেম্বর এই সংগঠনটির জন্ম। ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারী রোষে ও বিরুদ্ধ আবহাওয়ার চাপে সংগঠনটির নিষ্ক্রিয়তা-প্রাপ্তি। কিন্তু এই অল্প সময়ের অস্তিত্বের মধ্যেই এই সংগঠনের কার্যকলাপ প্রচণ্ড একটি যুদ্ধবিরোধী কণ্ঠস্বরের মতো ধ্বনিত হয়েছিল। এই সংগঠনের মাধ্যমেই আইনস্টাইনের সঙ্গে ব্রিটিশ শান্তিবাদী বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জর্জ বার্নার্ড শ, ফেনার ব্রকওয়ে ও আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ। যুদ্ধ-বিরোধিতায় উদ্দীপিত আইনস্টাইন নিজেই উদ্যোগী হয়ে অনেকের কাছে অযাচিত পত্র লিখেছিলেন। এমনি একটি পত্র গিয়েছিল বিখ্যাত ফরাসী লেখক ও শান্তিবাদী রমাঁ রলাঁর কাছে। পত্রে তিনি লিখেছিলেন :

"...ভবিষ্যৎ কাল যখন ইউরোপের কৃতকর্মের খতিয়ান করতে বসবে

তখন আমাদের সম্পর্কে কি একথা বলা হবে না যে তিন শতাব্দীর আপ্রাণ সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার পরেও আমরা বড়ো জোর অগ্রসর হয়েছি ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে জাতীয়তাবাদী উন্মত্ততা পর্যন্ত ?...”

রলাঁর সঙ্গে আইনস্টাইনের প্রথম সাক্ষাৎকার ১৯১৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরে সুইজারল্যাণ্ডে। রলাঁর ডায়েরিতে এই সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তী কালে এই দুই মহামনীষীর মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি সুদীর্ঘ পত্রালাপ করেছিলেন। ‘আইনস্টাইন অন পীস’ গ্রন্থের অনেকগুলো পৃষ্ঠা জুড়ে এই পত্রালাপের বিবরণ পাওয়া যায়।

‘বুণ্ড নয়েস ফাটারলাণ্ড’ নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নি। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে আবার শুরু হয় এই সংগঠনটির কার্যকলাপ। দুটি জনসভা আয়োজিত হয় বুণ্ডের উদ্যোগে। দ্বিতীয় জনসভায় গৃহীত হয় অত্যন্ত জোরালো ভাষায় রচিত একটি ঘোষণা, যাতে দাবি ওঠে—অবরোধ-অবস্থা, সেন্সরশিপ ও সংরক্ষণমূলক শিল্পের বিলোপ, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি, সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা, সমরবাদের উচ্ছেদ (বিশেষ করে শিক্ষা-ব্যবস্থায়) ইত্যাদির।

যতদূর জানা যায়, আইনস্টাইনও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। খুব সম্ভবত এই সভায় গৃহীত ঘোষণাপত্রটিই তিনি পাঠিয়েছিলেন সহযোগী বিজ্ঞানী মাক্স্ প্লাঙ্ক-এর কাছে স্বাক্ষরের জন্যে। ১৯১৮ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে মাক্স্ প্লাঙ্ক একটি চিঠি লিখেছিলেন আইনস্টাইনকে। চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে যদিও ঘোষণার সঙ্গে তাঁর পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে কিন্তু বাস্তব অসুবিধের দরুণ ঘোষণায় স্বাক্ষর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আরো জানিয়েছিলেন যে যেহেতু তিনি কাইজারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন অতএব কাইজারের সিংহাসন-ত্যাগের দাবিতে সায় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে কাইজার নিজের থেকেই সিংহাসন ত্যাগ করবেন।

মাক্স্ প্লাঙ্কের চিঠির ঠিক চোদ্দ দিন পরে, ১৯১৮ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে, বিপ্লবের চাপে বাধ্য হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন কাইজার ভিলহেল্ম্ ও জার্মান রিপাব্লিক ঘোষিত হয়েছিল। আরো দুদিন পরে, যুদ্ধবিরতির দিনে, আইনস্টাইন দুটি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর মায়ের কাছে

সুইজারল্যাণ্ডে। দুটি চিঠিতেই আইনস্টাইন বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে মাকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে বিপ্লবের ফলে জার্মানিতে বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের পথটি উন্মুক্ত হল।

॥ তিন ॥

১৯১৯ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে আমাদের এই পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে একটি ঐতিহাসিক সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে প্রায় পাঁচ বছরের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই তারিখটিতে একদল ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পৃথিবীর দূর দূর দেশে অভিযান করেছিলেন সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বের সত্যতা যাচাই করতে। ১৯১৯ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি ও রয়াল অ্যাস্ট্রনমিকাল সোসাইটির যুক্ত অধিবেশনে ঘোষণা করা হল যে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব অনুসারে আলোর যে তীর্যক গতি প্রত্যাশিত, সূর্যগ্রহণের সময়ে ঠিক সেই ব্যাপারটিরই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইন পৃথিবীর প্রধান সংবাদ হয়ে উঠলেন ও রূপকথার নায়কের মতো খ্যাতির উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত হলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে আইনস্টাইনকে উপলক্ষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পৃথিবীর মানুষের কাছে সবচেয়ে অভিনন্দনীয় সংবাদ বলে মনে হয়েছিল। আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অনন্যসাধারণ মর্যাদা আর এই নামটি হয়ে উঠেছিল একটি প্রতীকের মতো। তারপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আইনস্টাইন তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত এই অনন্যসাধারণ মর্যাদাকে সর্বতোভাবে প্রয়োগ করেছিলেন আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির সূত্রে ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধহীন পৃথিবী রচনা করার প্রয়াসে, যদিও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজে এই খ্যাতিকে মনে করতেন অকারণ ও বোঝাস্বরূপ।

এই ঘটনার কয়েক মাস আগেই, ১৯১৯ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল আইনস্টাইনের নামযুক্ত দ্বিতীয় যুদ্ধবিরোধী ঘোষণা। মানুষের শুভবুদ্ধির উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে রমাঁ রলাঁ একটি আন্তর্জাতিক পত্র রচনা করেছিলেন। এই পত্রে আইনস্টাইনের স্বাক্ষর ছিল। তবে আইনস্টাইন মনে করতেন, তৎকালীন পরিস্থিতিতে মানুষের শুভবুদ্ধির

উদ্দেশ্যে আবেদন প্রচারের চেয়েও মানুষের যে-দুর্বুদ্ধি যুদ্ধাপরাধের নৃশংসতায় গত কয়েক বছরে দেশে দেশে প্রেতের নৃত্য করেছে তার নির্মম উদ্ঘাটনই যুদ্ধের প্রতি ঘৃণাকে আরো সার্থকভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারত। এই উদ্দেশ্যে তিনি কিছু কাজও করেছিলেন। তিনি ও আরো কয়েকজনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ফ্রান্সে জার্মান বাহিনীর যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত একটি তথ্যমূলক পুস্তিকা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আইনস্টাইন যেমনটি আশা করেছিলেন, সেই প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া এই পুস্তিকা সৃষ্টি করে নি। বরং, প্রাজ্ঞ ও সংস্কৃতিবান বলে যাঁরা পরিচিত তাঁরাও প্রয়োজনের সময়ে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ পরিহার করতে পারেন না দেখে তিনি দুঃখবোধ করেছিলেন।

১৯২১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে 'নিউ ইয়র্ক ইভনিং পোস্ট' পত্রিকায় আইনস্টাইনের সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন :

"মনুষ্যসমাজকে···আচ্ছন্ন করেছে অত্যধিক মাত্রায় তীব্র ও অত্যধিক মাত্রায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা। জাতীয়তাবাদের যে তরঙ্গ বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা একটি কঠিন ব্যাধি বিশেষ। উত্তেজনার সামান্য মাত্র কারণ উপস্থিত থাকলেই বা কথনো কথনো বিন্দুমাত্র কারণ উপস্থিত না থাকলেও এই জাতীয়তাবাদ জাত্যভিমানে পর্যবসিত হয়।

যুদ্ধের পূর্বে সংস্কৃতি বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে এবং সঙ্গে সঙ্গে মতাদর্শের ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিকতাবাদের অস্তিত্ব ছিল তা মূলগত বিচারে একটি সুস্থ লক্ষণ। এই আন্তর্জাতিকতাবাদ পুনঃস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি নেই বা যুদ্ধের ক্ষত নিরাময় হবারও কোনো সম্ভাবনা নেই।"

১৯২১ সালে ও পরবর্তী কালে আইনস্টাইন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে অস্ট্রিয়ায় ও চেকোশ্লোভাকিয়ায়, ফেব্রুয়ারিতে আমস্টারডামে, মার্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বছরের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন। পরে ১৯২২ সালের মার্চ মাসে তিনি গিয়েছিলেন ফ্রান্সে ও অক্টোবরে প্যালেস্টাইন ও স্পেন হয়ে প্রাচ্য দেশগুলিতে। আইনস্টাইনের এই ভ্রমণ অবশ্যই প্রধানত বিজ্ঞানী হিসেবে। কিন্তু এই বিস্তৃত ভ্রমণে শান্তিদূতের ভূমিকাটিও অপ্রধান ছিল না। বিশেষ করে ফ্রান্সে ও জাপানে আইনস্টাইনের ভ্রমণ খুবই সার্থকতামণ্ডিত হয়েছিল। ফ্রান্স ও

জার্মানির মধ্যে তিনি সম্প্রীতির আবহাওয়া সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। আর জাপান সম্পর্কে তাঁর মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল অতি নিবিড় একটি মমতাময় আকর্ষণ।

প্রাচ্যদেশে ভ্রমণের সময়েই তিনি খবর শুনেছিলেন যে পদার্থবিদ্যায় ১৯২১ সালের নোবেল পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

তাঁর এই প্রাচ্য-ভ্রমণের সময়েই আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে ইতালির ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন মুসোলিনি। আর যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ফরাসী বাহিনীর পুনঃপ্রবেশ ঘটেছিল জার্মানির রুঢ় অঞ্চলে।

১৯২৩ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে একটি অটোগ্রাফে আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন :

"বয়স্কদের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষা শিশুরা মানে না। জাতি মানে না ইতিহাসের শিক্ষা। অতীতের তিক্ত পাঠ অবশ্যই বারে বারে নতুন করে গ্রহণ করতে হবে।"

। চার ।

ইতালিতে মুসোলিনির ক্ষমতালাভের পর থেকেই আইনস্টাইন ফ্যাশিবাদের বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফ্যাশিবাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি যে পৃথিবীর শান্তিকেই বিপন্ন করে তুলছে—এই সতর্কবাণীও তিনি বারবার উচ্চারণ করেছিলেন। এ-বিষয়ে রমাঁ রলাঁ, ব্রিটিশ অধ্যাপক গিলবার্ট মারে, ফরাসী লেখক আঁরি বারবুস, মাদাম কুরী, ম্যাকসিম গর্কি ইত্যাদি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সে-সময়ে তাঁর দীর্ঘ পত্রালাপ হয়েছিল। একাধিকবার বিভিন্ন উপলক্ষে ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করেছিলেন। অজস্র বক্তৃতা দিয়েছিলেন ও প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন ; এবং যখনই মনে হয়েছে কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলে যুদ্ধ-বিরোধিতার উদ্দেশ্যটি সাধিত হতে পারে, বিনা দ্বিধায় তাতে যোগ দিয়েছিলেন। 'আইনস্টাইন অন পীস' গ্রন্থে আইনস্টাইনের জীবনের এই সর্বাধিক কর্মব্যস্ত দশকের পূর্ণাঙ্গ একটি বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছে।

১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে নাৎসীরা জার্মানিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। আর ১৯৩৩ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে আইনস্টাইন

চিরকালের মতো ইউরোপ ত্যাগ করে এসে আমেরিকায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এই আটটি মাসের ঘটনাবলী আইনস্টাইনের জীবনে প্রচণ্ড একটা ঝড়ের মতো উপস্থিত হয়ে অনেক পুরনো ধারণা তছনছ করে দিয়েছিল। তিনি স্তম্ভিত হয়ে আবিষ্কার করেছিলেন যে তাঁর একান্ত সহযোগী বিজ্ঞানী মাক্স্ প্লাঙ্ক পর্যন্ত প্রুশিয়ান আকাদেমি থেকে তাঁর বহিষ্কারের পক্ষপাতী। রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল শক্তিমত্ত এক দানবের রণহুঙ্কার ও ইহুদী-নিধনের প্রস্তুতি। আইনস্টাইন তখন ঘোষণা করেছিলেন যে যুদ্ধ-বিরোধিতা নয়, যুদ্ধকে প্রতিহত করবার জন্যেই চাই পশ্চিমী শক্তির যুদ্ধ-প্রস্তুতি। আইনস্টাইনের মতো দীক্ষিত শান্তবাদীর মুখে এই প্রকাশ্য ঘোষণা যে কী সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার বিশদ বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থের একটি অতি কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়।

পরবর্তী দুটি পর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পারমাণবিক শক্তির উদ্ভব এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সমস্যা। এই দুটি পর্বের ঘটনাবলী বহুবিচিত্র এবং আইনস্টাইনের নাম পৃথিবীর ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত। এমন কি যদি বলা হয় যে আইনস্টাইনের জীবনের আবর্তেই এই বিশেষ সময়কালের জটিলতম ও দুরূহতম ইতিহাসের একটি প্রতিফলন পাওয়া যেতে পারে—তাহলেও ভুল বলা হয় না। আলোচ্য গ্রন্থের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়েই আইনস্টাইনের জীবনের এই শেষ ষোলটি বছরের বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের সঙ্গে আইনস্টাইনের জীবনের এই দুটি পর্বের যোগসূত্র খুবই নিকট এবং বহু-আলোচিত বলে অনেকের কাছে মোটামুটি পরিচিত। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে পৃথক পৃথক ঘটনাগুলো কালের পটভূমিতে স্থাপিত হবার ফলে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। মনে হয় কালের যাত্রার ধ্বনিই যেন শোনা যাচ্ছে একটি ব্যক্তি-জীবনের মহৎ সাফল্য ও ব্যর্থতার কাহিনীর মধ্যে।

॥ পাঁচ ॥

'আইনস্টাইন : জীবনজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে শুধু শান্তিবাদী আইনস্টাইন নয়, দার্শনিক, মানবপ্রেমিক, সমাজতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক আইনস্টাইনের, এক কথায় মানুষ আইনস্টাইনের, সমগ্র পরিচয়টি উপস্থিত করা হয়েছে।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন : "আইনস্টাইনকে শুধু বিজ্ঞানী বলা চলে না। জাতিবৈষম্য, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্ম ও বিজ্ঞান ইত্যাদি প্রশ্নে বহু যুগ ধরে মানুষের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজকে যে সব নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, আইনস্টাইন স্বয়ং সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত অনেক প্রবন্ধে বিভিন্ন সময় স্বাধীন ও নির্ভীক ভাবে ব্যক্ত করে গেছেন।"

আলোচ্য গ্রন্থটি বিভিন্ন বিষয়ে আইনস্টাইনের সুচিন্তিত অভিমতের পূর্ণাঙ্গ একটি সঙ্কলন। গ্রন্থটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত : অভিমত (এই অংশের বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা 'আমার দৃষ্টিতে এই জগৎ', 'বিজ্ঞান ও সভ্যতা', 'সমাজ ও ব্যক্তিত্ব', 'বিজ্ঞান ও সমাজ', 'সমাজবাদ কেন ?' ও 'বারট্রাণ্ড রাসেলের জ্ঞান সম্বন্ধীয় মতবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য'), স্বাধীনতা (উল্লেখযোগ্য রচনা 'ফ্যাসিবাদ ও বিজ্ঞান', 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকামীদের সম্মেলনে', 'নিগ্রোদের প্রশ্ন', ও 'মানবীয় অধিকার'), ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র (আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের অনুলেখন এই অংশের অন্তর্ভুক্ত, উল্লেখযোগ্য রচনা 'ধর্ম ও বিজ্ঞান', 'বিজ্ঞান ও ধর্ম' ও 'ধর্ম এবং বিজ্ঞান—এদের ভিতর সঙ্গতিবিধান করা কি অসম্ভব ?'), শিক্ষা (উল্লেখযোগ্য রচনা : 'শিক্ষা প্রসঙ্গে'), মিত্রবর্গ (বার্নার্ড শ', সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, মহাত্মা গান্ধী, লিও বেক্ সম্পর্কে মন্তব্য), রাজনীতি, রাষ্ট্র ও শান্তিবাদ (এই অংশে রাশিয়ান আকাদেমির সদস্যবর্গের আইনস্টাইনের উদ্দেশে খোলা চিঠি ও আইনস্টাইনের জবাব অন্তর্ভুক্ত, উল্লেখযোগ্য রচনা 'পারমাণবিক যুদ্ধ না শান্তি ?'), ইহুদীদের কথা (উল্লেখযোগ্য রচনা 'ইউরোপের ইহুদী সম্প্রদায়ের পুনর্বাসন সমস্যা') ও বিবিধ (উল্লেখযোগ্য রচনা 'গণিতজ্ঞের মনোজগত', 'এ যুগের মৌলিক সমস্যা', 'গান্ধীর পথে চলতে হবে')।

পরিশিষ্টে 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৪২ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'আইনস্টাইন' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত এবং আইনস্টাইনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সংযোজিত হয়েছে।

এই সঙ্কলন-গ্রন্থে যদিও বহু বিচিত্র বিষয় সন্নিবেশিত, তাহলেও লক্ষ্য করা যাবে যে আইনস্টাইনের সমগ্র চিন্তাজগত একটি মূল কেন্দ্রবিন্দুতে আবর্তিত হয়েছে। তিনটি প্রবন্ধ থেকে তিনটি উদ্ধৃতির সাহায্যে এই কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

"যুদ্ধ আমার কাছে এক হীন ও ধিক্কারজনক ব্যাপার বলে মনে হয়। এরকম ঘৃণ্য ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার চেয়ে আমি বরং ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে রাজি আছি।" (আমার দৃষ্টিতে এই জগৎ)

"একমাত্র স্বাধীন ও মুক্ত মানবই নব নব আবিষ্কার ও চিৎপ্রকর্ষবিধায়ক সৃষ্টিকার্যে সক্ষম, এবং এই সব আবিষ্কার ও সৃষ্টিই আমাদের আধুনিক মানব-সমাজের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলেছে।" (বিজ্ঞান ও সভ্যতা)

"আমাদের যুদ্ধোত্তর বিশ্বের চিত্র খুব উজ্জ্বল নয়। আমাদের অর্থাৎ পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কথা বলতে গেলে আমরা বলতে পারি যে, আমরা রাজনীতি-বিশারদ নই এবং রাজনীতি নিয়ে অনধিকার চর্চার বাসনা কখনও আমাদের হয়নি। তবে আমরা এমন কতকগুলি বিষয় জানি যা রাজনীতিবিদদের অগোচর। সুতরাং কর্তৃপক্ষীয়দের আমরা এই কথা মনে করিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে বোধ করছি যে অনায়াসে সুখ-সুবিধা ভোগ করার কোন পন্থা নেই এবং শম্বুকগতিতে চলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখলে কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর কষাকষি করার মত সময় আর নেই। আজকের অবস্থায় সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ প্রয়োজন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় এবং সমগ্র রাজনৈতিক ধারণার সর্বাঙ্গীন বিপ্লব সাধন ঈপ্সিত।"

এই গ্রন্থের জন্যে বাঙালী পাঠক সঙ্কলক-অনুবাদক ও প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথ

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বইখানি সুসম্পাদিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। 'ছন্দ' প্রথম বার হয় ১৩৪৩ সালে। ঐ সংস্করণের 'পরিশিষ্ট' অংশে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনকে কবি কর্তৃক লিখিত একখানি পত্র ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত তিনখানি পত্রের প্রাসঙ্গিক তথ্য, 'পদ্যছন্দ' ও 'গদ্যছন্দ' সম্পর্কিত আলোচনা 'মোটকথা' নামে সন্নিবেশিত হয়েছিল।

দশবছর পরে 'রবীন্দ্র রচনাবলী'তে যখন 'ছন্দ' মুদ্রিত হয় (১৩৫৩) তখন প্রবন্ধগুলিকে সাময়িকপত্রে প্রকাশের কালানুক্রমে সাজানো হয়। প্রবন্ধগুলি 'সবুজপত্র' 'বিচিত্রা' 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাবলীতে 'পরিশিষ্ট' অংশে পূর্বে অসংকলিত ছন্দবিষয়ক কয়েকটি রচনাও যুক্ত করা হয়। তাছাড়া 'চিঠিপত্র' অংশে জে. ডি. এণ্ডারসনকে লিখিত পত্র দুইটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার, প্যারীমোহন, ধূর্জটি-প্রসাদকে লিখিত পত্রাবলীও সেখানে স্থান পায়।

সম্প্রতি শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় 'ছন্দ' গ্রন্থখানির যে মূল্যবান সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন, তার ফলে গ্রন্থখানির সকল অপূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতা দূর হয়েছে। আমাদের দেশে রসসাহিত্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল, মননসাহিত্যের ক্ষেত্রে সে চাহিদা তত মন্দা। আবার সংকলন, সম্পাদন প্রভৃতি কার্যের যথার্থ মর্যাদা আমরা এখনো দিতে শিখিনি। আমরা ভাবের আবেগ, রসের আক্ষেপ প্রভৃতির উপর যে গুরুত্ব দিয়ে থাকি, দুঃখের বিষয় তথ্যের যথার্থ প্রয়োগ ও বিজ্ঞানসম্মত বিচারের প্রতি সেই গুরুত্ব এখনো আমরা দিতে পারি নি।

একবার একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, একটি কবিতার

ছন্দ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বভারতী। আট টাকা।

রচনাকাল ১৩১২ না ১৩১৩ এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে? কবিতার রসাস্বাদন এক বছরের অদলবদলে কম-বেশি হয় না। তাছাড়া পাণ্ডুলিপিতে কি ছিল, প্রথম প্রকাশে তার কোনো রদবদল হয়েছিল কিনা, পরবর্তী সংস্করণে তার কোন্ রূপান্তর লক্ষিত হয়, কোন্ তারিখে এটি পড়া হয়েছিল, কোথায়—এ সবেরই বা দরকার কি? অর্থাৎ যাকে textual-editing বলা হয়, তিনি তার গুরুত্ব স্বীকার করেন নি। অথচ পাশ্চাত্ত্যে এই ধরনের সম্পাদন-কার্য উচ্চমর্যাদা লাভের অধিকারী হয়েছে। আমাদের দেশে অনেকে যে গুরুত্ব দেন না তার কারণ ঐতিহাসিক দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও তথ্যগতজ্ঞান সম্পর্কে অনীহা। সুখের বিষয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, শ্রীসুশীলকুমার দে, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপুলিনবিহারী সেন সংকলন-সম্পাদন কর্মে মহৎ প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু তরুণ সমাজের ঔদাসীন্য মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করছে।

'ছন্দ' গ্রন্থখানির সম্পাদনা উচ্চাঙ্গের হয়েছে। সম্পাদনা কর্মে যে কী দুরূহ শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে গ্রন্থখানির দিকে লক্ষ্য করলেই সে কথা প্রতীয়মান হবে। একটি ঘটনা ধরুন। ছন্দের বিচিত্র প্রকৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়েছেন, তার কোন্‌টি কোন্ কবিতা বা গান থেকে নেওয়া অথবা প্রয়োজনবোধে কবি তাঁর বক্তব্যের পোষকতার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যে কবিতা রচনা করে নিয়েছেন সেগুলির ঠিক হদিশ দেওয়া সামান্য শ্রমের ব্যাপার নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। একবার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দে রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্র লেখেন 'টঙ্কা দেবী কর যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা' ইত্যাদি। ঐ কবিতার দুটি মাত্র পদ রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেন। কিন্তু রবীন্দ্র-উদ্ধৃত পদ দুটির পাঠ ঠিক কিনা তার বিচারের জন্য রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্য কথা' অংশে উদ্ধৃত পদটি এবং 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় প্রকাশিত পদটির তুলনামূলক বিচার করতে হয়েছে। অনেকের কাছে এগুলি হয়ত পণ্ডশ্রম কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এর মূল্য নিশ্চয়ই বুঝবেন। আলোচ্য গ্রন্থে এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

সম্পাদিত গ্রন্থের অপর বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিষয়ক রচনাগুলিকে কালক্রম অনুসারে ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বিন্যাস করা। পূর্বের সংস্করণে এই রীতি অবলম্বিত হয় নি। রচনার কালক্রম অনুযায়ী রচনাগুলিকে সাজিয়ে

ধরলে রচয়িতার বক্তব্যের ও দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক রূপের পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-চিন্তার স্বরূপ আলোচ্য গ্রন্থে রচনাসন্নিবেশকৌশলে সহজ-বোধ্য হয়েছে। 'পরিশেষ' ও 'সম্পূরণ' অংশে অনেক নতুন রচনা ও চিঠিপত্র, ভাষণ সংকলিত হতে দেখা যায়। ফলে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্পর্কিত তাবৎ রচনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এই গ্রন্থ পাঠে লাভ করা যাবে।

সম্পাদিত গ্রন্থখানির একটি বড়ো অংশ 'গ্রন্থপরিচয়' বিভাগ। সংজ্ঞা, পাঠ, পাণ্ডুলিপি ও দৃষ্টান্ত এই চতুর্বিধ পরিচয় ঐ বিভাগে প্রদত্ত হয়েছে। এগুলির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি পড়লে দেখা যায় তাঁর ব্যবহৃত ছন্দ-পরিভাষাগুলি সর্বত্র সমার্থক হয় নি। যেমন 'কলা' শব্দটি। একটি লঘুধ্বনি উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রে তাকে বলা হয় 'কলা'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো পর্বকে বলেছেন 'কলা', কখনো বা 'উপপর্ব'কে। 'তিন মাত্রার ছন্দ'কেই তিনি যে কত নামে ডেকেছেন। এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত বক্তব্যকে পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরতে গেলে তাঁর ব্যবহৃত পরিভাষা ও সংজ্ঞা-গুলির বিশদ পরিচয়ের দরকার আছে।

'পাঠ-পরিচয়' অংশে মুখ্য রচনাগুলির পূর্ণতর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এণ্ডারসন-রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো প্রকাশিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ 'ছন্দ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্তির সময় বর্জিত হয়েছিল। সেগুলিকে উদ্ধার করে বসানো হয়েছে। তাছাড়া 'চলতি ভাষার ছন্দ' রচনাটি প্রথম সংস্করণে ও রচনাবলী সংস্করণে ছিল না। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থের এই রচনাটিকে আলোচ্য গ্রন্থে স্থান দেওয়া সঙ্গত হয়েছে।

কাজেই অনিবার্য কারণে 'গ্রন্থপরিচয়' অংশ দীর্ঘ হয়েছে। দুরূহ শ্রমজাত এই তথ্যসম্ভারকে আমরা সানন্দে গ্রহণ করব। এই ধরনের কাজ বাংলা-সাহিত্যে যত হয় ততই ভালো।

রবীন্দ্রনাথ শুধু মহাকবি বা ছন্দস্রষ্টা নন, তিনি যে তত্ত্ববিচারেও ছান্দসিকদের অগ্রগণ্য আশা করি এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। তিনিই প্রথম বাংলাছন্দের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন বা মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেন, তার অন্তর্নিহিত রূপ-বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে আমাদের সামনে ধরে দেন, কত সূক্ষ্ম অর্থবহ চমৎকার ইঙ্গিত দেন, সেগুলি সম্পর্কে আমরা পূর্বে

সচেতন ছিলাম না। 'কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাইব'—ছন্দ ও সঙ্গীত উভয় ক্ষেত্রে চিরদিন রবীন্দ্রনাথ এই নীতি মেনে এসেছেন। তাই তিনি যখন 'চাল' ও 'চলন' প্রসঙ্গ তোলেন, অথবা সম-অসম-বিষম চলনের ছন্দের কথা বলেন, তখন তিনি প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণের পথে চলেন না, নিজের সূক্ষ্ম সংবেদন দ্বারা যা অনুভব করেন তাকেই প্রকাশ করে দেন। তাই দেখি—শরদ চন্দ | পবন মন্দ | বিপিনভরল | কুসুমগন্ধ | —এই পর্ববিভাগকে তিনি নতুন নাম দেন 'পদক্ষেপ' এবং এর উপরেই যে ছন্দের বিশেষত্ব নির্ভর করছে সেটি আমাদের দেখিয়ে দেন। এই শ্রুতি কোনো ব্যাকরণ প্রভাবজাত নয় বরঞ্চ সংগীতের প্রভাবজ। রবীন্দ্রনাথ ছন্দের আলোচনায় সংগীতের পরিভাষা—যথা, সম, তাল, লয়, ফাঁক প্রভৃতির প্রচুর ব্যবহার করেছেন। মনে হয় তার ফল সর্বত্র শুভ হয় নি। সংগীতের 'তাল' বা 'লয়' দিয়ে বাংলা কবিতার ছন্দবিচার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ কথিত 'নয় মাত্রার ছন্দে' রচিত সেই 'আঁধার রজনী পোহাল' গানটির প্রসঙ্গ এই সূত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। অমূল্যধনবাবু যে প্রশ্ন তুলেছিলেন তার সন্তোষজনক জবাব সেখানে নেই। রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন গীতছন্দের 'পর অমূল্যধনবাবু জোর দেন পঠিতছন্দের যতি ও প্রস্বরের 'পর। সেজন্য মতের মিল ঘটে নি। (অবশ্য রবীন্দ্রনাথ গীতছন্দ ও পঠিতছন্দের ভেদ সম্পর্কে দিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন :

"গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের পরে।")

অথবা 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' অধ্যায়ে বাংলায় হসন্ত-মধ্য শব্দের মাত্রাগণনার আলোচনাকালে তিনি যখন 'পয়ার' ঠাটের বলে 'টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল্'—পংক্তিকে চালাবার চেষ্টা করেন তখন আমরা ঐ পংক্তিতে ছড়ার ছন্দকেই পাই, 'পয়ার'কে নয়। আবার 'ছন্দের প্রকৃতি' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় জেদের সুরে বলেন, "অথচ এই প্রাকৃত-বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ-কাব্য' লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হত সেকথা স্বীকার করব না।" তখন তাঁর মতকে আমরা কোনো ক্রমেই স্বীকার করি না। রবীন্দ্রনাথ অন্তত বহুভাবে কি মেঘনাদবধে ব্যবহৃত ছন্দের প্রশংসা করেননি ?

এ ভাবে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো মন্তব্যের সঙ্গে ঐকমত্য বোধ না

করবার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখি কবি কী অনায়াসে, অবলীলাক্রমে নানা মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রচনা করে চলেছেন। কী নিপুণভাবে ইংরেজি অথবা সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের পার্থক্য নির্ণয় করছেন। অথবা সংস্কৃত-বাংলা এবং প্রাকৃত-বাংলার ছন্দের মধ্যেকার তফাৎ বোঝাতে গিয়ে দুয়ের প্রকৃতিগত গড়নটিকে কতো সুন্দর করে খুলে-খুলে দেখিয়েছেন। প্রচলিত মতে যাকে 'পয়ার ছন্দ' বলা হয় (প্রবোধবাবু বলেন 'বিশিষ্ট কলামাত্রিক') তার দেহে যুক্তধ্বনির বহুল অবস্থান সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত 'শোষণশক্তি'র বলে মাত্রাগত সমতা বিদ্যমান থাকে। 'শোষণশক্তি' আখ্যা রবীন্দ্রনাথই দান করেন। তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের 'প্রবহমানতা' সম্পর্কে তিনিই আমাদের সচেতন করেন, গদ্য কবিতার ছন্দকে নির্দেশ করেন 'ভাবের ছন্দ' বলে আর শেষে বলে যান "একদা কাব্যের পালা শুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়েনি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্যে-পদ্যে রফানিষ্পত্তি চলছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি।"

রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ ছন্দের অজস্র রূপ নির্মাণ করেছেন ও ছন্দতত্ত্ব আলোচনায় অগ্রণী হয়েছেন। বাংলা কবিতার ছন্দে যে কত সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ছন্দ আলোচনায় অগ্রণী না হলে সেই সম্ভাবনা অজ্ঞাত থেকে যেত।

রবীন্দ্র মজুমদার

রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি

ভারতের লোকমানসকে রামায়ণ যে কী গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে, তা নিয়ে বাগবিস্তার করা বাহুল্য। যাকে বলা হয় 'ইণ্ডিয়ানিজম্'—ভারতীয়তা বা ভারতীয় মানস—তারই এক অতি উজ্জল ও সংহত রূপ চিত্রিত হয়েছে রামায়ণে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যেসব মূল্যবোধ সাধারণভাবে ভারতীয়দের ব্যক্তিজীবনকে এবং পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেই সব মূল্যবোধই বাস্তব দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রামায়ণে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "রামায়ণের আদি-কবি, গার্হস্থ্যপ্রধান হিন্দুসমাজের যত কিছু ধর্ম, রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে ভ্রাতৃরূপে পতিরূপে বন্ধুরূপে ব্রাহ্মণধর্মের রক্ষাকর্তারূপে অবশেষে রাজারূপে বাল্মীকির রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন; নিজের সমুদয় সহজ প্রবৃত্তিকে শাস্ত্রমতে কঠিন শাসন করিয়া সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। আমাদের স্থিতিপ্রধান সভ্যতায় পদে পদে যে ত্যাগ ক্ষমা ও আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয়, রামের চরিত্রে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়া রামায়ণ হিন্দুসমাজের মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।"

রামায়ণ মহাকাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি আর তার কাহিনীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রূপক বা nature myth সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত আলোচনা করেছেন। রামায়ণের এই দুই দিকের ওপরেই রবীন্দ্রনাথও আশ্চর্য উজ্জল আলোকপাত করেছেন। 'রামায়ণ' (প্রাচীন সাহিত্য), 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (ইতিহাস), 'সাহিত্যসৃষ্টি' (সাহিত্য) প্রভৃতি প্রবন্ধে, 'রক্তকরবী'র প্রথম সংস্করণের (১৯২৬) প্রস্তাবনায় এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের ইতিহাসাশ্রিত কাঠামো আর তার রূপকার্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে সেই রূপকার্থ হল এই:

রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি—প্রবোধচন্দ্র সেন। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা ৯। তিন টাকা

রামায়ণ-কাহিনীর মুখ্য চরিত্র রাম আর সীতা: রাম শব্দটির অর্থ রমণীয়; তাঁর বর্ণ নবদূর্বাদলশ্যাম—কৃষিজাত শস্যশ্যামল রমণীয়তার প্রতীক; তিনি পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করেছিলেন—হলচালনার অযোগ্য ঊষর ভূমিকে উর্বরা করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গোরু তখন ধন বলিয়া এবং কৃষি পবিত্রকর্মরূপে গণ্য হইত। জনক স্বহস্তে চাষ করিয়াছেন। এই চাষের লাঙল দিয়াই তখন আর্যেরা ভারতবর্ষের মাটিকে ক্রমশ আপন করিয়া লইতেছিলেন। এই লাঙলের মুখে অরণ্য হঠিয়া গিয়া কৃষিক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। রাক্ষসেরা এই ব্যাপ্তির অন্তরায় ছিল।" "ভারতবর্ষে কৃষি বিস্তারে উদ্‌যোগী পুরুষ" জনকের হলমুখে সীতার—অর্থাৎ হলরেখার—আবির্ভাব; সীতার পাতাল-প্রবেশ কাহিনীর মধ্যেও তাঁর এই রূপক-সত্তার সমর্থন মেলে। এই সীতাপতি রাম আর হলধর বলরামকে এক ও অভিন্ন মনে করার মতো পৌরাণিক উপাদান যে প্রচুর আছে, তা সকলেই জানেন। রাম আর সীতার নিত্যসহচর লক্ষ্মণ—যে-শব্দটির অর্থ কল্যাণ ও সম্পদ।

এই রূপকার্থের আরেক দিকে আছে স্বর্ণলঙ্কা ও রাবণ। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে (এবং মহাভারতের বনপর্বে বর্ণিত রামোপাখ্যানেও) রাবণ শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে রবকারয়িতা—যিনি আপন প্রতাপবলে দেবতা মানুষ ও যক্ষদের আর্তরব করিয়েছিলেন। দশগ্রীব কামবল রাবণের বিভীষিকাময় প্রতাপের উৎস বিপুল ধনসম্পদ, সঞ্চিত স্বর্ণ। মায়াবী স্বর্ণমৃগের প্রতি প্রলুব্ধ করে সীতাকে হরণ করার মধ্যে যে বক্তব্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা খুব স্পষ্ট: চিরকাল এই স্বর্ণাধিপতিরা ধনলোভে আকৃষ্ট করে কৃষিজীবীর সর্বনাশ ঘটায়। 'রক্তকরবী'র প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কৃষি যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে।" আরণ্যকাণ্ডে স্বর্ণমৃগরূপী মারীচের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 'রজতবিন্দুচিত্রিত', 'রৌপ্যবিন্দুশোভিত' বলে। আরেকটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই-যে, সীতাহরণ ঘটেছিল 'রামের প্রিয় ঋতু' হেমন্ত কালে—যখন ধরার অঞ্জলি ভরে উঠেছে পাকা ধানে।

রামায়ণে যে সামাজিক ইতিহাসটুকু প্রচ্ছন্ন আছে, সে সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বিশদ আলোচনা করেছেন 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' ও

'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধ দুটিতে। রামকাহিনীর মূলে আছে ভারতের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের যে তিনটি বিরাট ঘটনা, রবীন্দ্রনাথের মতে তা এই :

১। মৃগয়াজীবী ও গোসম্পদে আসক্ত আর্যদের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজারা ক্রমেই বেশি করে কৃষিনির্ভর হয়ে পড়তে লাগলেন এবং এই কৃষিবিস্তার উপলক্ষেই অনার্যদের সঙ্গে তাঁদের সংঘাত বাধল। "আর্যদের ভারত-অধিকারের পূর্বে যে দ্রাবিড়জাতীয়েরা আদিম নিবাসীদিগকে জয় করিয়া এই দেশ দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। তাহারা আর্যদের কাছে সহজে হার মানে নাই। ইহারা আর্যদের যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইত, চাষের ব্যাঘাত করিত। দাক্ষিণাত্যে কোনো দুর্গম স্থানে এই দ্রাবিড়জাতীয় রাজবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদেরই প্রেরিত দলবল হঠাৎ বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আর্য উপনিবেশগুলিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল" —বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

২। আর্যদের কৃষিবিস্তারের শত্রু 'রাক্ষস'শক্তির পরাজয়: রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বিশ্বামিত্রের প্রেরণায় "রামচন্দ্র বানরগণকে—অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইয়া বহুদিনের চেষ্টায় ও কৌশলে এই দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট করিয়া দেন। এই কারণেই তাঁহার গৌরবগান আর্যদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।" সুউন্নত এক সভ্যতার স্রষ্টা এই দ্রাবিড়রা ছিল শিবের উপাসক—যে-শিব নিজেও একসময় তাঁর 'প্রেত' সঙ্গীদল নিয়ে দক্ষরাজার যজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন। আর্যদের কাছে বিভীষিকাময় সেই শৈবশক্তির প্রতীক হরধনু ভঙ্গ করে রাম জনকের আস্থা অর্জন করেছিলেন।

৩। একদিকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে আত্মকলহ, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষত্রিয়ের জয়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেই বিরোধকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বৃত্তিগত ভেদ"—সনাতন আচারবিধির প্রতি একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণরা ছিলেন যজ্ঞানুরক্ত, আর উপনিষদোক্ত 'রাজবিদ্যা'র প্রতি আগ্রহী ক্ষত্রিয়রা কালক্রমে হয়ে উঠেছিলেন যজ্ঞবিরোধী। বলা বাহুল্য, যজ্ঞকে কেন্দ্র করে ব্রহ্মা-উপাসক ব্রাহ্মণদের আর বিষ্ণু-উপাসক ক্ষত্রিয়দের এই সংঘাতের পেছনে আসলে ছিল পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় ক্ষমতা দখলের লড়াই, মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পুরাতনের বিরুদ্ধে নতুনের লড়াই। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার যাঁরা এই নতুনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে

অগ্রগণ্য হলেন বিশ্বামিত্র—যিনি সনাতন ব্রাহ্মণ্য রীতিনীতির রক্ষক ও রঘুবংশের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের অধিকার থেকে রামকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'য় এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় দ্বন্দ্বের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবদ্ধ হইয়া আছে।"

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর এই 'রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি' গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলিকেই বিশদ ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমতের ভিত্তিতেই গ্রন্থকার তাঁর নিজের বক্তব্যগুলি দাঁড় করিয়েছেন।

এই বইটি রামায়ণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থকার-লিখিত পাঁচটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রথম প্রবন্ধটি ('রামায়ণ') লেখা হয়েছিল রাজশেখর বসু-কৃত রামায়ণের সারানুবাদ ও শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত-কৃত তুলসীদাসের রামচরিতমানসের বঙ্গানুবাদের আলোচনা উপলক্ষে। এই প্রবন্ধে সেন মহাশয় রামায়ণের ঐতিহাসিক পটভূমির আর রূপকার্থের যে-বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তা সাধারণ রামায়ণ-পাঠকের মনে রামায়ণকাব্যের মোটের ওপর স্পষ্ট ও বাস্তব-গ্রাহ্য এক সামাজিক পটভূমি রচনা করবে। সেদিক থেকে এই প্রবন্ধটি মূল্যবান।

এই রকম আরেকটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ রচনা হল তৃতীয় প্রবন্ধ 'রামায়েত ধর্ম': বৈষ্ণব ধর্মের নানা সাম্প্রদায়িক বিভাগের মধ্যে মুখ্য দুটি বিভাগ হল কৃষ্ণায়েত আর রামায়েত। ভারতের প্রাচীনতম ধর্ম-শাখাগুলির অন্যতম কৃষ্ণায়েত বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক বাসুদেব কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু তার তুলনায় ঢের অর্বাচীন রামায়েত বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক কে? নিশ্চয়ই রাম নন; বাল্মীকিও নন। ভারতের লোকমানসে কৃষ্ণ যেমন কালক্রমে দেবত্ব অর্জন করে জগৎপালক বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, রামও তেমনি অনেক পরে—সম্ভবত খ্রীষ্টীয় ১ম-৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে—বিষ্ণুর অবতার হিসাবে পূজিত হতে থাকেন। এরকম অনুমানের কারণ খ্রীষ্টপূর্বকালে লেখা কোনো গ্রন্থে বা শিলালিপিতে রামাবতারের কোনো উল্লেখ কোথাও নেই। বিষ্ণুই যে রামরূপে ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন, একথা যেসব গ্রন্থে বলা হয়েছে—যেমন, বায়ুপুরাণে, মহাভারতের শান্তিপর্বে, রামায়ণের আদিকাণ্ডে ও উত্তরকাণ্ডে—সে সবই খ্রীষ্টীয় পাঁচ শতকের মধ্যে রচিত বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। রামের মূর্তিপূজার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায়। চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রামের মূর্তিপূজা যে বেশ ব্যাপক আকারে শুরু হয়েছে, তার নানা প্রমাণ আছে।

এই সব রামপূজকদের এক সুসংগঠিত রামায়েত ধর্মসম্প্রদায়ে সংঘবদ্ধ করেন চতুর্দশ শতকে সাধু রামানন্দ ও তাঁর শিষ্যরা। রামানন্দ প্রথমে ছিলেন রামানুজ-প্রবর্তিত শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজে অনুসৃত সংকীর্ণ জাতিভেদ বর্ণভেদ অধিকারভেদ বৈষ্ণবদের মধ্যে কখনও তেমন প্রবল না থাকলেও, রামানুজ-অনুগামী বৈষ্ণবাচার্যরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সংকীর্ণতা, রক্ষণশীলতা ও অনুদারতার গণ্ডীতে বাঁধা পড়ছিলেন। যে-বর্ণভেদ প্রথা মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে, তৎকালীন ভারতের সামাজিক পটভূমিকায় রামানন্দের এই রামায়েত বৈষ্ণবধর্মান্দোলন খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেই গোঁড়ামির যুগে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যকে অস্বীকার করে রামানন্দ অত্যন্ত দুঃসাহসী এক বিপ্লবী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। রামানন্দের বারোজন অগ্রগণ্য শিষ্যের মধ্যে একজন মুসলমান জোলা কবীর, একজন চামার রুইদাস এবং আরেকজন নাপিত সেনা। রামানন্দের নারী-শিষ্যদের মধ্যে পদ্মাবতীর নাম স্মরণীয়।

রামানন্দ-প্রবর্তিত এই রামায়েত ধর্মান্দোলনের আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য এই যে, সে সময়ে ভাগবত ধর্মের অবক্ষয়ের ফলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা, গোপীলীলা ও কান্তভাব জনমানসের এক বিপুল অংশকে প্রভাবিত করে এক সামাজিক-নৈতিক অধঃপতন ঘটাচ্ছিল। কৃষ্ণায়েত বৈষ্ণবদের সেই লীলাবাদের স্থানে রামানন্দ ভক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করলেন রামসীতার অতি মহৎ ও মানবিক চরিত্রের আদর্শকে স্থাপন করে।

এই প্রসঙ্গে, একটি প্রশ্ন আমাদের মনকে পীড়িত না করে পারে না বাংলাদেশে যে রামপূজা প্রতিষ্ঠা পায় নি, সহজ ও উদার রামায়েত ধর্ম এদেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারে নি, তার কারণ কি এই যে চৈতন্যদেব সেযুগে আমাদের সমাজের সমস্ত সংকীর্ণতার বাঁধ ভাঙার জন্যে যে উদার ও অতি প্রবল বৈষ্ণবান্দোলন শুরু করেছিলেন, প্রধানত ওই কান্ত-ললিত ভাবকেই আশ্রয় করেছিল, লীলাবাদ কোণঠাসা করে রেখেছিল ভক্তিবাদকে? রামায়েত বৈষ্ণবধর্মে ভক্তিযোগের সঙ্গে

কর্মযোগের সমন্বয় ঘটেছিল, বাংলাদেশের ভাবাবেগবিহ্বল প্রেমলীলারসে আচ্ছন্ন বৈষ্ণবমানস তাকে ঠিক নিতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "রামায়ণকথায় একদিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মানুষের যতপ্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে, তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদ্বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যের নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণকথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিতে পারে নাই, তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"

শেষ দুটি প্রবন্ধে ('রামরাজ্য' এবং 'রামরাজ্য ও আধুনিক ভারত') লেখক আলোচনা করেছেন বাল্মীকি থেকে তুলসীদাস ও গান্ধীজী পর্যন্ত বহু শতাব্দী ধরে যে রোগ-দৈন্য-ভেদাভেদহীন আদর্শ এক রাষ্ট্রব্যবস্থা ভারতীয়দের কল্পনায় চিত্রিত হয়ে এসেছে, সেই রামরাজ্যের কথা। স্বভাবতই এই প্রবন্ধ দুটিতে সবচেয়ে বেশি জায়গা 'জুড়ে' আছে রামরাজ্য বলতে গান্ধীজী কি বুঝতেন, তারই আলোচনা। লেখক নিষ্ঠাবান গান্ধীভক্ত এবং ভাববাদীর এই ভক্তিবশে তিনি রামায়ণে বর্ণিত রামচরিত্রমাহাত্ম্য "সর্বতোভাবে মহাত্মাজি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য" বলে ঘোষণা করেছেন। (পৃঃ ৯৫) রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে গান্ধীজীর রামরাজ্যের পরিকল্পনাটি নিয়ে তর্ক না থাকতে পারে—সব যুগে সব মানুষই রাষ্ট্রিক-সামাজিক ব্যবস্থার এক আদর্শ কল্পরূপ সামনে রাখে, গান্ধীজীও তাই রেখেছিলেন। কিন্তু সমগ্রভাবে ও সাধারণভাবে রামরাজ্যের ধ্যানমুগ্ধ গান্ধীবাদ ও গান্ধীদর্শনের ভূমিকা কি, তা আরও একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

এ-যুগের কোনো সামাজিক আন্দোলনই রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না—বিশেষ করে যখন সেই সামাজিক আন্দোলনের রূপটি এদেশে বণিকশক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সূচিত হয়েছিল। ধনিক-বণিক শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণব ভাগবত বিশ্বাস অপেক্ষাকৃত প্রবল (তৎকালীন একটি বিশেষ সামাজিক শক্তির বিকাশের মুখেই যে বৈষ্ণববাদের জন্ম—এটা ঐতিহাসিক সত্য) এবং গান্ধীজীর সেই রামভক্তি বৈষ্ণব বণিক-পরিবারেরই উত্তরাধিকার। আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে গান্ধীজীর খুব বড়ো দান হল রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও সমাজের নৈতিক উন্নতির সাধনাকে যুক্ত করা। ভারতের জননায়ক ও ধর্মনেতাদের মধ্যে গান্ধীজীই প্রথম মানুষের আত্মিক ও নৈতিক বিকাশের জন্যে দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নয়ন আর রাজনৈতিক মুক্তিকে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু রামভক্তিমুগ্ধ

গান্ধীজীর দর্শনের মধ্যে স্ববিরোধিতা ধরা পড়ে যখন তিনি বলেন—রাজনৈতি মুক্তির পর সেই আদর্শ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে অহিংস কর্মযোগের মধ্যে দিয় ব্যক্তির 'হৃদয় পরিবর্তনের' মধ্যে দিয়ে।

রামানুগামী চরিত্রমাহাত্ম্যে, প্রেমের আহ্বানে, হৃদয়ের মুক্তিতে, অহিংসা উদারতায় এ-যুগের সমস্ত জটিলতার ও সংঘর্ষের সমাধান হতেই পারে না কারণ, হিংসার রূপ যুগে যুগে বদলায়। আজকের দিনে শ্রেণীগত শোষণে মধ্যে দিয়ে হিংসার নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি। কিন্তু ধনবাদী রাষ্ট্রকে এ হিংসাশ্রিত শ্রেণীবৈষম্যের ফল বলে গান্ধীজী ঘোষণা করেন নি। এই রাষ্ট্রে প্রভু যে-শোষকশ্রেণী, সেই শ্রেণীর বিলুপ্তি না ঘটলে রাষ্ট্রে ব্যক্তির আত্মবিকাশ —সে বিকাশ আত্মিক বা সামাজিক যাই হোক না কেন—হতেই পারে না এই শ্রেণীবোধ গান্ধীজীর রচনাবলীতে পাওয়া যায় না। শোষক শ্রেণীই যে সহিংস শ্রেণী .এবং তাদের হাতে রাষ্ট্রীয় শক্তিই যে সেই হিংসার কায়েমী অস্ত্র, এ কথা গান্ধীজী কখনও বলেননি। এ দেশের উঠতি ধনিকশ্রেণী তাই সাবালকত্ব অর্জনে গান্ধীবাদের সুযোগ নিয়েছে পুরোমাত্রায়।

আদর্শ এক রামরাজ্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী গান্ধীজী কতকগুলি সামাজিক নীতি তৈরি করে নিয়েছিলেন: আত্মশাসনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় শাসনের বিলুপ্তি ঘটানো; উপকরণ-বাহুল্য বর্জনের দ্বারা জীবনযাত্রাকে সরল ও 'প্রাকৃতিক' করে তোলা; সেই উদ্দেশ্যেই প্রাচীন আদর্শে পল্লীকেন্দ্রিক সমাজ গড়ে তোলা; পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মারফতে কেন্দ্রীভূত সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রক্ষমতাকে জনসাধারণে মধ্যে পরিবেশন করে দেওয়া; ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, বণিক শ্রেণী সাবালকত্ব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিমধ্যেই এ-সব আদর্শ সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয় পড়েছে। তাই, গ্রন্থকারের কথায়, "যে-রামরাজ্যের কল্পনা বহুশত বৎস ধরে ভারতবর্ষের হৃদয়কে মুগ্ধ করে রেখেছে, বিংশ শতকে মহাত্মা গান্ধী তাকে কার্যক্ষেত্রে রূপ দেবার প্রয়াসে জীবনপাত" করলেও, তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে "এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে সে-কল্পনাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠাদানের কোনো প্রয়াস দেখা গেল না" তার কারণ "রামরাজ্যের কল্পনা ভারতীয় চিত্তে নিছক কল্পনারূপেই আবির্ভূত হয়েছিল এবং কল্পনাতেই পর্যবসিত হয়েছিল, কখনও ভাবনায় পরিণত হয়নি।" শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক শক্তি যতোদিন রাষ্ট্রে কর্ণধার, ততোদিন হৃদয়-পরিবর্তন, ব্যক্তিগত সত্যচর্চার দ্বারা অপরে শ্রেয়বোধকে জাগিয়ে তোলা ইত্যাদি রামরাজ্যনীতির ধোঁয়াটে ধারণা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের ভাষা ও ভঙ্গীর মধ্যে সহজ সাবলীলতা আছে। রামায়ণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি অনেক ভেবে দেখা মতো কথা বলেছেন—কিন্তু তিনি রামায়ণ পাঠ করেছেন প্রধানত কাব্য রসগ্রাহীর স্বচ্ছ ও প্রসন্ন মন নিয়ে। তাঁর রচনার প্রসাদগুণ পাঠকে তৃপ্তি দেবে।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : আদি পর্ব

'গ্রন্থালয়' প্রকাশ ভবনের কল্যাণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কতকগুলি অবিস্মরণীয় লেখা আবার পড়া গেল। একটি সুলিখিত ভূমিকা ও একটি মূল্যবান গ্রন্থ-পরিচিতি বইখানির গৌরব বাড়িয়েছে। বইখানির জন্য প্রকাশ ভবনকে, ভূমিকার জন্য রথীন্দ্রনাথ রায় ও গ্রন্থপরিচিতির জন্য অশোক গুহকে পাঠকমাত্রেই সাধুবাদ জানাবেন। শ্রীযুক্ত রায় মানিক-সাহিত্যের আদি-অন্তের নিপুণ রসগ্রাহী আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন।

মানিকবাবুর সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে কল্লোল যুগের কথা অনিবার্যভাবে ওঠে। জগদীশ গুপ্তের উত্তরসূরী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলা হয়। এক্ষেত্রেও সে কথা উঠেছে, এবং সে কথা বলা হয়েছে। এগুলির যথোপযুক্ততা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। সুতরাং আমরাও ভূমিকা লেখক ও গ্রন্থপরিচায়কের সূত্র অবলম্বন করে মানিকবাবুর সৃষ্টির অনন্যতার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হব। কল্লোল এবং জগদীশ গুপ্তকে ছাড়িয়ে মানিকবাবুর যাত্রারম্ভ। সে কারণে কল্লোল ও জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে তাঁর মিল-অমিলের কথাটা সর্বপ্রথমেই প্রাসঙ্গিক। ব্যক্তির স্বতন্ত্র চেহারা আঁকতে গিয়ে, দেখা যায়, কল্লোলের অধিকাংশ লেখকই মানুষের নিঃসঙ্গ স্বরূপ অঙ্কনের দিকে চেষ্টিত ছিলেন। কিন্তু সেই নৈঃসঙ্গ্যকে আঁকার বিষয়ে কল্লোলী লেখকরা অধিকাংশক্ষেত্রেই দুই ধরনের অসঙ্গতির বোঝা বহন করেছেন। এক, নৈঃসঙ্গ্যকে রোমান্টিক বৈভব বিবেচনা করে তাকে বর্ণালু ভঙ্গিতে রূপায়িত করেছেন, নতুবা, নৈঃসঙ্গ্যটা বিদেশী ব্যাপার বিবেচনায় বিষয়ে এবং বিন্যাসে বিদেশী গল্পের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে গিয়ে কৃত্রিমতার দ্বারস্থ হয়েছেন। জগদীশ গুপ্তের বৈশিষ্ট্য এখানে যে তিনি নৈঃসঙ্গ্যকে রোমান্টিক বর্ণালুতায়

মানিক গ্রন্থাবলী : প্রথম ভাগ। গ্রন্থালয়। দশ টাকা।

রঙিন করেন নি, এবং তাঁর শিল্পসৌরভ সন্দেহাতীতরূপে দেশজ। জগদীশ গুপ্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস পড়ে সব সময়েই মনে হয় শরৎচন্দ্রের আবেগপুষ্ট বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন আস্বাদ পাচ্ছি—কিন্তু কখনো এ কথা মনে হয় না যে বিদেশী উপন্যাসের নায়কদের চলন, বলন, মননকে ধুতি-পাঞ্জাবী পরিয়ে হাজির করা হচ্ছে। কেন না, তাঁরা তাঁদের শিল্পকর্মে যে অভিজ্ঞতার রঙ লাগিয়েছিলেন সেটা আসল রঙ। তাকে তাঁরাই খুঁজে বের করেছিলেন নিজ নিজ অন্বেষার টানে। সাহিত্যিক বিস্তর পড়তে পারেন, বিলিতি বইতে আপন দেশ খুঁজতে পারেন, কিন্তু সেই রঙ-ঢঙ তাঁকে নিজে মাথা খুঁড়ে বার করে নিতে হবে, যেমন পিকাসো, যেমন যামিনী রায়। তা নইলে সবই বৃথা। সে ব্যর্থতায় তাঁরা লিফলেট-বিশারদ অথবা মঞ্চ-বিশারদ হাফ-প্রফেট হতে পারেন, কিন্তু যে 'যুগ-যুগান্তে ফোটায় মুকুল—যার তাড়াহুড়া নাই', তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন না। আর তা করতে গেলে অতসী মাসীর বরের মতো বাঁশী বাজিয়েই যেতে হয়, বুকের রক্ত মুখে তুলে; আনন্দের মতো নেচেই যেতে হয়; সব আবরণ খুলে ফেলতে ফেলতে আগুনকে দিয়ে দিতে হয় সব কিছু। সেই কারণে মুখে মুখে যে সব বৃথা সহানুভূতি রটনা করা হয় তাঁর শেষ পরিণাম সম্বন্ধে—আমার সেগুলো ভালো লাগে না। মানিকবাবু মদ খেতেন? খেতে পারেন। হয়তো অনেকেই খান, কিন্তু তফাৎটা হল এই যে শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি কখনো নিজেকে ভোলেন নি, আর সব থেকে বড় কথা—কখনো অপরকে ভোলাতে চান নি।

তাই মানিকবাবুর সিদ্ধি আর ব্যর্থতাকে হ-য-ব-র-লয়ের সেই বিখ্যাত মাপ-ফিতে দিয়ে বিচার করা চলে না যাতে শুধু ছাব্বিশ ইঞ্চিই আছে। এর মাপকাঠি স্বতন্ত্র। রথীনবাবু সে বিষয়ে আমাদের ঠিক ভাবেই সচেতন করেছেন, কিন্তু মধুসূদনের তিন বছরের সাহিত্যজীবন ও বাকি শেষ কয়েক বছরের অপ্রতিরোধ্য আত্মবিনাশের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমৃত্যু সাহিত্য সাধনায় বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রমণের সাদৃশ্য শুধু মদ্যপানের কারণেই চিন্তা করতে লোভ হলেও, ঐ পার্থক্যের কারণেই করা উচিত নয়। এটা ভূমিকা লেখক শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ রায় সম্ভবত উপলব্ধি করেই "মধুসূদনীয় প্যাটার্ন" কথাটি ব্যবহার করেছেন। এবং জগদীশ গুপ্ত মানিকবাবুর পূর্বসূরী—এই উভয় লেখকের মধ্যে কিঞ্চিৎ আত্মিক সম্পর্ক আছে—এবং তা সত্ত্বেও শেষোক্ত লেখক পূর্বোক্তকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছেন—এই সমুদয় উক্তির

পরেও আমরা এখন জানতে চাই যে জগদীশ গুপ্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত পার্থক্যটা কোনখানে? রথীনবাবুর সুলিখিত ভূমিকায় এই পার্থক্যের অনুভূতি বিদ্যমান, কিন্তু তা অস্পষ্ট বলে, সে অনুভূতির প্রকাশও হয়েছে অস্পষ্ট। সদা-প্রচলিত, হাতের-কাছে-পাওয়া প্রশংসোক্তি—যথা, জীবনরহস্য অনুসন্ধানের গভীরতা, পর্যবেক্ষণের প্রশস্ততা, জিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণতা—এ-বিষয়ে বিশেষ আলোকসম্পাত করে নি। অন্যথা—সুন্দর এই ভূমিকাটিতে উক্ত অনুচ্ছেদটিই এই দৌর্বল্যের জন্য দ্বিধাবিভক্ত। অসংলগ্নভাবে এক নিঃশ্বাসে মানিকবাবুর ঐতিহ্যানুসারিতা আবিষ্কারে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে না পড়লে রথীনবাবুই বলতেন যে জগদীশবাবুর বিষয় হল মানুষের নিঃসহায়ত্ব; আর যাত্রারম্ভের মুহূর্তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় ছিল মানুষের নিরুপায়ত্ব। আত্মিক মিলটা এইখানে যে এই দুই-ই হল মানুষের নৈঃসঙ্গ্য-চেতনার দুপিঠ। আর, মানিকবাবু জগদীশ গুপ্তের অপেক্ষা অগ্রসর এই কারণে যে তাঁর চরিত্রেরা এই নিরুপায়বোধের কাছে আত্মসমর্পণ করে না, হেরে গেলেও করে না। শশী-কুবের-বিমল এরা এবং আরো অনেকে তার প্রমাণ। এইখানেই মানিকবাবুর পরবর্তী রূপান্তরের বীজ ছিল—কিন্তু সে কথা এ সংকলনপ্রসঙ্গে আলোচনার বিষয় নয়। প্রশ্ন তোলা যায় যে নিঃসহায়ত্ব ও নিরুপায়ত্বে তাৎপর্যগত তফাৎ কোথায়? জগদীশবাবু নিঃসহায় মানুষকে এঁকেছেন, আঁকতে গিয়ে মানুষের মূর্তিকে ট্র্যাজিক গৌরব দিয়েছেন। মানুষ নিরুপায় এই কথা বলতে গিয়ে মানিকবাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে এ-মানুষকে ট্র্যাজেডির নায়কের গৌরব দেওয়া যাবে না। বিমলকে শান্তার রক্তে লাল ব্যাণ্ডেজ পুড়িয়ে ফেলতে হয়, শশীকে চলে যাবার সমস্ত আয়োজন একে একে বাতিল করে গাওদিয়াতেই ডাক্তারি নিয়ে থাকতে হয়, কুবের আবার এক ব্যর্থতার পালা শুরু করে—যে সামান্য কারণে তারা কাহিনীর দিক থেকে আগ্রহোদ্দীপক বা ইণ্টারেষ্টিং ছিল, সে-টুকুও গুঁড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীতেও দাঁড়ি পড়ে। মানুষের এই মূর্তিই মানিকবাবু এঁকেছেন। এই গুঁড়িয়ে যাওয়াটাই মানিকবাবুর বিষয়। দেখতে গেলে এটা তুচ্ছ—ভাবতে গেলে এটা গুরু-গভীর। সে মানুষই আবিষ্কার করে যে তার জীবন মহাকাব্য তো দূরের কথা, ভালো করে লেখা একটা কবিতাও নয়।

দেখতে গেলে তুচ্ছ, ভাবতে গেলে গভীর মানিকবাবুর ভাষাও। প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই তার সার্থকতার স্তরে বক্তব্যের উপযুক্ত ভাষা গড়ে তোলেন—

ঔপন্যাসিকের ভাষার সেই তাৎপর্যপ্রসঙ্গে কয়েক বছর আগে 'পরিচয়' পত্রিকায় আলোচনা করা হয়েছে—এ কথা নতুন কথা কিছু নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রশ্নটা হল যে মানিকবাবুর ভাষার শক্তিটা কোথায়? সেক্ষেত্রেও আবার জগদীশবাবুর সঙ্গে তুলনাতেই মানিকবাবুর ভাষার বিশিষ্টতাকে বোঝা যাবে। জগদীশবাবুর ভাষায় বিন্দুমাত্র রাবীন্দ্রিকতা নেই। এবং সে গদ্য ব্যাখ্যামূলক ভঙ্গি গ্রহণ করতে ভালোবাসে। নিচের উদাহরণটি তার প্রমাণ।

> স্বামীর সঙ্গে মাখনের মিলনের একটা সূত্র না থাকিয়া পারে নাই; কিন্তু প্রাণের আঁশে আঁশে যোগের স্রোত প্রবেশ করিয়াছিল এ কথা বলা চলে না। সংসর্গজ স্তিমিত একটা কোমলতা জন্মিয়াছিল—মাঝে মাঝে তা ফুটিত; তার উপর কোথায় ভয়াবহ দণ্ডপাণি এক শাসক বসিয়া আছেন—তিনিও টানিয়া লইয়া প্রকাশ্যে একটা স্থানে জোড় মিলাইয়া দিয়াছিলেন—মাখন তা অস্বীকার করিতে পারে নাই। কিন্তু স্বামীকে মাখন চিনিয়াছিল। মানুষ মানুষের হাসি দেখিয়া চেনে, ভাষা শুনিয়া চেনে, চাহনি দেখিয়া চেনে, চিনিবার দিকে এমন উগ্রভাবে সচেতন প্রাণের কাছে প্রাণের পরিচয় গোপন রাখা যেমন কঠিন, চিনিতে পারার পর সেদিকে চোখ বুজিয়া থাকাও তেমনি কঠিন। সুখের হোক দুঃখের হোক তবু স্পর্শ ছিল—সুখে দুঃখে মিশ্রিত হইলেও এবং ইচ্ছা অনিচ্ছায় প্রবল হইলেও কর্তব্যের দায় আর প্রেরণা ছিল; অভিমানবোধ ছিল; আছে আর আছি বলিয়া নিরন্তর একটা অনুভূতি ছিল—
>
> সব লুপ্ত হইয়া গেছে—মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর নিপতিত জলবিন্দুর মতো সে এত বড়ো ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় যাইয়া আশ্রয় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেছে তাহার উদ্দেশ নাই।
>
> [একটি কলঙ্কিত কাহিনী। জগদীশ গুপ্ত]

শেষের কয়েকটি শব্দে লক্ষ্যভেদী-অনুচ্ছেদটিকে অব্যর্থ করে তোলার জন্যই যেন পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা-বিস্তৃত অনুচ্ছেদটি লেখা হয়েছে। লক্ষণীয় ভাষার অ-রাবীন্দ্রিকতা। 'প্রাণের আঁশে আঁশে যোগের স্রোত' বা 'সংসর্গজ স্তিমিত একটা কোমলতা'—প্রভৃতি বাগভঙ্গি শরৎচন্দ্রীয় প্রসাদ-পুষ্ট কানে অনভ্যস্ত ঠেকে। কিন্তু দীর্ঘ এবং আপাত শিথিল বাক্যের অন্তরে একটা শক্তি রয়েছে—যেটা জগদীশ গুপ্তের ভাবুকতার দান। মানুষের দুর্বলতা, এবং নিঃসহায়ের

কথা বলতে গিয়ে তাঁর জীবনের নানা স্বতঃবিরোধের কথা বলতে হয়—বাক্যাংশগুলি তাই যেন পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় ভাবে লগ্ন নয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই মানুষের সর্বজনীন নির্বুদ্ধিতার অংশ বিরাজমান। তাকে আবেগে রঙিন করে তোলা জগদীশ গুপ্তের কাজ নয়। গদ্যধারা তাই একান্ত নিরভিমান, মনোভঙ্গি নিরাসক্ত।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনের প্রারম্ভ পর্যায়ের গদ্যের সাধারণ লক্ষণও এই; কিন্তু সাধারন ধর্ম পৃথক। জগদীশবাবু থেকে যে অংশটুকু উধৃত করা হল তার "মানুষ মানুষের হাসি দেখিয়া চেনে···" এই অংশটুকুতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্য-ধ্বনির আভাস পাওয়া যায় বটে—তথাপি গভীরতর অভিনিবেশে মানিকবাবুর অধিকতর শক্তি সম্বন্ধে সদাই অবহিত হওয়া যায়। নিচের উধ্বৃতিটি তার প্রমাণ।

> স্নেহ প্রেম মমতা মানুষের নাগপাশ। নাগপাশে মূর্ছার তন্দ্রা। সে নাগপাশে আবদ্ধা থেকেও যে মোহনিদ্রা টুটিয়ে দিলে, বাঁধন-শুদ্ধ যে বেরিয়ে পড়ল পথে, পাশবদ্ধ কর্মশক্তি নিয়ে যে সকলের জন্য যে-বিপুল কাজ পড়ে আছে তার নিজের কাজটুকু শেষ করতে প্রবৃত্ত হল তাকে বোঝা যায় না। সে দুর্বোধ্য; তাকে ঘিরে রহস্য। মমতাদির শান্ত ও গম্ভীর মুখ দেখে আমার মনে হল, রাধুনীর কাজ নিতে এসে যে আমার শেষ-শৈশবে স্নেহ-করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিল, আজ আমার প্রথম যৌবনে সে আবার স্নেহ অস্বীকার করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।
>
> [বৃহত্তর ও মহত্তর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়]

স্পষ্টতই বুঝতে পারা যায় যে জগদীশবাবুর ক্ষেত্রে যেটাকে আমরা ভাবুকতা বলছি মানিকবাবুর ক্ষেত্রে সেটা শুধুই ভাবুকতা নয়, তদতিরিক্ত কিছু—সেটাই মানিকবাবুর দার্শনিকতা। জগদীশবাবু বুঝতে পারতেন যে-বিষয়বস্তু তিনি হাতে নিচ্ছেন তা অনন্যস্পৃষ্ট—কিন্তু এই বিষয়-ভাবুকতা তাঁকে কিছুটা আবদ্ধ করে ফেলত। বিষয়কে তিনি যেন বড় বেশি মূল্য দিতেন। মানিকবাবু সে ক্ষেত্রে জানতেন যে মানুষের অন্তর্জগতকে যদি সে নিজেই আনমনে আবিষ্কার করে ফেলে তাহলে সে-প্রসঙ্গে আর কোনো বিষয়ই তুচ্ছ নয়, কোনো বিষয়-গৌরবই গৌরবের নয়। এই দার্শনিকতাই মানিক-বাবুর ভাষাতেও প্রতিবিম্বিত। মানবিক হৃদয় অথবা প্রকৃতির খণ্ডলীলা যে

কোনো কিছুর বর্ণনাই তখন তাঁর হাতে হয়ে পড়ে সেই দার্শনিকতারই ভাষা-মাধ্যম। তাই অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে পদ্মার রূপবর্ণনা :

> কাউয়াচিলা পাখিগুলি ক্রমাগত জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। বকেরা এখন একক শিকারী, সন্ধ্যায় ঝাঁক বাঁধিবে। ষ্টীমার, নৌকা, ভাসমান কচুরিপানা, আকাশের পাখি ও মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে—তীরের দিকে চাহিয়া মনে হয় জলের সীমায় মাটির তীরভূমিও বুঝি লঘুগতিতে চলিয়াছে পিছনে।
>
> তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য। আকাশের রঙীন মেঘ ও ভাসমান পাখি, ভাঙন-ধরা তীরে শুভ্র-কাশ ও শ্যামল তরু, নদীর বুকে জীবনের সঞ্চালন, এসব কিছুই যদি না থাকে, শুধু এই বিশাল একাভিমুখী জলস্রোতকে পদ্মার মাঝি ভালোবাসিবে সারাজীবন। (পদ্মানদীর মাঝি)

সাধারণ বক্তব্য থেকে মানিকবাবু কেমন ভাবে গভীর কথা ছেঁকে আনেন উধৃতিটি তারও নিদর্শন বটে। গতিশীল যানের ওপর থেকে সব কিছুই পশ্চাদ্‌গামী বলে মনে হবে এই অতি সাধারণ তথ্যটি 'পদ্মানদীর মাঝি'র বিশিষ্ট তাৎপর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েই অর্থবান। এর মধ্যে অনন্যসাধারণত্ব কিছু নেই। কিন্তু মানিকবাবু যেই বলেন 'তবু নদী ছাড়া সবই বাহুল্য', যেই বলেন একাভিমুখী জলস্রোতের কথা, সঙ্গে সঙ্গে পদ্মার ছলচ্ছলে যেমন কান পাতলে সমুদ্রের ধ্বনি শোনা যায়—মানিকবাবুর এই সংক্ষিপ্ত সরলোক্তিও তেমনি সুগভীরের ইঙ্গিতবহ হয়ে ওঠে। নদী ছাড়া সবই বাহুল্য—এর মধ্যে জীবনের নিষ্ঠুর বৈরাগ্যের হঠাৎ ছায়া পড়েছে। এই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁর ভাষা এঁর "শিল্পসার্থকতার অন্যতম কারণই" শুধু নয়, এই ভাষাতেই ইনি জীবনকে ভেবেছেন। এখানে ভাবনাই ভাষা।

প্রসঙ্গত আরো বলা যায় এই প্রকৃতিচেতনাও মানিকবাবুর এক বিশিষ্ট সম্পদ। তিনি জগদীশ গুপ্ত থেকে যে সমস্ত কারণে অধিকতর অগ্রসর—এই প্রকৃতিচেতনা তার অন্যতম। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিদৃষ্টির ভিতরে যে শিশুর আনন্দ ও ঋষির বিস্ময় ক্রিয়াশীল ছিল—মানিকবাবুর প্রকৃতিচেতনা সে আনন্দ-বিস্ময়ের সঙ্গে বস্তুত সম্পর্কহীন। এ প্রকৃতি নিয়তির মতো নিষ্ঠুর বলে যে আমাদের মনে দাগ কাটে তা নয়, এ বৈরাগীর মতো অনাসক্ত বলে আমাদের তুচ্ছ আকাংক্ষাকে কোনো মূল্যই দেয় না। জীবলীলার প্রতি অনাসক্ত এই প্রকৃতির কথা মানিকবাবু বারে বারে

বলেছেন। প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় নদী বা জল তাঁর গল্পে একাধিকবার পৃষ্ঠ-পট রচনা করেছে। অন্তত বেশ কয়েকটি উপন্যাসে ও ছোট গল্পে এ কথার সাক্ষ্য মেলে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের নিরুপায়-মানুষের চরিত্রার্থ এই পটভূমিকায় স্বভাবত অন্যতর তাৎপর্য পেয়েছে। জগদীশবাবুর লেখাতে দেখা যায় যে বারে বারে তিনি অন্ধকারের কথা বলেছেন—তাঁর অন্ধকারের স্মৃতি দুর্মর। মানিকবাবু সে ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে আলো-অন্ধকারের কথা বলতে জানতেন। কারণ—আবার, আমরা আগের কথাতেই ফিরছি—মানুষের অন্ধকারে নিঃসহায় মূর্তি নয়, নিরুপায় মূর্তিটির নানা প্রয়াসের কথা ছিল তাঁর যাত্রারম্ভের কালের প্রধান কথা। অথচ মানিকবাবু ছবি আঁকতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। "অন্ধকার এত গাঢ় যে মনে হয় ধোঁয়ার মতোই বুঝি বাতাসে উড়িয়া যাইবে", অথবা "কুবের মুখ ফিরাইয়া দেখিল, নদীর বাতাস কপিলাকে স্পষ্ট করিয়াছে। শাড়িখানি মিশিয়া গিয়াছে অঙ্গে", অথবা, ভীত চোখে চারিদিকে চাহিয়া কলসীর মতোই আলগোছে কপিলা ভাসিয়া থাকে, তেমনি ত্রাসের ভঙ্গিতে স্তনদুটি ভাসে আর ডোবে"—এর কোনো ছবিই ঘটা করে রঙ তুলি নিয়ে আঁকা হয় নি। নদীর স্রোত যেমন চলতে চলতে তটের ওপর আঁকিবুকি কাটে, অথবা হাওয়া আঁকে মেঘের গায়ে এও তেমনি। কপিলার স্তন অথবা কীর্তিনিয়োগীর মাথার আর (পুতুলনাচের ইতিকথা)—লেখক কোথাও জড়িয়ে পড়েন না, কেননা বাইরের দিক থেকে বিষয়-বিমুক্ত বলেই তিনি অন্তরে আসক্তিবিহীন। বর্ণনায় রঙ নেই, শুধু আছে নিরভিমান রেখা। এইখানে দাঁড়ালেই আরো বোঝা যায় যৌনতা-অযৌনতা প্রভৃতি মানিকবাবু প্রসঙ্গে কত অবান্তর কথা। সমীচীন ভাবেই রথীনবাবু এগুলোর আর একবার প্রতিবাদ করেছেন।

বর্তমান সংকলনটি দেখে মনে হয় এঁরা মানিকবাবুর সারাজীবনের গ্রন্থাবলীর কতকগুলি কালানুক্রমিক সংকলন প্রকাশ করবেন। এটি তারই প্রথম ভাগ। এখানে উনিশশো চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত মানিকবাবুর সাহিত্যকর্মের পরিচয় প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। পুতুলনাচের ইতিকথা এর সঙ্গে যুক্ত থাকলে সবদিক থেকেই—বিশেষত সংকলনটির আত্মার দিক থেকে পূর্ণতা পাওয়া যেত। মানিকবাবুর শিল্পীজীবনের এই পর্যায় পাঠকের কাছে আগ্রহোদ্দীপক। তখনও শরৎচন্দ্রের কিছু জের মানিকবাবুর রচনায় রয়েছে—রথীনবাবু সেটার দিকে আমাদের দৃষ্টি ন্যায়ত আকর্ষণ করেছেন।

অথচ তখনই তাঁর নিজস্ব পথও তিনি খুঁজে পাচ্ছেন। নেকি ও শিপ্রার অপমৃত্যু গল্প দুটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। 'সর্পিল', 'মহাসঙ্গম', 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পগুলির কথাও এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য। সুখ, সততা, ঈশ্বর প্রভৃতি পুরনো কথাগুলো যখন মানুষের জীবনে শুধু স্মৃতিতে পর্যবসিত হতে চলেছে গল্পগুলিতে সেই জটিল সময়ের স্বাক্ষর স্পষ্ট। বাংলা কথাসাহিত্যে সর্বপ্রথম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই নিজ সাহিত্য সীমানা থেকে হিউমারকে বিসর্জন দিলেন—জটিলতা থেকে অধিকতর জটিলতায় অবতরণ যেখানে মূল সুর সেখানে এটাই স্বাভাবিক। সব সময়েই এই সূত্রে একটা কথা স্মরণীয় যে এ জটিলতা কদাপি বাইরের জোটপাকানো জটিলতা নয়।

সুতরাং এই নিরুপায় মানুষের চেহারা আঁকতে গিয়েই মানিকবাবু দারিদ্র্যকেও এঁকেছেন। মাটির সাকি বা আত্মহত্যার অধিকার গল্পদুটির কথা এক্ষেত্রে বলা যায়। এবং এইখানেই তিনি একটা সীমাবদ্ধতার দুর্ভোগ বহন করলেন। মানিকবাবুর পক্ষে এটা অবশ্যই স্বাভাবিক যে দারিদ্র্যকে তিনি উচ্ছ্বাসে আবেগে চিত্রল করে তুলবেন না। কিন্তু দারিদ্র্যের প্রাকৃত চেহারা আঁকতে গিয়ে মানুষকে দরিদ্র করে ফেললেই আপত্তি। বর্তমান সংকলনের গল্প সংগ্রহে সে ব্যাপার ঘটেনি। কিন্তু তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের কোনো কোনো গল্পে তা ঘটেছে। লক্ষণীয় যে মানিকবাবু দারিদ্র্যের চেহারা দুভাবে আঁকেন। পদ্মানদীর মাঝিতে দারিদ্র্যের চেহারায় জীবনের সংকীর্ণতা নেই, মাটির সাকি প্রমুখ গল্পে দারিদ্র্য জীবনকে সংকীর্ণ করেছে—এই কথাই লেখকের বক্তব্য। এই শেষোক্ত বক্তব্যকে বাস্তবতার সাধনা বলে কখনো কখনো মানিকবাবু মনে করেছেন। এটা বস্তুত পক্ষে ভেতরের দিক থেকে বাইরের দিকে আসা। মানিকবাবু উপলব্ধি করেছিলেন যে এই ভাবে ভেতরের দিক থেকে বাইরের দিকে আসা অনিবার্য। কিন্তু অন্তরময় মানুষের কথা আর বাইরের যন্ত্রণাময় মানুষের কথা একই দার্শনিক গ্রন্থিসূত্রে অন্বিত করা যাবে না। তাই মধ্যবর্তী পর্যায়ে মানিকবাবু নানা মুখে পথ খুঁজেছেন। এই পর্যায়ে মানিকবাবুর লেখায় ধীরে ধীরে কী ভাবে নিরুপায় মানুষ অপেক্ষা মানুষের বিশ্লেষক মূর্তি প্রাধান্য বিস্তার করেছে তা দেখানো চলে। তারই অন্তর্নিহিত ন্যায়ক্রমের পরিণতিতে মানিকবাবু মার্কসবাদীদের সাধনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

স্বভাবত এ পথ দীর্ঘ। এবং শুধু দীর্ঘ নয়, জটিলও বটে। শ্রদ্ধার সঙ্গে সদাই এই দীর্ঘ পাদ পরিক্রমা স্মরণীয়। মানিকবাবু মার্কসবাদী হতে

চেয়েছিলেন বলেই এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়, এর মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা হল মানিকবাবুর বারে বারে নিজেকে অতিক্রমের প্রয়াস। কোনো সমালোচকই তাঁর মার্কসবাদের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে মানিকবাবুর এই শেষতম পর্যায় নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন না, করা সমীচীন নয় ; ঠিক তেমনি মানিকবাবুর মধ্যবর্তী পর্যায়ের দুখানা কি একখানা বই নিয়ে আলোচনা করে মানিকবাবুর লেখায় যৌনতা আবিষ্কার করে চমকিত হওয়া উচিৎ নয়। একজন শিল্পীর সমগ্র জীবনের অন্বেষার তাৎপর্য-বিচার সমগ্রের সঙ্গে মিলিয়েই করা দরকার। মানিকবাবু সেক্ষেত্রে ফাঁকি দেননি। ভাল ভদ্র অশ্লীল গল্পের বাজার-দর আছে। ফাঁকিবাজ সাহিত্যিক সেই বাজারের ফরমাসে সে গল্প লেখেন, জীবনের জটিলতায় লেখক-নায়ক সেকথা আমাদের জানিয়েছে। এই ফাঁকিতেই ছিল মানিকবাবুর প্রচণ্ড আপত্তি। প্রকৃতপক্ষে সরলীকরণের লোভ যে-লেখকটির একেবারেই ছিল না, তাকে বিচার করার সময় আমরা যেন সরলীকরণের সুবিধাভোগী না হতে যাই। তার আগে একবার অন্তত যেন মানিকবাবুর নায়ক-পর্যায়ের দিকে তাকাই। তাহলে দেখতে পাব—প্রথম পর্যায়ের নিরুপায়ত্বের সঙ্গে সংগ্রামে পরাভূত নায়ক, দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশ্লেষক নায়ক, তৃতীয় পর্যায়ে সমগ্রতাসন্ধানী নায়ক হতে চেয়েছে। সত্য-সন্ধ লেখক মাত্রেই এ কথা বোঝেন যে জীবন শিল্পের থেকে বড় বলেই শিল্প কখনো জীবনের কোলছাড়া হতে পারে না। শিল্পকে খুঁজে ফেরেন তিনি, জীবনকে খুঁজতে খুঁজতেই। শিল্পে সাময়িক সিদ্ধি তাই, তাঁর কোনো পিছুটান রচনা করতে পারে না। বর্তমান সংকলনে, যে-লেখক 'দিবারাত্রির কাব্য' লিখেছেন, তিনিই শিপ্রার অপমৃত্যু লিখেছেন। ব্যর্থতম গল্প 'বৃহত্তর ও মহত্তর' লিখতেও তাঁর বাধে না। কারণ তিনি জানেন মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করার প্রয়াসের পথে নিজেরই ব্যতিক্রম রচনা করে। আর সেই শিল্পীর জন্যই করুণা হয় যিনি শিল্পী হবার বাসনার পায়ে দাসখৎ লিখে দেন সহজে। তাঁরা সিদ্ধির পাদপীঠে ছাড়া—সেটাও আবার বাজার-সিদ্ধি—সত্যকে খুঁজতে যান না। মজার কথা এঁরাই কেউ কেউ নিঃশেষিত মানিকবাবুর জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করে থাকেন। তবে আমরা জানি তাঁরা অনেকেই আজ আছেন কাল থাকবেন না—কিন্তু তাঁদের অনেক পরেও বাংলাদেশের নতুন নতুন লেখকদের প্রভাবিত করে চলবেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—শিরোপাবিহীন লেখক।

যুগান্তর চক্রবর্তী

উপন্যাস : ভাষা ও চিন্তা

সাহিত্যের প্রয়োজনে বড় দীর্ঘকাল মানুষ ভাষা ব্যবহার করেছে —এ কথা উপলব্ধি করার সময় দেশকাল নিরপেক্ষ প্রত্যেক আন্তরিক লেখকের ক্ষেত্রেই কখনো-কখনো উপস্থিত হয়। ভাষার সহিত জড়িত এই ভাবনায় লেখক অনুভব করেন, এত দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহৃত মানুষের ভাষা যেন বা জাগতিক নশ্বরতাকে অমরতাদানে আর সক্ষম নয়। মনে হয়, পরিচিত ভাষার ব্যবহারে অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার ক্লান্ত ধারাবিবরণী যেন এক নিরর্থক বিড়ম্বনা। এবং কোনো কোনো লেখকের ক্ষেত্রে ভাষার সহিত জড়িত এই সমস্যা ও প্রশ্ন এমন চরম, নির্বিকল্প মূল্য পায় যে, উক্ত লেখকের সাহিত্যচর্চা এই সমস্যার সমাধান ও প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের ইতিহাস মাত্র বলা চলে।

সমস্যাটা অবশ্য মুখ্যত গদ্যসাহিত্য বা উপন্যাসের নয়, এ-সমস্যা একান্ত ভাবেই কবিতার নিজস্ব সমস্যা। কারণ, কবিতা কবি ও প্রত্যক্ষ বিশ্বের অন্তর্গত নশ্বরতার সেই অমর যাতায়াত, শব্দাশ্রয়ী ভাষা যার একমাত্র পার্থিব অভিজ্ঞান। কবিতার ইতিহাসে তাই এমন সময় আসে যখন ইতিপূর্বে বহুবার উচ্চারিত ভাষায় বস্তুর নাম অবধি উচ্চারণে কবি পরাঙ্মুখ হন, যেহেতু এ পরিণামী উচ্চারণে বস্তুর রূপ ঝরে, বস্তুর শুদ্ধতা নষ্ট হয়। অপরপক্ষে, উপন্যাস সাহিত্য যেহেতু স্থান ও কালে স্থাপিত মানুষের জগন্ময় বাস্তবতার বিন্যাস, সেহেতু উপন্যাসের বহুবিস্তারী আয়তনে সকল বস্তুর নাম ও পরিণাম, রূপ ও রূপহীনতা, শুদ্ধতা ও শুদ্ধতার বিনাশ পরস্পর ক্রিয়াশীল ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনের সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ সমগ্রতার সন্ধান করে, যার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় উপন্যাসের ভাষা তাৎপর্যময় কথিত উক্তির নিকটবর্তী। কিন্তু জীবন যেহেতু জীবনাতীতের সোপান, মহৎ উপন্যাসমাত্রই তাই কবিতার লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত

অন্তর্জলী যাত্রা। কমলকৃষ্ণ মজুমদার। কথাশিল্প প্রকাশ, সাড়ে পাঁচ টাকা।
রক্তের হাওয়া। অসীম রায়। কথাশিল্প প্রকাশ, পাঁচ টাকা।

হয়, শুধু আধুনিক কালেই নয়, উপন্যাসের জন্মকাল থেকেই হয়েছে। এবং আপন কালে প্রচলিত কথিত ভাষার উপরোক্ত তাৎপর্যদানের প্রশ্নে ভাষাচিন্তা উপন্যাসের চিন্তাও বটে।

ইদানীন্তন বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্য-চর্চায় উপন্যাসের এই ভাষাচিন্তাই কি এক অভিনব, সর্বাত্মক রূপ ধারণ করে? কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্য, বিশেষত 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাস পাঠের পর এ-প্রশ্ন স্বতঃই পাঠকের মনে দেখা দেয়। কমলকুমার মজুমদার যদিও বর্তমান বাংলাদেশের শুধুমাত্র সাহিত্যিক-পাঠকগণের মধ্যেও সমধিক পরিচিত নন, তথাপি তিনি বেশ কিছুকাল যাবৎ সাহিত্যচর্চায় রত, যদিও 'অন্তর্জলী যাত্রা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এবং কমলকুমার মজুমদারের অন্যান্য রচনার ন্যায় 'অন্তর্জলী যাত্রা'ও সেই ভাষায় রচিত যা চলিত অর্থে সাধু ভাষা। কিন্তু এই শুদ্ধ ভাষা শুধুমাত্র ক্রিয়াপদের প্রচলিত সাধুত্বের উপর নির্ভর করে না। লেখকের চৈতন্যের প্রয়োগে এই শুদ্ধ ভাষা শুদ্ধতার সংজ্ঞা অবধি নতুন অর্থে নির্ণয়ের অপেক্ষা রাখে। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে উপন্যাসের প্রয়োজনে বাংলা গদ্যভাষার যে-প্রথম সৃষ্টিশীল স্ফূর্তি, আপন মনীষায় বাঙালী মানসের সামগ্রিকতা প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষার যে জীবনব্যাপী সাধনা, রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক লেখকগণের কখনো সার্থক-কখনো-অর্ধমনস্ক প্রয়াস ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্চর্য সিদ্ধি, এবং নিতান্ত সাম্প্রতিককালের চরিত্রহীন, নিরুদ্দেশ গদ্যচর্চার ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তন যেন কমলকুমার মজুমদারের নিকট নিরর্থক লাগে। তাই বাংলা গদ্যভাষার ধারাবাহিক বিবর্তনকে "অস্বীকার করে", শুদ্ধতার প্রয়োজনে, অদ্যাবধি ব্যবহৃত বাংলা গদ্যের সকল অনুষঙ্গের অতীত, ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গদ্যের শুদ্ধ উৎসে কমলকুমার মজুমদার আত্ম-মুক্তির পথ খোঁজেন। এবং প্রাচীনতার উৎস সন্ধানে, মনে হয়, কমলকুমার মজুমদার ইংরেজপূর্ব বাংলা গদ্যভাষার সুপ্রাচীন নিদর্শন অবধি অগ্রসর হন।

কমলকুমার মজুমদারের এই উৎস-সন্ধানের কিছু প্রেরণা হয়ত নিছক প্রাচীনতাপ্রীতি। অন্তত এ-ধারণা ঈষৎ প্রশ্রয় পায়। কারণ, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র প্রচ্ছদপট, গ্রন্থসজ্জা, লেখকের ভাষায় "টাইটেল পৃষ্ঠা ইত্যাদির অক্ষর আজ্ঞা", এমনকি ব্যক্তিনামের পূর্বে "বাবু" শব্দটির প্রয়োগে প্রাচীন বাংলা ঐতিহ্য যে-পরিমাণ সচেতন যত্নে অনুসৃত, তাতে মনে হয় লেখকের

ঐতিহ্যবোধ যেন নিতান্তই ঐতিহ্যের আক্ষরিক অনুবাদ। মনে হয়, ঐতিহ্যের অনুসরণে অন্তত এ-ক্ষেত্রে লেখক যেন বড় বেশি অভিমানী। কিন্তু এই অতিশয় অভিমানের পর, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র বক্তব্য ও বিষয়-ভাবনায়, চিন্তা ও দর্শনে, ইংরেজসৃষ্ট বাংলার দুশো বছরের ইতিহাসের অতীত যে-ঐতিহ্য স্বভাবময় রূপ পায়, বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে তা ইতিপূর্বে ধারণাতীত ছিল।

'অন্তর্জলী যাত্রা'র স্থান ও কাল রামমোহনকালীন বাংলাদেশ ; ঘটনাপট গঙ্গাতীরবর্তী শ্মশানভূমি ; নায়ক চাঁড়াল বৈজুনাথ, এ মহাশ্মশানে যে "রূপরস-গন্ধের সততা মানিয়া নির্ভীক।" এই উপন্যাসের কাহিনীর সূত্র "গঙ্গাতীরে অন্তর্জলী উদ্দেশ্যে আনীত সীতারাম চট্টোপাধ্যায়।" এবং কাহিনীর এই সূত্রে জ্যোতিষী অনন্তহরি ঘোষণা করেন, "চাঁদ যখন লাল তখন তার প্রাণ যাবে… যাবে কিন্তু একা যাবে না হে। দোসর নেবে…" তাই, এই শ্মশানভূমিতে যশোবতীর সম্প্রদান হয়, যে-যশোবতীর মনে "পুষ্পের অজ্ঞতা ব্যতীত কিছুই ছিল না।" এবং সম্প্রদানের পর বৃদ্ধ, মৃত্যুমুখী সীতারাম "পদাঘাত করিয়া অমানুষিক ঔদ্ধত্যের সহিত কহিলেন, 'বাঁচব'।" এ-উপন্যাসের বিষয় তাই অমরতা। এবং সত্যিই এই উপন্যাসে অমরতা সহজে উচ্চারিত হয়। তাই গ্রন্থের প্রথমাংশে কাহিনীর সূত্রে উপস্থিত জ্যোতিষী অনন্তহরি, কবিরাজ বিহারীনাথ, কুলপুরোহিত কৃষ্ণপ্রাণ, দুই ভাই বলরাম ও হরেরাম ইত্যাদি নশ্বর জগতের লৌকিক প্রতিনিধিগণের শেষাবধি আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। এই অমরতার জগতে একদিকে থাকে সীতারাম-যশোবতীর শ্মশান-বাসর। অন্যদিকে চাঁড়াল বৈজু, এই মহাশ্মশানে আমাদের ভীষণ সহজ বৈজু চাঁড়াল, প্রাকৃত বৈজুনাথ, যে "নীচ কুলোদ্ভব", যে "ঊর্দ্ধ আকাশে হাস্যধ্বনি ছড়াইয়া" দেয়, সে স্বভাবত শাস্ত্রবাক্য বলে, কারণ "ই যে মহাটোল বটেক।" ভূমিকায় লেখক নিজে বলেন, "এই গ্রন্থের ভাববিগ্রহ রামকৃষ্ণের, ইহার কাব্যবিগ্রহ রামপ্রসাদের।" বড় চমৎকার-ভাবে লেখক বলেন যে, এ-গল্প "ঈশ্বর দর্শন যাত্রার গল্প।" বর্তমান বাংলাদেশে এ-গল্প বলার সাহস একমাত্র কমলকুমার মজুমদারই রাখেন।

এই গল্পের প্রয়োজনেই কি কমলকুমার মজুমদার আলোচ্য গ্রন্থে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন? কিন্তু দেখা যায়, কমলকুমার মজুমদারের গল্পের বিষয় যখন আধুনিক কাল, তখনো, প্রখর ঐতিহ্যবোধ ও শুদ্ধতার প্রয়োজনে, বাংলা

গদ্যের শুদ্ধরূপ লেখকের অবলম্বন। কমলকুমার মজুমদারের সকল রচনায়, বিশেষত আলোচ্য গ্রন্থে, লেখকের ঐতিহ্যআশ্রিত ভাষা ও চিন্তাই তাই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। এবং এই ভাষার প্রসঙ্গেই প্রশ্ন দেখা দেয়, উপন্যাসের ভাষামুক্তির প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তন কি কিছুমাত্র সত্য নয়? কমলকুমার মজুমদারের নিকট এ-প্রশ্ন হয়তো ধৃষ্টতামাত্র হবে, কিন্তু জিজ্ঞাসা জাগে, সমাজজীবনের সকল কার্যকারণের ন্যায়, ভাষার বিবর্তনের ন্যায়, বাঙালীর ধর্মচিন্তা, বাঙালীর মাতৃসাধনার ইতিহাসও কি ঐতিহাসিক চেতনাময় এক অনিবার্য বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে না? "এই গ্রন্থের ভাববিগ্রহ রামকৃষ্ণের, ইহার কাব্যবিগ্রহ রামপ্রসাদের।" ইতিপূর্বে উদ্ধৃত এই উক্তিপ্রসঙ্গে লেখক ইঙ্গিত দেন, কিন্তু বলেন না, সমাজবিবর্তনের কোন্ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় রামপ্রসাদের মাতৃ-সম্বোধন কাব্যরূপ পায়, এবং উনিশ শতকের নবজাগৃতির পটভূমিকায় রামকৃষ্ণে তা একান্তভাবে লোকাশ্রয়ী। ইতিহাস হয়তো জীবনের একমাত্র নিয়ামক শক্তি নয়, কিন্তু সামাজিক কার্যকারণের ঐতিহাসিক চেতনা ছাড়া এই স্বরূপভেদ কি করেই বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব? সাধক রামপ্রসাদ, নিঃসঙ্গ কবি রামপ্রসাদের সঙ্গে মাতৃমূর্তির স্বতই কথা হয়, আমরা তা অন্তরাল থেকে শুনে থাকি। কিন্তু রামকৃষ্ণের কথামৃতের একমাত্র উপলক্ষ মানুষ, অজস্র মানুষ, কখনো অতিমানব, বাংলার জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের পুরোধা বিদ্যাসাগর, বঙ্গনাট্যের নায়ক গিরীশচন্দ্র এবং পরিশেষে আগামী বাংলার প্রাণশক্তির প্রতীক যুবক বিবেকানন্দ। এবং তারই মধ্যে মধ্যে সেই সব মানুষ, নিরাশ্রিত, নিরবলম্ব, ভাষাহীন, যারা নিজেরাই শুধু আপন প্রয়োজনে রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয় না, আপনকালের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে রামকৃষ্ণ যাদের নিকট যান। রামপ্রসাদের পর বাংলাসাহিত্যে শাক্তসঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা, রামকৃষ্ণের পর বাংলার সমাজজীবনে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রয়োজন হয়।

এ-প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় এই যে, সমাজবিবর্তনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ঐতিহাসিক প্রয়োজনের এই ভিন্নতা সত্ত্বেও, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের মাতৃসম্বোধনের ভাষা কিন্তু তাঁদের আপন-আপন কালের প্রাণশক্তিময় কথ্যভাষা। আপনকালের কথিত ভাষায় শুদ্ধতার জটিল সম্ভাবনা অনুসন্ধান না করে 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় উপন্যাসের ভাষাশক্তির কোন্ প্রয়োজন সাধিত হয়? উপন্যাসের লক্ষ্য বাস্তবতা, বাস্তবাতীতেরও স্থানকালশাসিত বাস্তবতা, ঐতিহ্য-

বোধেরও বাস্তব ঐতিহাসিক চেতনা। উপরন্তু, 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে বাঙালী মানসের যে-ঐতিহ্যআশ্রিত জগৎ কমলকুমার মজুমদার উপস্থিত করেন, তা এমনই অমর, এমনই সম্পূর্ণ, পূর্বাপর সম্পর্কহীন ও দূরান্বয়ী যে বর্তমান বাংলার জীবনসত্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধস্থাপন সহজ হয় না। অথচ বিশেষ স্থান ও কালের সহিত আপন কালের সম্বন্ধযুক্ত সত্যের ধারাবাহিক, অর্থময় ইতিবৃত্ত রচনাই উপন্যাসের কাজ। ফলে, বর্তমান বাংলার সমাজজীবনের বাস্তবতায়, এই নৈমিত্তিক কুরুক্ষেত্রে, যেখানে পরাজয়ের প্রশ্ন অবান্তর, কারণ পরাজয় পূর্বনির্ধারিত, সম্মুখসমরের অবকাশহীন এই প্রাত্যহিকতায় যেখানে আত্মার অবধারিত বিনাশ বিনাসমারোহে সমাপ্ত হয়, সেখানে কমলকুমার মজুমদার, উপন্যাসের পটক্ষেপে, চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত শুদ্ধ গদ্যের ব্যবহারে, কোন্ মূল্যবান উক্তিসমূহ উচ্চারণের আশা করেন?

এ-সকলই প্রশ্নমাত্র। 'অন্তর্জলী যাত্রা' গ্রন্থপাঠের পর, প্রশ্ন, অসংখ্য প্রশ্ন মনে জাগে। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র ন্যায় গ্রন্থের আলোচনায় এ-জাতীয় কিছু-কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা ছাড়া আলোচকের পক্ষে কোন্ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তেই বা উপনীত হওয়া সম্ভব! এবং এই সকল প্রশ্ন ঘোরতর হয় যখন দেখা যায় যে, নিদারুণ প্রশ্নের পরও, ভাষা ও ভাবনার অব্যর্থ ঐক্যে, অভিপ্রেত তাৎপর্যে কমলকুমার মজুমদারের আশ্চর্য সিদ্ধি না-মেনে উপায় থাকে না; যখন দেখা যায় যে, শব্দের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কদাচ ইন্দ্রিয়ের আসক্তিমাত্র নয়, "গীতায়" উক্ত ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়সকল আহুতি দিয়ে কমলকুমার মজুমদার আত্মার পরমতাকে স্পর্শ করেন। তাই এই সকল প্রশ্নের কিছুমাত্র উত্তর হিসেবে বর্তমান আলোচকের মনে হয় যে, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র ভাষা ও বিষয়-ভাবনায় কমলকুমার মজুমদার যে-সমস্যা উপস্থিত করেন সে-সমস্যা উপন্যাসের নয়, কবিতার। উপন্যাস যে-সত্যের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত, কবিতা সেই ইতিবৃত্তের পরম পরিণাম। তাই, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র কালচিত্রন ও প্রতিবেশ রচনায় কমলকুমার মজুমদারের ঔপন্যাসিক ক্ষমতা যদিও বর্তমান বাংলাসাহিত্যে অভূতপূর্ব, তথাপি 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় এই চিত্ররচনার কাজ লেখক যেন কবির মতোই করেন। এই উপন্যাসে তাই বিশেষ কিছুই ঘটে না। যা হয়ে ওঠে আখ্যানের আকারে তা উপস্থিত করা অসম্ভব। লেখক নিজেই গ্রন্থের একস্থানে বলেন, "এ কোন ঘোর বাস্তবতা! এই কি পৃথিবী! তথাপি এ হেন দৃশ্যে গোলাপ ছিল, এ হেন দৃশ্যের স্বাদ ছিল।" কমলকুমার মজুমদার

প্রকৃতই কবি। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র সর্বত্র কবিতার শুদ্ধ কাজ। উপন্যাসের যতটুকু কবিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কবিতার যতটুকু উপন্যাসের আয়ত্তাধীন, ততটুকু কবিতা নয়, 'অন্তর্জলী যাত্রা' এক অমোঘ কাব্যের মর্মস্থলে স্থাপিত। এই উক্তির সমর্থনে উদ্‌ধৃতি দেওয়া অসম্ভব। কারণ, সকল অমোঘ কাব্যের ন্যায় 'অন্তর্জলী যাত্রা'ও প্রায় সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃতির অপেক্ষা রাখে।

'অন্তর্জলী যাত্রা' পাঠে তাই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উপন্যাসপাঠকগণ কিছুমাত্র উপকৃত হবেন, এমন আশা কম। উপন্যাস লেখকগণও যে কিছুমাত্র উপকৃত হবেন, এমন আশা আরো কম। কারণ, এ-হাস্যকর অবস্থা বর্তমান বাংলাদেশেই দেখা দেয় যে, উপন্যাস লেখকের মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে পাঠকের মানসিকতার স্তরেই আবদ্ধ। উপকৃত হতে পারেন একমাত্র কবিরা, অবশ্য সাহিত্যের উপকারিতায় বর্তমান বাংলার তুখোড় যুবক, বুদ্বুদবিলাসী ও স্বতঃস্ফূর্ত কবিগণের যদি কিছুমাত্র আস্থা থাকে।

এই সব কথার পরও অবশ্য কথা থাকে। কথা এই যে, 'অন্তর্জলী যাত্রা'র স্বরূপ ও সিদ্ধি নিয়ে মতামত যাই হোক না কেন, ভাষাচিন্তা ও ঐতিহ্যবোধের যে মৌলিক প্রশ্ন কমলকুমার মজুমদার উত্থাপন করেন, বর্তমান বাংলাসাহিত্যে তা দিগ্‌নির্দেশকারী। এ-কথা যথার্থই মনে হয় যে, বর্তমান বাংলাদেশের প্রচলিত কথ্য ও সাহিত্য ভাষা সর্বপ্রকার মহৎ বিষয় ও ভাবনা ধারণে অক্ষম। এবং কথিত ভাষা ও ভাষা-ঐতিহ্যের সমন্বয়ে উপন্যাসের ভাষাচিন্তার প্রয়োজনীয় সমাধান যদিও 'অন্তর্জলী যাত্রা'য় অসম্পূর্ণ থাকে, তথাপি কমলকুমার মজুমদার-নির্দেশিত ভাষা-ঐতিহ্যের উৎসেই হয়তো বাংলা গদ্যভাষার মুক্তি নিহিত আছে। দ্বিতীয়ত, বর্তমান কালের রূপহীন, ধর্মহীন, পরিপ্রেক্ষিতহীন বাঙালী মানসের ভবিষ্যৎ যদিও ঐতিহাসিক কার্যকারণ ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল, তথাপি শুদ্ধ ঐতিহ্যবোধের কেন্দ্রে বাঙালীমানসের প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন প্রচেষ্টায় কমলকুমার মজুমদার বর্তমান বাংলাসাহিত্যে নিঃসন্দেহেই পথিকৃৎ।

শ্রীযুক্ত অসীম রায়ও গদ্যভাষার সচেতন লেখক। এবং অসীম রায়ের সাম্প্রতিক উপন্যাস 'রক্তের হাওয়া'র নায়ক নিজেও যেহেতু লেখক, সেহেতু এ-উপন্যাসে নায়কের ভাবনায় লেখকের ভাষাভাবনা স্বভাবতই আসে। কিন্তু ভাষাচিন্তা অসীম রায়ের নিকট কখনোই চূড়ান্ত মূল পায় না, অভিজ্ঞতার

প্রকাশে অসীম রায় শুধু সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের ম্রিয়মান বাচালতায় একপ্রকার চারিত্র্য দান করেন। আধুনিক বাঙালীর জীবন ও বুদ্ধিচর্চায় অসীম রায়ের গদ্যভাষায় কিছু-কিছু বাক্যালাপ সম্ভব।

কমলকুমার মজুমদার ও অসীম রায়ের কোনো তুলনামূলক বিচার এ-আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। তুলনা অবান্তর। কারণ, বর্তমান বাংলাসাহিত্যে কমলকুমার যা অর্জন করেন, শুধু অসীম রায় কেন, সকল জীবিত লেখকের মিলিত প্রয়াসেও তা আয়ত্তাতীত। তবে কমলকুমার মজুমদারের ন্যায় অসীম রায়ও সাম্প্রতিক উপন্যাস-সাহিত্যে প্রায়-অপরিচিত লেখক, যদিও তিনি ইতিপূর্বে আরো তিনখানি উপন্যাস রচনা করেছেন। যে-কালে উপন্যাসের বিষয়বিচারে বাংলাদেশের উপন্যাস লেখক নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনীয় এবং বিষয়নিরপেক্ষ ভাবনায় যে-কালে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকগণ শিল্পীর স্বাধীনতায় নিরতিশয় কাতর, অথচ দ্ব্যর্থক মিলনের প্রেরণায় (দুটিরে মিলানো নিয়ে খেলা) যে-কালে বাংলা উপন্যাস শুভদৃষ্টির কোনো শুভক্ষণে যথারীতি প্রকাশিত হয় এবং মলাটে সিলোফেন-গুণ্ঠিত নারীমুখ শিল্পের পারমার্থিক মায়া জাগায়, সে-কালে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অসীম রায় বেশ কিছু-পরিমাণে চরিত্রবান, বেশ কিছুপরিমাণে ভাবগম্ভীর। এবং এইসব স্বাতন্ত্র্যলক্ষণে অসীম রায় যে চিহ্নিত সে-বিষয়ে তিনি বেশ কিছুপরিমাণ আত্মসচেতনও বটে। কিন্তু বড় বেশি সচেতন। অসীম রায় তাঁর উপন্যাসে বড় বেশি পরিমাণে উপস্থিত।

'রক্তের হাওয়া' উপন্যাসের বিষয়, লেখক ও তার জীবন, লেখকের অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার শিল্পরূপায়ণ। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে যে-জীবন লেখক যাপন করেন, শুধুমাত্র ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সে-জীবনে তার কি কোনো দাবি থাকে? নাকি শিল্পের উপজীব্য হিসেবেই সে-জীবন একমাত্র মূল্যবান? অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতায় গমনের প্রয়োজনে লেখকের ব্যক্তিসম্পর্কে যে সংঘাত ও বিরোধ দেখা দেয় সামাজিক আনুগত্যের প্রথাগত নীতিবোধে কি তার বিচার চলে, নাকি শিল্পের সত্য সে-বিচারের একমাত্র মানদণ্ড? এ-জাতীয় কিছু চিন্তা, শিল্প ও জীবন সম্পর্কে আরো নানাবিধ চিন্তা অসীম রায় তাঁর 'রক্তের হাওয়া' উপন্যাসে উত্থাপন করেন। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এ-জাতীয় গুরুতর চিন্তা যখন কোনো লেখক উত্থাপন করেন তখন সত্যিই আশা হয়।

'রক্তের হাওয়া'র নায়ক অমর, "কোনো আলোড়নহীন সার্বজনীন নামের আড়ালে" প্রথম যৌবন কাটিয়ে, "জীবনের গোড়া বেঁধে", তিরিশ বছর বয়সে "কৌলিন্য" অর্জন করার পর তার প্রথম উপন্যাস লেখে। এই উপন্যাসের নায়ক অমর নিজেই এবং কাহিনী অমরের জীবন, তার প্রেম। অমর নিজেই বলে, এই বইয়ে "সে নিজে কাহিনী হয়েছে।" বলে, "এ বই লেখকেরই এক অবিচ্ছিন্ন ডায়েরী", "ডায়েরীর মতো নগ্নভাবে প্রায় শিল্পকে বিপন্ন করে তার নিজেকে মেলে দেওয়ার চেষ্টা···।" অমরের এই "চেষ্টা অনেকেই নিতে পারে নি", তার বই আত্মীয়স্বজনের মধ্যে "আলোড়ন" তোলে, তার মা "মর্মান্তিকভাবে অভিভূত" হন, অমরের বন্ধু সন্তোষের মতে "বইটা anti-social।" তার কারণ, অমরের জীবন ও উপন্যাসের উপজীব্য যে-প্রেম, সে-প্রেম প্রচলিত নীতিবিচারে অসামাজিক, কারণ, নায়িকা রমা বিধবা, তার সন্তান বর্তমান, এবং অমর ও রমার প্রেম পরিণতিহীন। অমরের মতে, "রমার সঙ্গে তার বিচিত্র বিরতিহীন সম্পর্ক তার যৌবনের একাগ্র সিম্বল।" কিন্তু অমর শুধু নায়ক নয়, লেখক। তাই অমরের প্রেমের অভিজ্ঞতা তাকে যে "সৌর জগতে" স্থাপন করে, সেই "সৌর জগতে" ঘাতকের মতো প্রবেশ করে তার বই। এই বইয়ের ভিতর নিজেকে নিঃশেষে প্রকাশ করে অমর একদিকে তার "সৌর জগতের" নায়িকার "সর্বনাশ সে ডেকে আনে।" অন্যদিকে, তার অভিজ্ঞতা তার কাছে মূল্যহীন হয়ে যায়। সে অনুভব করে, "তার বিষয়বস্তুর কাছ থেকে সে বিদায় নিচ্ছে, তার নিজের মুখাগ্নি করছে নিজেই।" "বই লেখার পর থেকে মনে হচ্ছে তার আর জীবনে কোনো লালসা নেই।" (জীবনে কোনো "লালসা" নেই? "লালসা"? ভাষা-সচেতন লেখক অসীম রায় এ-উপন্যাসে ভাষার এ-জাতীয় বীভৎস ব্যবহার আরো কিছু-কিছু করেন।) কিন্তু "অমর চায় না এ ক্যাথারসিস। আর চায় না বলেই সে চায় তার রক্তের হাওয়া পালটাতে।"

আর অমর তা চায় বলেই, "আবার এক অনিশ্চিত জগতে নিজেকে ছুঁড়ে" দিয়ে "নূতন বিষয়বস্তু" হবার প্রয়োজনে, সন্তোষের আত্মীয়া সুমিতার সঙ্গে অমরের স্বতঃপ্রবৃত্ত পরিচয়, অমরের প্রাথমিক উদাসীনতার পর, অমরকে শেষাবধি এক সদর্থক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। অবশ্য 'রক্তের হাওয়া' যদিও গতানুগতিকতামুক্ত চিন্তাপ্রধান উপন্যাস, তথাপি অমরের সহিত সুমিতার আলাপ কিন্তু সাধারণ বাংলা গল্পে সম্ভবপর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী

ছবির একজিবিশনেই হয়। এবং স্থমিতার আহ্বানে পরবর্তী কোনো সাক্ষাতের শেষে অমর যে-কোনো বুদ্ধিমান প্রেমিকের সচেতন বুদ্ধিহীনতা নিয়েই স্থমিতাকে বলে, "নিজেকে বাঁচাতে হলে দ্বিতীয়বার ভালবাসতে হয়।" এবং অমর, যে শুধু নায়ক নয়, লেখকও বটে, সেই অমর যে-কোনো কলা-কৌশলময় প্রেমিকের নির্লিপ্তি নিয়ে বড় গম্ভীরভাবে বলে, "চেষ্টা করলে ভালবাসা আসে।" যেন এতেও কিছু স্পষ্ট হয় না, যেন এর পরও কিছু বাকি থাকে, তাই অমরের স্রষ্টিকর্তা অসীম রায় স্থমিতাকে দিয়ে হাসিমুখে বলান, "আপনি যেন নিজেকেই বললেন কথাটা।" এবং, আশ্চর্য, অমর বলে, "হাঁ, নিজেকেই বললাম।"

অবশ্য অমরের রক্তের হাওয়া এত সহজেই বদলায় না। অনেক, আত্ম-চিন্তা, অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব, শিল্প-জিজ্ঞাসা, তার ব্যক্তিচরিত্র ও শিল্পীসত্তার সমর্থনে মহাভারতের অর্জুন-স্থভদ্রা-দ্রৌপদী প্রসঙ্গ ("আর্টিস্টের কাহিনী মানেই কৌন্তেয়র কাহিনী, তাঁর রক্তের হাওয়া বদলাবার কাহিনী, তাঁর স্বজনহত্যার কাহিনী।") ইত্যাদির মধ্য দিয়ে, স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের মানসে, তার রক্তের হাওয়াবদলের কাহিনী এগোয়। কাহিনীর প্রয়োজনে আরো কিছু চরিত্র আসে, কিন্তু তারা সকলেই অল্প-বিস্তর অমরের মুখ চেয়ে আসে। এমনকি অমরের উড়িষ্যাদেশীয় গৃহভৃত্য আনন্দ, এই পরিশীলিত, বুদ্ধিমান, উড়িষ্যাদেশীয় গৃহভৃত্য একমাত্র অমরের গৃহেই সম্ভব। এই উপন্যাসের এক অধ্যায়ে অমরের বই সম্পর্কে আনন্দের উক্তি, রমা ও অমরের অসামাজিক প্রেম নিয়ে আনন্দের দীর্ঘ আলোচনা, আনন্দের আক্রমণ ও অমরের আত্মরক্ষা, 'রক্তের হাওয়া'র ন্যায় চিন্তাপ্রধান ভাবগম্ভীর উপন্যাসের একমাত্র কমিক রিলিফ।

কিন্তু এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে এই গল্পে শেষ পর্যন্ত কি হয়? অমরের আত্মচিন্তা, অমরের শিল্পজিজ্ঞাসা, জীবনের সঙ্গে অমরের সম্পর্ক ও সংঘাত, নায়ক ও লেখক অমরের রক্তাক্ত অস্তিত্বের কোন বিশ্বাসযোগ্য শরীর দাঁড় করায় যা আমাদের জীবন ও শিল্পভাবনায় আলোকপাতকারী? সামাজিক মানুষ হিসেবে অমর জীবনে প্রতিষ্ঠিত, ব্যাঙ্কের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, এবং অমরের মনে হয়, ব্যাঙ্কের এই "তীর্থক্ষেত্রই তার নিজস্ব তীর্থক্ষেত্র।"

লেখক হিসেবে অমর সকল কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত লেখকের এক সংহত পরাক্রান্ত চরিত্রধর্মে বিশ্বাসী ; "ক্ষ্যাপা বাউল উদাসী", "দরদী মরমী উদাসীন" শিল্পী তার চিন্তায় স্থান পায় না ; তাই "জমিদার ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে

সে শ্রদ্ধা করে।" অথচ, একমাত্র প্রেমের পরিধি ছাড়া, অমরের চিন্তায় ও কর্মে, লেখক ও মানুষ হিসেবে সেই সামগ্রিক পরাক্রম অর্জনের সামান্যতম প্রয়াসও অনুপস্থিত যা তার এবম্বিধ মূল্যবান ধারণার কিছুমাত্র সমর্থন করে। সহধর্মী বস্তুসত্যের অভাবে, বাস্তবতার অনুপাতনিরপেক্ষ এই উচ্চাভিলাষী চিন্তাও তো একপ্রকার বিলাস। অথচ, চিন্তায় ও কর্মে অসঙ্গত অমরকে উপহাস করা অসীম রায়ের উদ্দেশ্য নয় ; খণ্ডিত, বিভক্ত অমরের রক্তক্ষয়ের মধ্যে আধুনিক মানুষ ও লেখকের স্পর্শযোগ্য জটিলতাকে উপস্থিত করা এই উপন্যাসের বিষয় নয় ; প্রেমিকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে অমর এই উপন্যাসে আগাগোড়া এক স্পষ্ট, সদর্থক চরিত্র হিসেবেই চিত্রিত। উপরন্তু, শিল্পী সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা সত্ত্বেও ডায়েরীর মতো একান্ত ব্যক্তিগত এমন বই অমর লেখেই বা কেন যা তার শিল্পকে অবধি বিপন্ন করে? যে-বই পড়ে অমরের ব্যক্তিগত প্রেমের কাহিনী তার পরিচিত মহলে জানাজানি হয়ে যায়, যে-বইয়ের জের টেনে রমার বান্ধবীরা অনায়াসে রমাকে তার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ঠাট্টা করে, উপন্যাস হিসেবে তেমন বই লেখার সার্থকতাই বা কি? অথচ অমরের বই উপন্যাস হিসেবে ব্যর্থ, এমন ইঙ্গিত লেখক অসীম রায় কখনোই করেন না।

অবশ্য অমর ভাবে, ঠিক শিল্পের জন্য এ বই সে লেখে না, "শিল্পের জন্য তার লোভ নেই।" তবে কিসের জন্য লেখে? অমর রমাকে বলে, "সত্যকে খুঁজতে হয়েছিল" বলেই এ বই তাকে লিখতে হয়েছে। কিন্তু কি এই "সত্য"? অমর জীবনের সত্য ও শিল্পের সত্যের কথা চিন্তা করে, লেখার জীবন যাপন করার কথা ভাবে। কিন্তু একমাত্র প্রেমপাত্রীর পরিবর্তন করা ছাড়া অমরের "সত্যের" আর কোন্ চেহারা ফোটে? অমরের আত্মচিন্তায় প্রেমিকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে, প্রেমিকের অনুতাপ, আত্মগ্লানি, বিবেকপীড়া আছে, কিন্তু অপ্রেমের দুঃখ নেই। অমর প্রেমিকার চিন্তা করে, কিন্তু ভালোবাসায় তার শরীর, তার অস্তিত্ব কদাচ দুঃখময় হয় না। তাই অমর স্থমিতাকে বলে, "চেষ্টা করলে ভালবাসা আসে", আশ্চর্য সতর্কতায় স্থমিতার দিকে অগ্রসর হবার কথা ভাবে। তাই রমাকে বিবাহ করার চিন্তা তার কাছে অবাস্তব, যেহেতু রমাকে বিবাহ করার অর্থ অমরের বকুলবাগান রোডের বাড়ি ত্যাগ করা, আর এই ত্যাগের অর্থ তার অতীত ও বর্তমানের ধারাবাহিকতা, তার প্রাক্তন বন্ধনকে অস্বীকার করা, "জীবনের সত্তা থেকে তার শিল্পীর সত্তাকে" ছিন্ন করা, যার

ফলে "তার শিল্পের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।" তবে অমর শিল্পের প্রয়োজনে তার জীবন থেকে রমার প্রেমের বর্তমানকে অতীত করে দেয় কেন, তার জীবনের ধারাবাহিকতা থেকে প্রেমের অভিজ্ঞতাকে পৃথক করে কেন? এ-প্রসঙ্গে মহাভারতের রূপক কোনো কাজে লাগে না, লেখকের প্রয়োজনের প্রশ্ন আরোপিত হওয়ায় অর্জুন-দ্রৌপদীর প্রেমের অভিজ্ঞতার বিয়োগান্তক মানবিক সত্য শুধু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। প্রাক্তন বন্ধনে "আটকে থাকা মানে আত্মিক মৃত্যু", তবে অমর তার ব্যাঙ্কের "তীর্থক্ষেত্রে", তার বকুলবাগান রোডের বাড়ির নিরাপত্তায় আটকে যায় কেন? নাকি অমরের অস্তিত্বের শিকড় যতোটা বকুলবাগান রোডের বাড়ির গভীরে প্রোথিত ততোটা রমার প্রেমে কখনোই ছিল না? বকুলবাগান রোডের বাড়ি তার জীবনের সম্পূর্ণ পটভূমি, আর রমার প্রেম তার অভিজ্ঞতার আংশিক অগভীর সত্যমাত্র? লেখক হওয়ার নামে তাই অমর নিতান্তই "বকুলবাগান রোডের বাড়ির ছেলে" হয়ে যায়, নিতান্তই নায়ক হয়ে যায়। এবং নায়ক অমর লেখক হওয়ার নামে অতিশয় হিসাবী, আত্মসর্বস্ব, ভঙ্গিমাময় প্রেমিক।

অমরের রক্তের হাওয়া বদলের কাহিনী তাই নিতান্তই তার চিন্তা থেকে চিন্তাবদলের নীরক্ত কাহিনীমাত্র, রমার প্রেমের ক্লান্তি থেকে স্বমিতাকে "ভালবাসার চেষ্টার" কাহিনী, এক নারী থেকে অন্য নারীতে গমনের কাহিনী। এক নারী থেকে অন্য নারীতে গমন অবশ্য আমরাও মাঝে-মাঝে করে থাকি। কিন্তু পার্থক্য এই যে, অমর তা শিল্পীর সত্যসন্ধানের প্রেরণায় অভিজ্ঞতার প্রয়োজনবোধে করে। কিন্তু প্রেমের অভিজ্ঞতাই কি লেখকের অভিজ্ঞতার সারাৎসার? শৈশব থেকে বড় হওয়া অবধি, পরিণতির প্রত্যেক স্তরে, চেতনায় ও অবচেতনায়, প্রত্যক্ষ বিশ্বের সহযোগে, জীবনের বহুধাবিরোধী আন্দোলন ও অন্তঃস্রোতে যে-অভিজ্ঞতা লেখক নিঃশব্দে সঞ্চয় করে, অমরের জীবনে তার ইতিহাস কোথায়? উপরন্তু, লেখকের জীবনে অভিজ্ঞতার অর্থ কি এই যে, একটিমাত্র বই লিখেই অভিজ্ঞতা তার নিকট অর্থহীন হয়ে যায়! রমার প্রেমের অভিজ্ঞতার ন্যায় বকুলবাগান রোডের বাড়ি নিয়ে অমর যদি বই লিখত তবে কি অনুরূপভাবে বকুলবাগান রোডের বাড়ির সত্যও তার নিকট মিথ্যে হয়ে যেত? এবং একটি প্রেমের অভিজ্ঞতা যদি একটিমাত্র বই লিখতেই নিঃশেষ হয়ে যায়, পুনরায় লেখার অভিজ্ঞতার জন্য যদি পুনর্বার প্রেমের প্রয়োজন হয়, তবে বেশকিছু সংখ্যক বই লিখতে হলে লেখকের পক্ষে কতবার

ভিন্ন নারীতে গমনের প্রয়োজন হবে? ইত্যাকার প্রসঙ্গে অবশ্য অসীম রায় কিছু বলেন না।

এবং এইসব প্রশ্নের সদুত্তরের অভাবে, উত্তরের সন্ধানে, লেখক অসীম রায় ও তাঁর উপন্যাস 'রক্তের হাওয়া', 'রক্তের হাওয়া'র নায়ক অমর ও লেখক অমর, লেখক অসীম রায়ের চিন্তা ও লেখক অমরের চিন্তা, অমরের উপন্যাস ও তার নায়ক অমর নিজে, এবং 'রক্তের হাওয়া'র নায়িকা রমা, নায়ক অমরের প্রেমিকা রমা, অমরের উপন্যাসের নায়িকা রমা, ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে এমন একাকার জটিলতার সৃষ্টি হয় যে, মনে হয় এই সমস্ত জটিলতার জন্য অসীম রায়ের 'রক্তের হাওয়া'ই নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত দায়ী। তাই উপন্যাসের একেবারে শেষ অধ্যায়ে, রমার কাছে বিদায় নেবার অন্তিম কৈফিয়ৎ হিসেবে, "তাছাড়া তোমার সঙ্গে সম্পর্ক তো কোনোদিনই কাটাতে পারব না," অমরের এই বিদায়বাণীতে বিরক্ত রমা যখন তার এতদিনের সংযম নষ্ট করে প্রতারিতা নায়িকার প্রথম চিৎকার হানে, "ওসব কথাগুলো তোমার আগামী বইয়ের জন্য তুলে রাখো" তখন পাঠক হিসেবে আমাদের পক্ষেও অসীম রায়ের আগামী উপন্যাসের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো চিন্তা থাকে না।

অসীম রায়ের 'রক্তের হাওয়া' সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস সমস্যার একটি ভিন্নতর দিক উপস্থিত করে। প্রচলিত বাংলা উপন্যাস বয়স্কপাঠ্য রূপকথা হিসেবেও অচল, অথচ দ্রুতনিঃশেষিত সংস্করণে কিছুকাল দুর্মর, এবং আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু মনে হয়, অসীম রায়ের ন্যায় চিন্তাশীল, স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত লেখকগণের উপন্যাস সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের দুর্বলতার বিকল্প হিসেবে যতোটা উল্লেখযোগ্য, যথার্থ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের ধারণা প্রকাশে ততোটা মূল্যবান নয়। অভিজ্ঞতা ও শিল্পবোধের সমন্বয় তাঁদের চেতনায় অনেক ক্ষেত্রেই কোনো পরিপূর্ণ চিন্তাবৃত্ত গ্রহণের অবকাশ পায় না; পূর্ব-নির্দিষ্ট কিছু চিন্তার আশ্রয়ে একটি বক্তব্য প্রকাশের অত্যধিক আগ্রহ তাঁদের ঔপন্যাসিক সিদ্ধির বাধা হয়ে দাঁড়ায়; অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় বিনয়ের অভাব থাকে; সহধর্মী বস্তুসত্যের অভাবে চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারহীন, নিরবলম্ব। একথা ঠিক যে, নিতান্ত কোনো গল্প নয়, চিন্তা ও বক্তব্যপ্রাধান্যই আধুনিক উপন্যাসের অমোঘ লক্ষণ, কিন্তু একথাও ঠিক যে, আধুনিক উপন্যাস শেষ পর্যন্ত উপন্যাসই হবে। এবং এ কারণেই আধুনিক উপন্যাসের রূপ এমন জটিল, সিদ্ধি এমন সাধনাসাপেক্ষ, আনুপাতিক ব্যর্থতাও এমন শিক্ষাপ্রদ। কিন্তু এই সব চিন্তা নতুন চিন্তা নয়, কোনোটাই বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না, সমস্তটাই শেষাবধি উপন্যাস-লেখকের নিরন্তর নিজস্ব সমাধানের উপর নির্ভর করে।

হেমন্ত সেন

গুরুবাদ ও যুক্তিবাদ

ক্লড ককবার্ন তুখোড় সাংবাদিক, এককালে বিলিতি সাংবাদিক-গোষ্ঠীর 'তারকা'। তাঁর সরস শাণিত লেখনীর নামডাক এখনও কম নয়। তবে এখন তিনি রণক্লান্ত ; জীবনে লড়াই করেছেন অনেক, ঘুরেছেন নানা ঘাটে, খ্যাতি, ক্ষমতা বা অর্থের লোভে নয়, যদিও এর যে কোনোটাই অনায়াস লভ্য ছিল ; মত বদলেছেন কিম্বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মতটা পরিচ্ছন্ন, পরিণত হয়েছে কিন্তু মন তাঁর বদলায় নি। একালের রাগী ছোকরাদের সঙ্গে, সভ্যভব্য বুদ্ধিমন্তদের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে ককবার্ন এখনও বলতে রাজী নন যে সবই ঝুটা, কোনো আদর্শ নেই, দয়া নেই, ভালমন্দ করবার মতো কিছুতেই আর যুক্তিগত আস্থা স্থাপনের উপায় পর্যন্ত নেই।

ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের মাঝ দিয়ে ককবার্ন উত্তর ত্রিশে এসেছিলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিতে। তার আগে তিনি লণ্ডন টাইমসের ওয়াশিংটন দপ্তরের সহকারী প্রতিনিধি। টাইমস ছেড়ে ককবার্ন শুরু করেন নিজের উদ্যোগে বিখ্যাত সাপ্তাহিক কাগজ 'উইক' প্রকাশনা। এই 'উইকে'ই ককবার্নের চমকপ্রদ আবিষ্কার লর্ড অ্যাস্টরের পল্লীভবনে "ক্লাইভডেন গোষ্ঠীর" গোপন শলাপরামর্শ হিটলারকে তোষণের চেষ্টায়। বিলিতি সাংবাদিকতার ইতিহাস, উত্তর ত্রিশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের কৃতিত্বে ককবার্নের এই 'উইক' এখনও বিখ্যাত। ফ্রাঙ্ক পিটকায়ের্ন এই ছদ্মনামে ডেইলী ওয়ার্কারে রাজনৈতিক এবং বৈদেশিক সংবাদের ভাষ্য যিনি নিয়মিত লিখতেন তিনি এই ককবার্ন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে "ইন্‌টারন্যাশনাল ব্রিগেডে"ও ককবার্ন ছিলেন। দুঃখ-কষ্ট-বিপদ, অর্থাভাব, সম্ভ্রান্ত আত্মীয়স্বজন ও পুরোনো বন্ধুবান্ধবের বিরূপতা ককবার্নকে দমিয়ে রাখতে পারে নি। কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্রব

1. *Crossing The Line*, 2. *View From The West*, By Claud Cockburn MacGibbon & Kee.

ছেড়েছেন পঞ্চাশোত্তর কালে। বুদ্ধিমন্তরা পরামর্শ দিয়েছে এবার বই লেখো ক্র্যাভচেঙ্কোর মতো "আমি স্বাধীনতা বেছে নিয়েছি"। ককবার্ন বলেছেন, আমি কি এমনই হাঁদা, এতকাল যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি স্বেচ্ছায় তাঁদের ছেড়েছি বলে বুক চাপড়িয়ে বলব আমি ঠকেছি, আমার সঙ্গে ওরা প্রতারণা করেছে?

কমিউনিস্টদের সংশ্রব কেন ছেড়েছেন সে বিষয়ে ককবার্ন তাঁর আত্ম-কাহিনীতে সরস ভঙ্গিতে কিছু কিছু আলাপ করেছেন। নাৎসী-সোভিয়েট প্যাক্টের সময়েই হ্যারি পলিটের মতো ককবার্নও মানসিক সঙ্কট অনুভব করেছেন। তারপর মেঘ আবার কেটেছে, স্তালিনের বিধানে "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ" হয়েছে জনযুদ্ধ (যুদ্ধের শেষে স্তালিনই আবার পাঁতি দিয়েছিলেন, যুদ্ধটা শুরু থেকেই ছিল সাম্রাজ্যবিরোধী)। পঞ্চাশোত্তর কালে ককবার্ন দল ছেড়েছেন কতকটা মানসিক ক্লান্তিতে। তবে এও ঠিক যে ভক্তিমার্গী কমিউনিস্টদের মতান্ধতা তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী চিত্তকে পীড়িত করেছে। কমিউনিজমের ত্রুটিবিচ্যুতিকে ককবার্ন হাল্কা করেন নি, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে সবচেয়ে যেটা অনুভব করেছেন তিনি সেটা হল কমিউনিস্টরা যে পথে, যে পদ্ধতিতে গতানুগতিক ভাবে চলেছে তা দিয়ে বড় রকমের এবং ভালো কোনোও পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।

ককবার্ন অন্ধবিশ্বাসের নির্বিচার দাবিপূরণের দায় থেকে মুক্ত হয়েছেন, কিন্তু অনুতাপের, আত্মধিক্কারের কোনো সঙ্গত কারণ তিনি দেখেন নি। ফলিত কমিউনিজম থেকে মুখ ফিরিয়ে ধনতন্ত্রের প্রেমে বিগলিত হওয়াটা একেবারেই তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতার বিরোধী। আত্মকাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট উক্তিতে তাঁর চিন্তায় পরিচ্ছন্নতার, উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। শুদ্ধ মন্দটাই তিনি দেখেন নি, দেখেছেন সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের আগ্রহে এমন যুক্তিবাদী লোকও আছেন যাঁরা মোহ বিসর্জন দিলেও আশা ছাড়ে না ("who in shedding their illusions do not also shed their hopes.") মোহান্ধতা আর গুরুবাদী জবরদস্তির একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ককবার্ন। হিটলারী ডিক্টেটরশিপ এবং প্রলেটেরীয় ডিক্টেটরশিপের মধ্যে পার্থক্যটা বোঝাবার জন্য ডেইলী ওয়ার্কারের একটি প্রবন্ধে একজন লিখেছিলেন যে, স্তালিন যদি কালই মারা যান তবুও তাতে সোভিয়েতরাষ্ট্র মারাত্মক ভাবে বিপর্যস্ত হবে না। আর যায় কোথায়, মস্কোয় মহা সোরগোল ;

প্রচণ্ড রোষ, স্তালিনের মৃত্যুকামনা যারা করেছে তারা নিশ্চয়ই বুর্জোয়া দালাল, অতএব নিষিদ্ধ হল বেশ কিছুদিনের জন্য মস্কোয় ডেইলী ওয়ার্কারের প্রবেশ। ভক্তিবাদী মতান্ধতার এই জবরদস্তিকে লঘু করার জন্য বলা যেতে পারে ধন-গণতন্ত্রেও এমনতর অনেকরকম জবরদস্তি হয়, আরও খারাপ হয়। সে কথা ঠিক। কিন্তু ধন-গণতন্ত্রী জবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রতিকারের পথ, অন্তত প্রতিবাদের, সাধারণত কিছুটা উন্মুক্ত। তাছাড়া গুরুবাদ স্বেচ্ছাচার কমিউনিস্ট শাসনের কলঙ্ক নিশ্চয়ই। অন্ধবিশ্বাসের তাড়নায় কমিউনিজমের মারাত্মক ত্রুটিবিচ্যুতি, স্তালিনের আমলে রাশিয়ায় পূর্ব-য়ুরোপে ভয়াবহ অত্যাচার অনাচার সম্পর্কে ভক্তিবাদী কমিউনিস্টরা প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান বা আলোচনা করেন নি। ককবার্নের মতে এ-বিষয়ে বিশ্বাসীদের (তাঁর নিজেরও) ছিল দুই প্রস্থ দুর্ভেদ্য বর্ম—এক প্রস্থ হল ত্রুটি, বিচ্যুতি অনাচার ইত্যাদি সবই কমিউনিস্টবিরোধীদের, "পুঁজিবাদী দালালদের" রটনা; দ্বিতীয় প্রস্থ হল ডবল স্টাণ্ডার্ড, আমেরিকায় বৃটেনে কিম্বা অন্য গণতন্ত্রী দেশে অত্যাচার অনাচার ঘটলে সেটা খুব খারাপ, কিন্তু কমিউনিস্ট ভক্তিবাদীদের মতে সোভিয়েত রাশিয়ায় বা কমুনিস্ট রাষ্ট্রে ওসব ঘটলে তার বিচার করতে হবে আলাদা ভাবে। নিজের সম্বন্ধে ককবার্ন বলছেন, কমিউনিস্টদের উগ্রতা এবং ভ্রষ্টাচার তাঁর রাজনৈতিক সংশয় সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু তিনি কমিউনিস্ট কর্মধারা থেকে সরে এসেছেন অন্য কারণে। প্রায় বছর কুড়ি ব্রিটিশ কমুনিস্ট পার্টির সারাক্ষণ কাজে লেগেছিলেন ককবার্ন। দেখেছেন ঝড়জল, শীতের কষ্ট, নিন্দাবিদ্রূপ, এবং দুচার মারধর সয়েও কাজে লেগে থাকায় কমিউনিস্টদের জুড়ি নেই। লোকে বলে কমিউনিস্টরা যে কোনোও সংগঠনে ঢুকে পড়ে সেটা দখল করে বসে। ককবার্ন রসিয়ে রসিয়ে বলেছেন, তা হবে না কেন, দখল করতে হয় না 'আপসে' হয়, শনিবার বিকেলে কোনোও ইউনিয়নের মিটিং-এ অন্য কোনোও দলের পাত্তা মেলে না, কমিউনিস্টরা দলীয় নির্দেশ মতো ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে হাজির! নিষ্ঠাই কমিউনিস্টদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুণ, আবার এই নিষ্ঠাই অসহিষ্ণু মতান্ধতার সঙ্গে যুক্ত হলে হয় সবচেয়ে মারাত্মক। ককবার্ন অনেক ঠেকে ঠেকে অনুভব করেছেন, মার্কস যাই লিখে থাকুন, ব্রিটেনে অন্তত 'এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটো পাত্রে, বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে'; বনেদী কমিউনিস্ট পন্থায় সমাজসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান খুবই দুষ্কর, এখন একেবারে অসম্ভবপ্রায়।

তা বলে "অনুতপ্ত পুত্রের" মতো ককবার্ন ধনতন্ত্রের আশ্রয়কে সর্বার্থসার গণ্য করেন নি। ধনবৈষম্য এবং শোষণের অবসান তিনি এখনও কামনা করেন; কমিউনিস্ট মতাদর্শের মৌল প্রেরণাকে তিনি মোহমুক্ত চিত্তে সমর্থনে দ্বিধা বোধ করেন না। ফলিত কমিউনিজমের গলদ আবিষ্কার করে যে বুদ্ধিমন্তরা মহা উল্লসিত তাঁদের সম্বন্ধে ককবার্নের সরস শ্লেষোক্তি যেমন উপভোগ্য তেমনি সময়োচিত। পরমবিজ্ঞ একজন সাবধানবাণী শোনাচ্ছিলেন, "বাপু হে, তোমাদের মুশকিল কী জানো!, তোমরা মানুষের ভালোয় বড় বেশি বিশ্বাস কর; অথচ এই হতচ্ছাড়া মানুষই তোমাদের পথে বসাবে।" এর মোক্ষম উত্তর, "তাতে কী হল, ভগবানও তো আপনাদের বিস্তর বার পথে বসাচ্ছেন, তবুও তো ভগবানে বিশ্বাস অটল!" ফলিত কমিউনিজমের গলদে যাঁরা ভয়ানক ভাবে বিচলিত তাঁরা অনেকেই অনায়াসে দেড়শ বছরের বনেদী ধন-গণতন্ত্রের অনাচার ভ্রষ্টাচার ও বিকারকে দিব্যি হজম করেন কী করে, কোন্ যুক্তিতে? মতান্ধতা এঁদের কম নয়। কিন্তু এর জন্য অনেকখানি দায়ী ভক্তিবাদী কমিউনিস্টপন্থীদের উগ্র মনোভাব ও ক্ষমতার ব্যভিচার। ককবার্ন যথার্থ বলেছেন, কমিউনিজম মানবসমাজের সব কিছু সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম এমন অন্ধবিশ্বাস পোষণ করা কমিউনিস্টদের আদর্শের পক্ষেই ক্ষতিকর, অনর্থকর সমাজের পক্ষেও।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

আচার্য নন্দলাল

সৎ-শিল্পরসিক শ্রীকানাই সামন্ত আর একটি স্থপরিকল্পিত ও স্থমুদ্রিত শিল্প বিচারের বই প্রকাশ করে রসিকজনের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এই সঙ্গে প্রকাশক "কথাশিল্প"কেও ধন্যবাদ জানাই এত অল্প দামে ছুটি বহু-রং এবং ১৭টি ছুই-রং ও এক-রঙের বড় ও ছোট চিত্র সম্বলিত রয়াল সাইজ ৮৪ পৃষ্ঠার স্থমুদ্রিত এবং বর্তমান রুচি অনুসারী বিক্রয়-সম্ভাবনায় বিমুখ গ্রন্থের প্রকাশ দায়িত্ব বহনের জন্যে।

শিল্পরসিক পাঠকদের কাছে শ্রীসামন্ত অপরিচিত নন। বাংলার সংস্কৃতিধর্মী পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন শিল্প ও কাব্য গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি রসিকসমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশেষত চার বছর আগে প্রকাশিত তাঁর "চিত্রদর্শন" বইটি এ প্রতিষ্ঠায় তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। আলোচ্য বইটি শুধু নন্দলালের শিল্প আলোচনাই নয় গুরুকৃত্যও বটে, তাই চিত্রবৈচিত্র্য ও রস বিচার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগ যুক্ত হয়ে একদিকে যেমন বইটি আংশিক স্থখপাঠ্য ও মানবিকতায়ত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিপাদ্যকে আচ্ছন্ন করে রসপ্রসার ব্যাহতও করেছে কিছুটা।

অবনীন্দ্র-শিষ্য শিল্পাচার্য নন্দলাল তাঁর গুরুর মতো শিষ্য ভাগ্য থেকে নিজে বঞ্চিত হলেও ভক্তজন বঞ্চিত নন। অবনীন্দ্রনাথ সান্নিধ্যে সার্থক বিকশিত হয়েছিলেন নন্দলাল অসিত, স্থরেন, শৈলেন, ক্ষিতীন্দ্র, ভেঙ্কটাপ্পা প্রমুখ প্রতিভা; শিল্পাচার্য নন্দলালের অনুগামী শ্রীবিনোদবিহারী ভিন্ন অন্য সার্থক শিল্পী এখনও অপরিচিত। তবু ভক্ত শিষ্যদের প্রচেষ্টায় সাধারণের কাছে নন্দলালের পরিচিতি সহজ হয়েছে। অর্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্প আলোচনায় মাসিক প্রবাসীতে নন্দলালের চিত্র ও রচনায় প্রকাশে। রবীন্দ্রমজুমদার প্রভৃতি সম্পাদিত ও সংগৃহীত "নিরীক্ষা" পত্রিকার নন্দলাল সংখ্যা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, সাপ্তাহিক দেশ, মাসিক বিশ্ববাণী, পাক্ষিক দর্শক প্রভৃতিতে নন্দলাল বিষয়ে

শ্রীনন্দলাল বসু: কানাই সামন্ত। কথাশিল্প প্রকাশ, কলকাতা-১২। ৬·৫০

আলোচনা, বিশেষ করে কানাই সামন্তের আলোচ্য পুস্তকটি এবং চিত্রদর্শন, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'নন্দন', বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর নন্দলাল-বিষয়ক গ্রন্থ, রম্যাংশুশেখর দাস-এর Nandalal Bose And Indian Painting প্রভৃতি বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ তারই প্রমাণ।

শ্রীসামন্ত তাঁর এ প্রচেষ্টায় ভাবাতিশয্যকে নিয়ন্ত্রিত করলে সফলতা স্থলভ্য হত। শুধুমাত্র নন্দলালের জীবনী প্রচেষ্টা হলে হয়তো যে-সব আলোচনা স্বাভাবিক হত শিল্পী নন্দলালের বিচারে তা বহুলাংশেই অকিঞ্চিৎকর। গুরু নির্দেশে নন্দলাল, রামকৃষ্ণ ভক্ত সান্নিধ্যে এসেছেন। ভগ্নী নিবেদিতার সহযোগিতায় লেডী হারিংহামের সঙ্গী হয়ে অজন্তা ভিত্তিচিত্রের অনুলিপি করার স্থযোগ পেয়েছিলেন নন্দলাল। গণেন মহারাজের স্নেহপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণে নিশ্চিন্তে কর্মরত ছিলেন তাঁরা। এ সহযোগিতা ও সাহায্যে স্বভাব-কর্মী নন্দলাল কৃতজ্ঞতাজাত ভক্তিতে স্বাভাবিকভাবেই রামকৃষ্ণমুখী হয়ে উঠেছিলেন, এমন চিন্তা অনুচিত নয়। তাই এ গ্রন্থে শিল্পী-নন্দলালের বিকাশ চিত্রিত করার প্রয়োজনে গদাধর-প্রসঙ্গ অপ্রাসঙ্গিক।

অবনীন্দ্র নির্দেশে জীবনধর্মী শিল্পী নন্দলাল অনুভব করেছিলেন গণসংযোগের প্রয়োজনীয়তা। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এদেশের শিল্পীরা পূর্বকালে আশপাশের ঘটনা কালের প্রভাব ইত্যাদি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কেবল ধ্যানস্তিমিত অবস্থাতে বসে ছবি, মূর্তি ইত্যাদি রচনা করে গেছে একথা যেমন মিথ্যা, আজকের বাংলার শিল্পীর দল আমরাও সেইভাবে কাজ করে চলেছি একথাও তেমনি মিথ্যা।" এমন অবনীন্দ্র-অনুশাসনে নন্দলাল জীবনশিল্পী হয়ে উঠেছেন।

গুরু নির্দেশেই নন্দলাল পট আঁকতে শুরু করেন। অবনীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেন, "আমাদের আর্ট বিশেষ গোষ্ঠীর জিনিস, গণ্ডীর জিনিস। পট আঁকো, যাতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই হবে আনন্দ।" শিল্পী গিয়ে বসলেন পথের ধারে, হাটের মাঝে। পটুয়ার মতো দ্রুত পট এঁকে ২।৪ আনা দামে বিক্রয়ও করলেন কিছু। এরই এক পরিণত রূপ প্রকাশ পেয়েছে হরিপুরা কংগ্রেসের মণ্ডপ চিত্রণে। তাই বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী নন্দলালের পটচিত্রের কৃতকৌশল স্বাভাবিকভাবেই আয়ত্ত হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে অবনীন্দ্র-ভগিনী শ্রীমতী স্থনয়নী দেবীর পট চিত্রায়ণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাঁর তুলনা নিষ্প্রয়োজন। পট-চিত্রে সাফল্যের অধিকারিণী স্থনয়নী দেবীর পটের বৈশিষ্ট্য

ছিল পরম্পরার সঙ্গে স্বকীয়তার সংশ্লেষণ। সুঠাম, সাবলীল রেখার ছন্দে অপরূপ অনুস্থাপন, অপরূপ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এনেছিল সুনয়নীর পটে। শ্রীসামন্ত তাঁরই রচিত "চিত্রদর্শন" গ্রন্থের ১৫৬ পৃষ্ঠার সহগামী মুদ্রিত চিত্র-পটে সুনয়নীর ছবিটি দেখলেই নিশ্চয় আমার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করবেন। পট-চিত্রে এমন বৈশিষ্ট্য নন্দলালেও দুর্লভ।

অবনীন্দ্র-অনুসারী কথাবিন্যাস প্রচেষ্টা বিপথগামী হয়ে গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাহত করেছে বেশ কিছুটা। সম্ভবত লেখক অবচেতনে এ-সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন। তাই এক আলোচনায় বার বার শুধু মনে করেছেন "বড় কঠিন সাধনা, যার বড়ো সহজ সুর"; এবং এই সহজ সুর অনায়ত্ত থাকায় সিদ্ধিলাভ ঘটেনি। সহজ সরল কথায় সাধারণের অজ্ঞাত শিল্প ভাষা, সাধারণকে যতটা বোঝানো সম্ভব, মহত্তর অনুকৃতীধর্মী অনুরূপ-সর্বস্ব (ফর্ম) প্রকাশ-প্রচেষ্টা তাকে দুরূহ করে তোলে। শ্রীসামন্তের ক্ষেত্রেও এমন অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারে বারে। আশাপ্রদ যে 'চিত্র দর্শন'-এর প্রকাশিত কুষ্ঠিকা 'শ্রীনন্দলাল বসু'-তে অনেক স্বচ্ছ হয়েছে। তাই কামনা করবো এ-বিষয়ে লেখকের আরো সচেতনতা।

সুমুদ্রিত এই বইটি লক্ষ্য করলে লেখক ও প্রকাশকের আপন দায়িত্ব সচেতনতা বোঝা সম্ভব। কিছু বিচ্যুতি ঘটলেও প্রতিভাধর শিল্পীর বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিচ্ছুরণ আয়ত্ত করতে যেমন সচেষ্ট ছিলেন লেখক, তেমনি অঙ্গসৌষ্ঠবে কার্পণ্য করেন নি প্রকাশক। তবে মহৎ শিল্পীর সামর্থ-প্রকাশে চিত্র নির্বাচনে আরো সুষ্ঠু বিবেচনার সুযোগ ছিল। পরম্পরাগত ভারতীয় শিল্প ক্ষেত্রে আজ যে দুর্যোগ সমাগত, পাশ্চাত্ত্যের অনুকৃতি শিল্পের প্রদর্শনী ও প্রতিলিপিতে যখন দেশ প্লাবিত, ঠিক তখন এমন গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশ দুঃসাহসিক ও অভিনন্দনযোগ্য। সেই সঙ্গে এমন লেখকদের আরো সং ও একনিষ্ঠ প্রয়াস এবং এমন প্রকাশকদের সুমুদ্রণ ও যোগ্য পরিবেশন-প্রয়াস এই বিপথগামী শিল্প আন্দোলনকে প্রতিহত করে শিল্পীদের আরো সংযমী সুবুদ্ধিপ্রণোদিত করবে এবং সৎ-শিল্প সৃষ্টিতে উৎসাহিত করবে। মোহমুক্ত আত্মসমালোচনায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিজ সৃষ্টি সম্বন্ধে অনুরাগ ত্যাগ করে নিজ হাতে অসৎকে পরিহার করে মহৎ শিল্প সাধনার সঙ্গে সঙ্গে প্রসার ও প্রচারের প্রয়াস করতে হবে। তাই বিচক্ষণ শ্রীকানাই সামন্ত মহাশয়ের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টির প্রকাশ-অপেক্ষায় রইলাম।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে

সার্ধ শতাব্দী কাল ধরে স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী প্রমুখ ঐতিহাসিকরা এমন একটি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী রচনা করেছিলেন যা নিয়ে যে-কোনো দেশই গর্ব করতে পারে। এঁদের মধ্যে এক জায়গায় একটা মিল ছিল। এঁরা কেউই বিদেশে শিক্ষালাভ করেন নি। এদেশেই আপনাপন বিশিষ্ট ধারায় বিকাশলাভ করেছেন। সৌভাগ্যবশত, ডঃ মজুমদার ও নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী এখনও আমাদের মধ্যে কর্মনিরত। বার্ধক্য সত্ত্বেও ডঃ মজুমদারের কর্মোদ্যম শিথিল হয় নি। এবং তাঁর এই কর্মক্ষমতা তরুণ কর্মকুণ্ঠ ঐতিহাসিকগণকে যেন ধিক্কার দেয়।

গত কয়েক বৎসর যাবত ডঃ মজুমদার আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নে ব্যাপৃত। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সঙ্কলনের দায়িত্বে তিনি ডিরেক্টর ও সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে ভারত সরকার ঐ সম্পাদকমণ্ডলী বাতিল করে দেন। এক বৎসর পর ডঃ তারাচাঁদকে ঐ কাজের ভার দেওয়া হয়।

ডঃ তারাচাঁদ লিখিত পুস্তকের প্রথম খণ্ড ১৯৬১ সালের ২৬শে জানুয়ারী প্রকাশ লাভ করে। কোনো ভালো বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে বিফল হওয়া কঠিন। ডঃ তারাচাঁদ কিন্তু পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়েছেন। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ডঃ মজুমদারের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অবদান Sepoy Mutiny and Revolt of 1857 গ্রন্থখানি ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এখন তাঁর 'স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল।

History of the Freedom Movement in India : (Volume 1) By Dr. R. C. Majumdar, Firma K. L. Mukhopadhya. Calcutta. Rs. 15.

সরকারী বিধিনিষেধ মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন।

"The Capacity to seize victoriously on available materials, catch in them what is significant from his point of view and convey them, in a form that is effective" বিশেষভাবেই ডঃ মজুমদার এই ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর প্রচণ্ড সতেজ মনীষার স্বাক্ষর ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট এই বর্তমান পুস্তকেও। দুই বইয়েরই যেটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যতা ধূসর পাণ্ডিত্য নয়, উদ্দেশ্য সচেতনতা।

দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি আলোচনা করেছেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাপর্ব বলতে আমরা নির্দিষ্টভাবে যা বুঝি তা নিয়ে। প্রথম খণ্ডে যার অধিকাংশ জুড়ে থাকে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ, পাই আমরা তার প্রেক্ষাপট। ডঃ মজুমদার তাঁর পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলাদেশ যে কৃতিত্বের অধিকারী তার স্বীকৃতি দানে কুণ্ঠিত হন নি। ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর সাহসের অভাব আছে নিশ্চয়ই এমন কথা বলা যায় না। ভূমিকায় তিনি লেখেনও: "প্রাদেশিকতার অপবাদ দেওয়া হবে এই ভয়ে ভীত হয়ে যদি আমি যা বিশ্বাস করি তা বলা থেকে বিরত হই তাহলে ঐতিহাসিক হিসেবে আমি কর্তব্যচ্যুত হব।" এবং সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের বা সন্ত্রাসবাদের প্রকৃতি লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্পর্কে একটি যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণ তিনি উপস্থিত করেন। ডঃ মজুমদার দৃশ্যত রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ও শুল্ক-সম্বন্ধীয় ঘৃণ্য কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের মনকে যা ভবিষ্যত বয়কট আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল তার বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ হয় নি। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক ধমনী স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বিদেশী আমলাতন্ত্রের কথা নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। স্বাদেশিকতা ধর্মের বিকাশের কাহিনী অবশ্য উপযুক্ত গুরুত্বই পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছর ছিল মোটের উপর দুর্ভিক্ষের যুগ। এই পটভূমিকায় স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চারিত 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটির তাৎপর্য সম্যকভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের অর্থনীতিক আধেয় তাঁর লেখায় যথোচিত গুরুত্ব পায় নি। শ্রীঅরবিন্দ রমেশচন্দ্র দত্তের অর্থনীতিক ইতিহাসপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন: "এই

ক্ষেত্রে তিনি কেবল ইতিহাস লেখেন নি, ইতিহাস সৃষ্টিও করেছেন।" অর্থনীতিক অধিকার সম্পর্কে চেতনার ক্রমোন্মেষই বোধহয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম, প্রসার ও সাফল্যের একটি প্রধান কারণ।

ডঃ মজুমদার তার পুস্তকের ভূমিকায় আমাদের জানিয়েছেন যে, মুসলিম রাজনীতি সম্পর্কিত অংশে তিনি সত্য প্রকাশে দ্বিধান্বিত হন নি। হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের একটি তালিকাও তিনি দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ব্রিটিশের ও আলিগড় আন্দোলনের সৃষ্টি এই মত ভুল। বিপুল তথ্যের সমাবেশ করে চমকপ্রদভাবে তিনি এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছেন। কিন্তু কথা হল এই যে কোনো একটা মতকে বাস্তব সত্য বলে ধরে নিলে ইতিহাসকে যে কোনো তত্ত্ব প্রমাণের কাজে লাগান যায়। কেননা, আমরা যা দেখতে চাই তাই দেখে থাকি। পাকিস্তানের জন্ম সম্পর্কে যাঁরা অন্যমত পোষণ করেন, যাঁরা একে একটি রাজনৈতিক অঘটন বলে মনে করেন তাদের মতের স্বপক্ষেও কিছু বলার আছে। বলতে কি মোটের উপর এই ঝোঁকটা ছিল অযৌক্তিকতার। বর্তমান সমালোচকের বাল্যকাল কেটেছে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে। ধর্ম বা জাতিভেদ-চেতনা চিরকাল ছিল এবং প্রতিবেশী সম্পর্কের উপর তা প্রাধান্যলাভ করেছে একথা তার পক্ষে বিশ্বাস করা মুস্কিল। একদা কথাপ্রসঙ্গে মিঃ জিন্না মিসেস কেসীকে বলেছিলেন "ধর্মান্ধদের নিন্দে করো না। আমি ধর্মান্ধ না হলে পাকিস্তান সৃষ্টি আদপে হত না।" ভারত ছেড়ে ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন করে লর্ড মাউণ্টব্যাটন বলেছেন "পাঞ্জাব ও বাঙলার মতো প্রদেশের ক্ষেত্রে অনিবার্য ব্যবচ্ছেদের কথা মিঃ জিন্নাকে জানানো হলে, তিনি ঐক্যের ইতিহাস-আশ্রিত প্রদেশগুলোর অঙ্গ ব্যবচ্ছেদে গররাজী হন। কোন মানুষ আগে পাঞ্জাবী বা বাঙালী পরে সে হিন্দু বা মুসলমান। আমি তাঁর সঙ্গে একমত হলাম। আমি তাঁকে বললাম এই প্রদেশগুলির ব্যবচ্ছেদের সম্ভাবনায় তাঁর মনে যে ভাবের উদয় হয়েছে, তা আমারও মনের কথা আর ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে কংগ্রেসীরাও সেই একই মনোভাব পোষণ করেন। এই ভাবে আমাদের আলাপ চলতে লাগল। এ যেন, আমরা বলতে পারি, ঘুরেফিরে সেই একই জায়গায় পৌছন। বোম্বাই হতে সিন্ধুকে পৃথক করতে লেগেছিল দুই বৎসর কিন্তু ৪০ কোটি মানুষকে আমরা আড়াই মাসে বিভক্ত করে দিলাম।"

কোনো রকম প্রগল্ভ না হয়ে পুস্তকের প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে আমি দু-চার কথা বলব। পুস্তকের ১০-১১ পৃষ্ঠায় বারওয়েল ও ভান্সিটার্টের বিবরণ ও ষ্টিফেনের 'Nuncoomar and Impey'-র ভিত্তিতে মহারাজ নন্দকুমারের ভূমিকা চিত্রিত করা হয়েছে। ডঃ মজুমদার উৎসের কিছু সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বারওয়েল নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন বা ভান্সিটার্ট যা যা বলেছেন এবং ষ্টিফেন যা যা লিখেছেন ডঃ মজুমদার তার সবটারই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

মহারাজ নন্দকুমার স্বদেশভক্ত ছিলনা প্রমাণ করতে এসব কিছুর একত্র সমাবেশের কোনো প্রয়োজন ছিল কি? বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের ইতিহাসে দেশভক্ত কথাটিই যখন অর্থহীন ছিল। ডঃ মজুমদারের নামের একটা ওজন আছে। তার সাহায্যে তিনি এই প্রচারকে নতুন জীবন দান করলেন। মহারাজ নন্দকুমারের চরিত্রে শঠতা ও সততার এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছিল। সুতরাং তার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় এক দুরূহ ব্যাপার। এক সময়ে নন্দকুমার তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষী ছিলেন আবার পরবর্তী সময়ে হেষ্টিংস-বিরোধী হয়ে পড়েন। সকল কালের রাজনৈতিক চরিত্রের মতো তিনিও ধূর্ত ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন। কিন্তু ক্লাইভের চিঠিপত্র ও হেষ্টিংসের নিজের স্বীকৃতিই এ কথা প্রমাণ করে যে নন্দকুমারের চরিত্রে মহত্ত্বও ছিল। বারওয়েল ও ভান্সিটার্ট-বর্ণিত নিরঙ্কুশ শঠচরিত্রই তিনি ছিলেন না। ১৭৫৮ সালে ক্লাইভ লিখিত কয়েকটি পত্রে জানা যায়, যে, নন্দকুমার মীরজাফরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রায় দুর্লভকে উৎখাত ও উচ্ছেদ করতে অস্বীকৃত হন। এ কাজে আমীর বেগের সঙ্গে সহযোগিতা করলে নবাব তাঁকে খেতাব ও জায়গীরের প্রতিশ্রুতিও দেন। কিন্তু তবু তাকে প্রলুব্ধ করা যায় নি। বিতর্কমূলক ও পক্ষপাতদুষ্ট তথ্য-নির্ভরতা ঐতিহাসিককে অসুবিধার সম্মুখীন করে। এক ভারতীয় ইতিহাস সাধনার অন্যতম পথিকৃত তাঁর বইয়ের এই অংশে নিজের ক্ষমতার প্রতি সুবিচার করতে পারেন নি বলেই মনে হয়।

পরিশেষে, এই গ্রন্থ ভাণ্ডারে আহৃত ফসল দেখে বলা যায় সরকারি যৌথ উদ্যোগের তুলনায় ইতিহাসশাস্ত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগই এখনও গতিশীল ও কর্মকুশল।

সুশোভন সরকার

এশিয়ার মুক্তি

ইওরোপে সাম্প্রতিক ইতিহাস-চর্চার একটা আকর্ষণীয় দিক হল সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আধুনিক ইতিহাস যে ইওরোপ-কেন্দ্রিক থাকতে পারে না এই বোধ। আলোচ্য গ্রন্থটি এই নতুন আগ্রহ ও বিস্তারের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ডাচ ভাষায় এর প্রকাশের তারিখ ১৯৫৬; আর. টি. ক্লার্ক-এর ইংরাজি অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে ঠিক এক বৎসর আগে, অর্থাৎ ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে। লেখক, অধ্যাপক জান রমেন, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। তিনি তাঁর স্বদেশের এক প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করেছেন বারো খণ্ডে; বর্তমান জগতে ইওরোপের প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ বই আছে; ইউনেস্কো-পরিকল্পিত পৃথিবীর ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডের (বিংশ শতাব্দী) তিনি হলেন অন্যতম সম্পাদক; ১৯৫১-৫২ সালে ইন্দোনেশিয়ায় অধ্যাপনা সূত্রে এশিয়াবাসীর সঙ্গে তাঁর কিছুটা সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল। ইংরাজি সংস্করণের ভূমিকায় সর্দার পানিক্করের জ্ঞানগর্ভ আলোচনাটুকু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রসাদগুণে উপভোগ্য হয়েছে।

বর্তমান এশিয়ার ইতিহাসের নানা দিক সম্বন্ধে ইতিমধ্যে নানা লেখা প্রকাশিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও অধ্যাপক রমেন-এর গ্রন্থটি বিশেষ সমাদরের যোগ্য। এর বৈশিষ্ট্য হল লেখকের ব্যাপক দৃষ্টি, গোটা মানব জাতির আশা-নিরাশা সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি, ইতিহাসে ঘাত-প্রতিঘাতের যুক্তিসঙ্গত সুষম বিশ্লেষণ, অগণিত ফ্যাক্টের মাঝ থেকে ঘটনাস্রোতের একটি সুসম্বদ্ধ রূপ-নির্ধারণ। বিশ শতকের এশিয়ার ইতিহাস এখানে সংক্ষিপ্ত অথচ পর্যাপ্ত একটি সামগ্রিক রূপ পেয়েছে, এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। অনুসন্ধানী ছাত্র ও সাধারণ পাঠক উভয়কেই বইখানি নিঃসন্দেহে তৃপ্ত করবে, কারণ এ-লেখা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ অথচ সুখপাঠ্য।

The Asian Century: A History of Modern Nationalism in Asia—by Jan Romein. George Allen & Unwin Ltd., London, 1962. 50 s.

লেখক এশিয়ার মধ্যে ইজিপ্ট-কেও ধরে নিয়েছেন, তার কারণ সে-দেশে পশ্চিম ও দক্ষিণস্থিত দুর্গম প্রাকৃতিক বাধার চাপে দেশবাসীকে সর্বদাই পূ অর্থাৎ এশিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হয়েছে। এশিয়াবাসীর বিপু সংখ্যায় ঘনিষ্ট সমাবেশ চিরদিনই মহাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব ভাগে। এদে চোখ দিয়ে দেখলে মহাদেশকে কেন্দ্রিক ও প্রান্তিক দুই অংশে ভাগ করা সঙ্গত। প্রথম অংশে পড়ে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, চীন, জাপান প্রভৃতি। অপর অংশে পড়বে আপেক্ষিকভাবে জনবিরল উত্তর ও মধ্য এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য, তুরস্ক এবং ইজিপ্ট্।

যুগ যুগ ধরে এই এশিয়া যে একেবারে অচল অপরিবর্তিত ছিল তা নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে মহত্তম ধর্মের সব কয়টির জন্মস্থল এশিয়া মহাদেশ, সুতরা অন্তত আধ্যাত্মিক জীবনের প্রবল স্রোতধারা এখানে প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু একথাও সত্য যে আর্থিক জীবনের বনিয়াদ এই অঞ্চলে শতাব্দীর প শতাব্দী একই রূপে বিরাজ করে এসেছে। প্রায় কৃষিসর্বস্ব উৎপাদন, চাষে একই সনাতন পদ্ধতি, উৎপাদিত শস্যের প্রায় একই পরিমাণ, আকস্মি বিপর্যয় ও দুরবস্থা থেকে পুনরুত্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পোৎপাদনের আপেক্ষি সঙ্কীর্ণতা, সমাজে মধ্যশ্রেণীর দুর্বল অবস্থা—সমাজের এই ছক এশিয়ায় এত দীর্ঘস্থায়ী যে তাকে বহুদিন চিরস্থায়ী বলেই গণ্য করা হয়েছিল। রাজ্যে উত্থান-পতন, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি ছিল সমাজের উপরতলার বিক্ষোভ, নিতান্ত বাহ্যিক ব্যাপার, সমাজ-জীবনকে এ-সব উপদ্রব বিশেষ স্পর্শ করে নি উদ্বৃত্ত সম্পদকে চিরাচরিত প্রথায় ভোগ করে এসেছিল মুষ্টিমেয় শাসকশ্রে তাদের নেতা ভূস্বামীগণ, পুরোহিতবর্গ অন্তরঙ্গ সহচর।

জীবনযাত্রার এই ধরন কিন্তু এশিয়ার কিছু নিজস্ব ব্যাপার নয়। সভ্যতা অপর লীলাভূমি ইওরোপেও আন্দাজ ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত অব ছিল এরই অনুরূপ। সেখানে কিন্তু এরপর আসে বিশাল পরিবর্তন, এতদিনকা সভ্যতার সাধারণ ছক ভেঙ্গে নতুন যুগের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সেই জয়যাত্রা একটা অঙ্গ হল এশিয়ার উপর ইওরোপের প্রভাব বিস্তার। অবশ্য মোটামু ১৮০০ সালের আগে পর্যন্ত ইওরোপীয় প্রভাব আধিপত্যে পরিণত হ পারে নি, ইওরোপের দিগ্বিজয় আসলে সম্পন্ন হয় মাত্র উনিশ শতকে। ত ইওরোপের কবলে এসে পড়ল এশিয়ার তিন প্রাচীন সমাজ—চৈনি হিন্দু, এবং ইস্লামীয়; সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপীয় মুঠির মধ্যে এল এশিয়া

উত্তর ও মধ্য ভূখণ্ড। গোটা এশিয়া তখন ইওরোপের একান্ত পদানত।

ইওরোপের প্রথম সংস্পর্শে এশিয়াবাসী দ্বার রুদ্ধ করে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রয়াস পেয়েছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে দেখা গেল নতুন উদ্যম—আধুনিক ইওরোপের শ্রেষ্ঠত্বটুকু যথাসম্ভব আত্মসাৎ করে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা। ইওরোপীয় আঘাতের প্রত্যাঘাতে বিশ শতকে রূপ গ্রহণ করল এশিয়ার মুক্তি-অভিযান। অধ্যাপক রমেন এর তিনটি দিক লক্ষ্য করেছেন—রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জন, বিজ্ঞান ও যন্ত্রের ব্যবহার মারফৎ আর্থিক বিপ্লব, এবং সমাজের পুনর্বিন্যাস। এইভাবে আরম্ভ হয়েছে এশিয়ার চিরাচরিত ব্যবস্থায় যুগান্তকারী রূপান্তর। ১৯৫০ সালের মধ্যে এশিয়া হল আবার স্বাধীন উত্তর এশিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্লীন হওয়াতে স্বতন্ত্র স্বাধীন না হলেও নবজন্মে উদ্বুদ্ধ। এশিয়ার মুক্তি তাই শুধু বিদেশী শৃঙ্খলের মোচন নয়, সনাতনী বিধিব্যবস্থা থেকে উদ্ধার-প্রাপ্তিও বটে। এশিয়া আজ দাঁড়িয়েছে অজানা ভবিষ্যতের দ্বারদেশে, প্রাচীন সনাতনী সুপ্তিতে প্রত্যাবর্তন আজ অসম্ভব-প্রায়।

ইতিহাসে এশিয়ার পুনর্জাগরণ তাই এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। এর বিস্তার এক চমকপ্রদ ঘটনা, সামান্য অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এতবড় পরিবর্তন বিস্ময়জনক, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও এখানে অশেষ। এশিয়ার মুক্তি-অভিযানকে অধ্যাপক রমেন যে পাঁচ পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন, সম্পূর্ণ গ্রাহ্য না হলেও তার কিছুটা সার্থকতা আছে। প্রথম যুগকে তিনি বলেছেন 'জাগরণ' (১৯০০-১৯১৪); তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ইওরোপ সম্বন্ধে 'মোহমুক্তি' (১৯১৪-১৯১৯)। তৃতীয় পর্যায়ে হল দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী 'ঘাত-প্রতিঘাত' (১৯১৯-১৯৪১)। এরপর দেখি 'ঝড়ের দিন' (১৯৪১-১৯৪৫) অর্থাৎ দ্বিতীয় যুদ্ধের আলোড়ন। ১৯৪৫-এর পরবর্তী আমলকে গ্রন্থকার নাম দিয়েছেন 'সিদ্ধিলাভ ও আশাভঙ্গ'। অতীত থেকে মুখ ফেরানো সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত।

অধ্যাপক রমেন শুধু কাহিনীকার নন। তাঁর নিজের বিশ্বাস এই যে এশিয়ার মুক্তি পৃথিবীর ঐক্য সাধনের দিকে পদক্ষেপ। বাস্তব ঘটনার মাল-মশলা নিয়েই ইতিহাস রচিত হয়, কিন্তু যে-কোনও ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে ঐতিহাসিকের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রকাশ পেতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে রমেন

হাইডেলবার্গের অধ্যাপক জেলিনেকের এক প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণ করেছেন। রমেন-এর দৃঢ় ধারণা যে যদিও এশিয়ায় ইওরোপীয় প্রভুত্বের অনেক নিদর্শনেই লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয় তবুও ইওরোপের সাময়িক আধিপত্যের কিছুটা সুফলও লক্ষণীয়। এতে করে এশিয়ার পুনর্জন্ম এবং তার ফলে নতুন সমাজ-বন্ধনে জগৎজোড়া ঐক্যের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তবে মুশকিল এই যে এশিয়ার নেতৃস্থানীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ঐতিহাসিক কারণেই দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত, বিভক্ত।

অধ্যাপক রমেন পশ্চিমী জাতিদম্ভতা থেকে মুক্ত। তিনি তাই এশিয়ায় ইওরোপীয় নীতির অনেক দিকের নিন্দা থেকে বিরত থাকেন নি। নিরপেক্ষতার নামে অনেক ঐতিহাসিকের ইওরোপীয় শাসনের সাফাই গাওয়া তাঁর লেখায় তাই অনুপস্থিত, পশ্চিমী লেখকেদের সাম্রাজ্য-সংশ্লিষ্ট সঙ্কীর্ণতা তাঁকে পীড়া দিয়েছে। অথচ তিনি এশিয়ার অন্ধ স্তাবকও নন। মুক্ত এশিয়া সম্বন্ধে তিনি মোহসৃষ্টি করেন নি, ভবিষ্যতের সঙ্কট সম্বন্ধে তিনি সচেতন। তাঁর লেখায় মানবিক মনের পরিচয় তাই পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করবে। বহু প্রসঙ্গে তাঁর মতামত এইজন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার্য। দৃষ্টির গভীরতা ও লিপিকুশলতার জন্যও তাঁর বিচিত্র নানা আলোচনা স্মরণীয় হয়ে থাকবে—গান্ধীজির ভূমিকা এবং নেহেরুনীতির বিশ্লেষণ; এশিয়ার উপর জাপানের প্রভাব আর চীনের একপুরুষব্যাপী রণশিক্ষার অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার আশ্চর্য অভিযান কিম্বা ঠাণ্ডা লড়াই-এ পরমাণবিক বোমার চাপ সৃষ্টি; সনাতন সংস্কার বর্জনে মুস্তাফা কামাল পাশার অপূর্ব সাহস অথবা বান্দুং সম্মেলনের তাৎপর্য, যেখানে দেখা গেল এশিয়ার নবলব্ধ স্বাতন্ত্র্য, অথচ ঈপ্সিত ঐক্য রইল সুদূরপরাহত।

ডক্টর প্লুভিয়ার সংকলিত ঘটনাপঞ্জী ও একটি গ্রন্থ-তালিকা আলোচ্য বইখানির সম্পদ বাড়িয়েছে। পাঠকসমাজে ও ছাত্রমহলে এর বহুল প্রচার অবশ্যম্ভাবী বলে লেখার মধ্যে কিছুটা ভুল-ভ্রান্তির উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধন সহজসাধ্য। নিছক ছাপার ভুল চোখে পড়ল অনেক জায়গায় (যেমন ৬৩, ১৩৬, ১৭৬, ১৯৭, ২০৬, ২৫৫, ২৬২, ২৯২, ২৯৮ পৃষ্ঠায়)। অনেকগুলি ভারতীয় নামের বানান ভুল করা হয়েছে। কয়েকটি বাক্যাংশ পাঠক সম্ভবত ভুল বুঝবেন (যেমন ৬৫, ৬৭, অথবা ২৬২ পৃষ্ঠায়)। জমিদার অর্থে লেখা হয়েছে 'জমিন্দারি'; হরতালকে

বলা হয়েছে 'বয়কট'; 'অসহযোগ' শব্দের উল্লেখ নেই; সুভাষচন্দ্র বসু হয়েছেন 'চন্দ্র বোস'; মীরাটের বন্দীরা এবং সুভাষচন্দ্রকে বর্ণনা করা হয়েছে সোস্যালিস্ট বলে; এম. এন. রায়কে করা হয়েছে ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের নেতা। জনযুদ্ধকে দেখানো হয়েছে বিকৃত রূপে আর চীনের বহুবিতর্কিত গণ কমিউন নাকি একটা "যুক্তিসঙ্গত পরিণতি।" ১৮৮ পৃষ্ঠায় পড়ি যে চীনের বিপ্লব "ইতিহাসের মহত্তম বিপ্লব।" সতেরো শতাব্দীর ইংরাজ বিপ্লব, আঠারো শতকের ফরাসী বিপ্লব, এবং আমাদের এ-যুগের রুশ বিপ্লব তাহলে কি ছিল? পশ্চিম ও এদেশের বুদ্ধিবাদী মহলের একাংশে যে প্রচ্ছন্ন চীনা-প্রীতি চোখে পড়ে একি তারই চিহ্ন না একটা অসাবধান উক্তি মাত্র?

পরিশেষে আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধে সমালোচকের কিছু আপত্তি আছে। বিষয়বস্তু বিশ শতকের প্রথমার্ধে এশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম, কিন্তু গোটা এই শতককে কি এশিয়ার নিজস্ব বলে চিহ্নিত করা সমীচীন? আফ্রিকা বা লাটিন আমেরিকাই বা নয় কেন? শোনা যায় যে আমেরিকানেরাও অনেকে ভাবে যে শতাব্দীটা নাকি তাদেরই—মার্কিন শতাব্দী। বস্তুনিষ্ঠ বিচারে কি মনে হওয়া উচিত নয় যে বিশ শতকের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা সমাজবাদের অভ্যুত্থান—থিওরি থেকে সমাজবাদের বাস্তবে উত্তরণের প্রচেষ্টা? এটা কোনও মহাদেশ-বিশেষের ব্যাপার নয়, মানবজাতির ইতিহাসে ব্যাপক মোড় ফেরার নিদর্শন। দেশ বা মহাদেশের খণ্ডিত ভাবমণ্ডিত দৃষ্টি দিয়ে আমাদের যুগকে দেখাটা নিশ্চয় অসঙ্গত।

সব্যসাচী ভট্টাচার্য

দর্শনের দারিদ্র্য ? বিজ্ঞানের বৈভব ?

আয়নার ওপারে এলিসের সই রাঙা রাণীর মুখ দিয়ে ডজসন বলেছেন যে পায়ের তলার মাটি এত দ্রুত সরে যাচ্ছে যে এক জায়গায় স্থির থাকতে গেলেও খুব জোরে ছুটতে হয়। পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে আমাদেরও অনুরূপ পরিশ্রম করতে হয়, নচেৎ পশ্চাদ্‌গমন অনিবার্য। অতীত নিয়ে কারবার করা ঐতিহাসিকের পেশা হলেও তাকে বর্তমানের মাটিতেই দাঁড়াতে হয়। তাই ঐতিহাসিকের বিশ্ববীক্ষা কালের প্রগতির সঙ্গে নিয়ত পরিবর্তনশীল। অবশ্য এক জাতের ঐতিহাসিক এই প্রয়োজন স্বীকার করেন না। উপাত্ত সংগ্রহেই এদের সন্তুষ্টি। সংগৃহীত তথ্যের মূল্যায়নে এদের অনীহা। এরাই মায়াকভ্‌স্কির উপহাসের লক্ষ্য :

'তল্লাশ করে অতীতকাল
লিভভ্‌স্কির ঝরে অশ্রু—
মেহ্‌দি, না লাল
ছিল বারবারোসার শ্মশ্রু ?'

('আমি ভালবাসি', ১৯২২ ; লিভভ্‌স্কি ছিলেন জনৈক পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা।) পেশাদার গবেষক, যারা কেতাব লেখেন খেতাব পেতে, তাদের একটা অংশ এই শ্রেণীর অন্তর্গত হলেও এদের ঐতিহাসিক না বলে পুরাণতত্ত্ববিদ (antiquarian) বলাই সঙ্গত।

এটা আর তর্কাধীন নয় যে ইতিহাসের সন্নিধ সমাজবিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রেই হাওয়া বদল হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে হাওয়া কিছুটা এলোমেলো বইছে। সেই হাওয়ায় ভাসা কয়েক টুকরো খড় অজ্ঞতার বেড়া ডিঙিয়ে ঐতিহাসিকের আত্মসন্তুষ্টি বিপর্যস্ত করছে। গত দশকে ইতিহাস-দর্শনের কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের অনিশ্চয়তার সূত্রের (theory of indeterminacy) ফলে আজকে কারণতার (causality) ধারণা পরিবর্তিত।

What is History : E. H. Carr. Macmillan, London. 21sh.

পরম ও আপেক্ষিক সত্যের ধারণাও অনুরূপভাবে পরিবর্তিত। নিমিত্তে আস্থা না থাকলে ইতিহাস বিচ্ছিন্ন ঘটনা-পারম্পর্য রূপে উপস্থাপিত করা স্বাভাবিক (মার্ক টে্‌ইন-এর ভাষায়—one damn thing after another)। ঐতিহাসিক ফিশর বলেছেন, ইতিহাসে সামান্যীকরণ (generalisation) অসম্ভব, কারণ ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধেই বলা চলে যে সম্পূর্ণ অনুরূপ আগে কখন ঘটেনি ভবিষ্যতেও ঘটবে না। এই জাতীয় (unique) ঘটনার সামান্যলক্ষণার অভাবহেতু সামান্যীকরণ চলে না। আর একটি প্রশ্ন নিয়ে গত দশকে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে—ইতিহাসে নিয়ন্ত্রণ বা নিয়তিবাদ (determinism)। 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা' (১৯৫৪) গ্রন্থের লেখক আইজেয়া বর্লিন-এর মতে হেগেল এবং মার্কস্‌ ছিলেন নিয়তিবাদী। তারা ব্যক্তির ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য (free will) অস্বীকার করে মানুষকে ইতিহাস নির্দিষ্ট নিয়তির অয়ন পথে নিশ্চেতন বস্তুকণার ন্যায় কল্পনা করেছেন। বর্লিনের মতে মানুষকে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ববিধানের অধীন করে তার ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা নীতিবিরুদ্ধ। এবং আপতন (accident) ও নিয়মের ব্যত্যয়গুলিকে অবহেলা করে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা ঘোষণা করা যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে নিয়তিবাদের ছিদ্রপথে মার্কস্‌বাদকে আক্রমণ করতে একটা দল সৃষ্টি হয়েছে এবং এই দলের মূল গায়েন কার্ল পপ্‌পার। 'মুক্তসমাজ ও তার শত্রু' (১৯৫৭) পুস্তকে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের শত্রুদের কুলপঞ্জিকা নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তার মতে হেগেল ও মার্কস্‌-এর মধ্যেই ব্যক্তিস্বাধীনতালোপী দর্শনের মূল, এবং তারও আগে আদি পাপী প্লাতো। বিশেষভাবে এদের দর্শনে ঐতিহাসিক নিয়তিবাদকে তিনি সকল নষ্টের মূল মনে করেন ('নিয়তিবাদী ইতিহাসের দারিদ্র্য,' ১৯৫৭)। প্রকৃতপক্ষে পপ্‌পারের অভিযোগ এই যে উপরোক্ত ত্রয়ী ইতিহাস-দর্শনে অনিষ্টকর এক মায়াবাদের জনক।

এইসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে অধ্যাপক কাআর লিখিত নবতম গ্রন্থের মূল্য বোঝা যাবে। যে-সকল লেখক ইতিহাস-দর্শনের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণে যত্নপরায়ণ তাদের মত খণ্ডন করে কাআর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের ভিত্তি দৃঢ়তর করেছেন। তার মতে বৈজ্ঞানিকের কাছে ঐতিহাসিকের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। পশ্চিমে মূল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রাচীন চার্চ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী ; হিউম্যানিটিজ্‌ ও বিজ্ঞানের পৃথকীকরণ এবং প্রথম শ্রেণীর বিদ্যাগুলির বিজ্ঞান সম্বন্ধে উন্নাসিকতা এই কারণপ্রসূত। কৌলীন্য

নষ্ট হওয়ার মধ্যযুগীয় ভীতি ত্যাগ করে বিজ্ঞানের আত্মীকরণ অবশ্য কর্তব্য। কাআর বলছেন যে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মুখ্য সমস্যা একই—প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশ। শতাধিক বৎসর আগে মার্কসের উক্তি স্মর্তব্য : "ইতিহাস (অর্থাৎ মানব-ইতিহাস) প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির ইতিহাসের অংশ···সমাজবিজ্ঞান কালক্রমে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্গত হবে, যেমন প্রকৃতিবিজ্ঞান আবার সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত হবে : সৃষ্টি হবে একটি বিজ্ঞান।" ('১৮৪৪-এর অর্থ নৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি, মস্কো সংস্করণ, ১৯৬১, পৃঃ ১১১)

কাআরের মতে বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে সনাতন দর্শনের অনেক ভ্রান্তি দূর হয়েছে। এককালে বলা হত যে বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি অনিবার্য, কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন যে কেবল সম্ভাব্যতার হিসেব (calculation of degree of probability) করা সম্ভব। সমাজবিজ্ঞানেও ভবিষ্যদর্শন সম্ভব না হলেও সম্ভাব্যতার পরিমাপ করা চলে। কাআর বৈজ্ঞানিক পঁয়কারের উক্তি উৎকলিত করেছেন : বিজ্ঞানের নিয়মগুলি চিন্তনের সাহায্যের জন্য প্রকল্প (hypotheses) মাত্র। উদাহরণস্বরূপ কাআর পারমাণবিক বৈজ্ঞানিক রাদারফোর্ড-এর কথা বলেছেন—তিনি পুরাতন প্রথায় কার্য-কারণের নিয়ম খুঁজতেন না, কি ঘটছে তার সম্যক ধারণাই তার লক্ষ্য ছিল। নিউটনী বলবিদ্যার যান্ত্রিকতাকে আধুনিক বিজ্ঞান পেছনে ফেলে এসেছে। যেমন ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের ছাপ একসময়ে সমাজবিজ্ঞানের ওপর পড়েছিল (organismic theories), পুরাতন বলবিদ্যার অনুকরণে সমাজবিজ্ঞানে অমোঘ নিয়মাবলী আবিষ্কার করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। পুরাতন যান্ত্রিকতার অনুকৃতি আজকের দিনে নিতান্ত অচল।

আধুনিক বিজ্ঞান অতি দুরূহ এবং জ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় একাধিক বিদ্যার অনুশীলন দুঃসাধ্য। তাই নতুন বিজ্ঞান অনেক নতুন ভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। অনিশ্চয়তার সূত্র (theory of indeterminacy) বেনিয়মের নিয়ম বলে ধরে নিয়ে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' অনেকে মায়াবাদের পুনরুজ্জীবনের যে সালসা তৈরী করেছেন ঐতিহাসিক তা' মেনে নেবে না। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সাবধানবাণী স্মর্তব্য : "অবশ্য পদার্থ বিজ্ঞান আজ কার্য-কারণের শৃঙ্খল-মুক্ত ; এবং কোনও অবস্থার যথাযথ পুনরাবৃত্তি যেহেতু অঘটনীয়ই নয়, অভাবনীয়ও বটে, তাই নির্বিকল্প-ন্যায়ের মত নিত্য প্রকৃতিও

হয়তো একটা আদর্শ, অসাধ্য আদর্শ। পক্ষান্তরে···কার্যত আমরা হেতুবাদের সমর্থন পাই বা না পাই, নিমিত্তে ভক্তি হারালে, ইতিহাসও রূপকথার ভেক পরবে।" ('উদয়াস্ত', ১৯৩৭)

মার্কসীয় ইতিহাস দর্শনের সমালোচকদের—বিশেষত এদের সুপরিচিত প্রবক্তা কার্ল পপ্‌পার সম্বন্ধে কাআরের মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য। এদের বক্তব্য পূর্বেই সংক্ষেপে বলা হয়েছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে অভিযোগ তিন দফা। মার্কস্‌-এর ইতিহাস দর্শনে আপতন (accident) প্রসূত নিয়মের ব্যত্যয় অগ্রাহ্য করা হয়েছে ; ব্যক্তির ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হয়েছে ; তৃতীয়ত, ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে নিয়তিবাদী মানসিকতার বশে—যেটা ঐতিহাসিকের পক্ষে অনধিকার চর্চা।

কাআর মার্কস্ আলোচনা করে দেখিয়েছেন (পৃঃ ৯৫) যে আকস্মিক ঘটনা বা আপতন তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু আপতিক কোন কিছু কেবলমাত্র ইতিহাসের গতিকে ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত করে, গতিপরিবর্তনের কারণ কখনই হয় না। তা ছাড়া আপাত দৃষ্টিতে যেটা আপতিক সেটা বর্তমানে অজ্ঞাত কোনও নিয়মের বশীভূত হতে পারে। এবং আপতনের ধারণাটিও, প্লেখানভের ভাষায়, আপেক্ষিক—কারণ একটি ঘটনাপ্রবাহে যেটা আপতিক অপর একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহে সেটাই অনিবার্য। ব্যক্তির ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আলোচনা অতি পুরাতন। কাআর এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন নি—কারণ সম্ভবত এই যে প্লেখানভ্ অনেকদিন আগে মার্কসীয় মতের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন ('ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান'; ১৮৯৮)। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে পপ্‌পার ইত্যাদির কলহ মার্কস্ নয়, হেগেলের সঙ্গে—যিনি অবশ্যম্ভাব্যতা (necessity) এবং ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য (freedom) গূঢ় অর্থে একই অনুমান করেছিলেন। যাই হোক সমস্যাটি কাআরের মতে ইতিহাসের নয় নীতিশাস্ত্রের। (প্রকৃতই এই বিবাদে নিয়ত ক্যালভিনিয় শাস্ত্রালোচনার ক্লান্তিকর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।)

ভবিষ্যদ্বাণী (prediction) সম্বন্ধে নিয়তিবাদী ইতিহাস দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। যদি ইতিহাস (পপ্‌পারে ভাষায় unique process) সামান্যীকরণের সুযোগ না দেয় তবে ভবিষ্যদর্শন অসম্ভব। এর উত্তরে কাআর বলেছেন যে unique কথাটি আপেক্ষিক। দুটি একই জাতের প্রাণী বা একই জাতের পাথর সম্পূর্ণ এক অন্যের অনুরূপ নয়—তাই বলে প্রাণীবিদ্যা বা ভূবিদ্যা

অসম্ভব হয় নি। কাআরের ভাষায়: "The historian is not interested in the unique, but what is general in the unique"…এবং এ ভাবেই সামান্যীকরণ সম্ভব। পপ্‌পার বা বর্লিন বলেন যে ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞানের সূত্রগুলি রসায়ন বা পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলির মত নয়। অতি সত্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানেও সত্যাসত্য নির্ণয়ে আপেক্ষিকতার প্রশ্ন ওঠে। কাআরের মতে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানী অমোঘ নিয়মের পরিবর্তে সম্ভাব্যতার পরিমাপেই আস্থাশীল; সমাজবিজ্ঞানের কর্তব্য একই, কেবল অনিশ্চয়তার মাত্রা অধিক যেহেতু variables বহু, যেহেতু মাপনা অসম্ভব বলে সামাজিক অনেক প্রক্রিয়া অজ্ঞেয়, যেহেতু মানুষ অচেতন নয়।

এই প্রসঙ্গে কাআরের ইতিহাস দর্শন সম্বন্ধে দুইটি প্রতিজ্ঞা বিশদ করা দরকার। ঐতিহাসিকের আপেক্ষিক সত্য নিয়ে কারবার। পরম সত্য চরম লক্ষ্য—"it is still incomplete—something in the future towards which we move"… (পৃঃ ১১৫)। হেগেলীয় ভাষায় তিনি বলেছেন "it is in the process of becoming"। দ্বিতীয়ত, কাআর সনাতন দর্শনের বিষয়-বিষয়ী (object-subject) সংক্রান্ত দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সন্দিহান। পুরাতন জ্ঞানবিজ্ঞানের (epistemology) নিরুক্তি তার মতে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য। যেহেতু সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ যুগপৎ বিষয় এবং বিষয়ী, গবেষক এবং গবেষণার বিষয়, দর্শক এবং দৃষ্ট বস্তু সেহেতু বিষয়-বিষয়ী পৃথক্‌করণ অসম্ভব। তা ছাড়া সমাজবিজ্ঞানে নিয়তই বিষয় এবং বিষয়ী পরস্পরকে প্রভাবিত করছে। উদাহরণত আমরা 'ইতিহাসের শিক্ষা' গ্রহণ করি, আবার অর্থনৈতিকের পরামর্শে ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করি। আধুনিক পদার্থবিদ্যাতেও বলে যে "জগৎ পর্যবেক্ষণমাত্রেই পক্ষপাত দুষ্ট।" কাআরের মত বিস্তৃত উৎকলনের যোগ্য: "Classical theories of knowledge no longer fit the newer sciences, least of all physics. The process of knowledge, far from setting subject and object sharply apart, involves a measure of interrelation and interdependence between them. Social sciences as a whole, since they involve man as both subject and object, both investigator and the thing investigated are incompatible with any theory of knowledge which rigidly divorces object and subject…"

ঐতিহাসিক কাআর নিজের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে ইতিহাসের পথে মানুষের প্রগতি সম্বন্ধে বিশ্বাস আজকের পশ্চিমের ঐতিহাসিকেরা অনেকেই হারিয়েছে। অথচ এদেরই পূর্বসূরী ঐতিহাসিকদের ক্রমপ্রগতিতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কাআর স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কেম্‌ব্রিজ্‌ আধুনিক ইতিহাস সম্পাদনাকালে (১৮৯৬) লর্ড একটনের উক্তি: মানব সমাজের প্রগতি ইতিহাসের একটা বৈজ্ঞানিক প্রকল্প (hypothesis) যা আমরা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেব। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেন যখন শক্তিস্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় তখন মানসিক আবহাওয়া ছিল ভিক্‌টোরিয় আশাবাদে সম্পৃক্ত। ভবিষ্যতে সম্বন্ধে আশা অতীত সম্বন্ধে অন্বেষণে মানুষকে উৎসাহিত করে। "A society which has lost belief in its capacity to progress in the future will quickly cease to concern itself with its progress in the past"। (পৃঃ ১২৭) আজকে প্রগতিতে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অনাস্থা সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কাপ্রসূত। গত কয়েক বৎসরে মার্কসবাদীদেরও কতকগুলি প্রত্যয় বিপর্যস্ত হয়েছে। কোথায় সেই বিশ্বাস যা নিয়ে মায়াকভ্‌স্কি 'ভাবীকালের কমরেডদের' সাম্যতন্ত্র গড়ে তুলে ইতিহাস সৃষ্টি করতে বলেছিলেন ('জোর গলায়', ১৯৩০)। যে বিশ্বাস নিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'ইতিহাস আমাদের দিক নেয়' ('পদাতিক' ১৯৩৯)। আজকের কাজ সেই প্রগতিতে প্রত্যয়ে প্রত্যাবর্তন এবং তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

হিরণকুমার সান্যাল

রামমোহনচরিত

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। মিস কলেটের জন্ম হয় ১৮২২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র মাত্র দশ-এগারো বছরের বালিকা কলেটের মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে তাঁর উত্তর জীবনের প্রধান সম্বল ছিল রামমোহনের জীবনকাহিনী রচনা। এই কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু মিস কলেটের আগ্রহ আর একটি মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে এত গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল যে অসমাপ্ত রামমোহন-কাহিনীকে সম্পূর্ণ করে তিনি প্রকাশ করেন ১৯০০ সালে—নিজের নাম গোপন রেখে। বর্তমান সংস্করণের সম্পাদকদ্বয়ের গবেষণার ফলে জানা গিয়েছে—তাঁর নাম রেভারেণ্ড এফ্. হার্বার্ট স্টেড্।

রেভারেণ্ড স্টেড্ রামমোহন জীবনীর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় এই কথা জানান যে পুরোপুরি মিস কলেটের সংগৃহীত তথ্যাদি অবলম্বন করে তিনি ঐ কাজ শেষ করেন।

১৯১৩ সালে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য হেমচন্দ্র সরকার মিস কলেটের রামমোহন-জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে তথা সারা ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের নবযুগ প্রবর্তনে রামমোহনের ভূমিকার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা আগের চাইতে অনেক বেশি সচেতন হয়েছি এবং এই কারণে আরো বেশি অনুভব করেছি রামমোহনের একটি প্রামাণিক জীবনকাহিনীর অভাব। (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়'—প্রথম প্রকাশ বঙ্গাব্দ ১২৮৮—বইটিরও যথেষ্ট

The Life and Letters of Raja Rammohan Roy: by Sophia Dobson Collet, Third Edition (1862). Edited by Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli. Published by Sadharan Brahmo Samaj. Calcutta.

পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন।) আলোচ্য বইটির সম্পাদকদ্বয় এই অভাব মোচন করেছেন—সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশে।

অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস ইতিপূর্বে ঐতিহাসিক গবেষণায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও বাঙালী পাঠকের কাছে সুপরিচিত 'ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া', 'বাংলার নারী জাগরণ' ও 'রামমোহন প্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থাদির লেখক হিসেবে। শেষোক্ত গ্রন্থে প্রভাতবাবু ঐতিহাসিক গবেষণার নামে রামমোহনের নামে কলঙ্ক লেপনের চেষ্টার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন অত্যন্ত নিপুণ হাতে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাঁর আর একটি পুস্তিকা যাতে তিনি পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একাধিক অতথ্য উক্তি খণ্ডন করেছেন অকাট্য যুক্তি দিয়ে। সুতরাং মিস কলেটের বই-এর সম্পাদনার ভার ব্রাহ্মসমাজ যে যোগ্য হাতে দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সম্পাদকদ্বয় এ যাবৎ রামমোহন সম্বন্ধে যত গবেষণা হয়েছে তা তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করে তার সারসংগ্রহ সংযোজন করেছেন মিস কলেটের বই-এর আটটি পরিচ্ছেদের প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে একটি করে নোট হিসেবে। এই নোট-গুলি আকারে দু-এক স্থানে মূল পরিচ্ছেদের চাইতেও বড়। কিন্তু এই নোটগুলি উল্লেখযোগ্য আকারের জন্য নয়—ঐতিহাসিক উপকরণ বিশ্লেষণ করে রামমোহন সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সন্ধানের ও নানা ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডনের জন্য।

দুঃখের বিষয় রামমোহন সম্বন্ধে সাগ্রহ গবেষকদেরই কেউ কেউ তাঁর সম্বন্ধে নানা অতথ্য ধারণা প্রচারের চেষ্টা করেছেন। এঁদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের নানা দিকে তাঁর গবেষণা আলোকপাত করেছে। এই জন্যে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে পারি না। কিন্তু এই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখা দরকার যে রামমোহন সম্বন্ধে গবেষণা প্রসঙ্গে একাধিকবার তিনি শুধু একদেশদর্শিতার নয় রীতিমত বিকৃত মনের পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

১। ব্রজেন্দ্রবাবু মানতে চাননি যে কিশোর রামমোহন তিব্বতে গিয়েছিলেন। সম্পাদকদ্বয় প্রমাণ করেছেন এই অবিশ্বাস একেবারে অহেতুক।

২। বিলেতযাত্রার সময়ে রামমোহনের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন তাঁর পুত্র

রাজারাম। ব্রজেন্দ্রবাবু প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন প্রমাণ করতে রাজা… মুসলমান। সম্পাদকদ্বয় ব্রজেন্দ্রবাবুর এই অপচেষ্টার সম্যক উত্তর দিয়েছেন।

৩। রামমোহন ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেন পরিণত বয়সে কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইংরেজি বলায় ও লেখায় যে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন তা অনেক ইংরেজকেও বিস্মিত করেছিল। এমনকি তাঁদের একজন বলেছিলেন যে ইংরেজি শব্দনির্বাচনে রামমোহনের দক্ষতা ইংরেজদেরও অনুকরণযোগ্য। (৪০৬ পৃষ্ঠা) কিন্তু ইংল্যাণ্ডে রামমোহনের সেক্রেটারি স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট্ নিছক বাহবা নেবার লোভে রামমোহনের ইংরেজি জ্ঞান সম্বন্ধে অপপ্রচারের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার যথোচিত উত্তর দিয়েছিলেন তৎকালীন একাধিক ইংরেজ—যাঁরা রামমোহনকে ভালো করে জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডক্টর সুশীলকুমার দে ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় আর্নট-এর উক্তির পুনঃপ্রচারের চেষ্টা করেন। সম্পাদকদ্বয় এই বিষয়ে বহুল আলোচনা করে নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে আর্নট-এর উক্তির মূলে ছিল দুষ্ট অভিসন্ধি।

এই সব মূল্যবান নোট ছাড়া বইটির পরিশিষ্ট অংশে আছে বহু মূল্যবান উদ্ধৃতি ও সব শেষে মিস কলেটের একটি জীবনী ও বিভিন্ন ভাষায় রামমোহন প্রণীত গ্রন্থের তালিকা।

এই পরিশিষ্ট অংশগুলির মধ্যে ৭নং অংশে উদ্ধৃত হয়েছে বিখ্যাত সমাজতন্ত্রবাদী রবার্ট ওয়েনের পুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনকে লেখা একটি চিঠি যার সন্ধান ইতিপূর্বে কেউ পায়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে রামমোহনের বেশ একটু তর্কযুদ্ধ হয় ও তাতে মিস কার্পেন্টারের মতে (The Last Days in England of the Raja Rammohon Roy) ওয়েন সম্পূর্ণ পরাজিত হন।

এই সব নানা নোট ও উদ্ধৃতির ফলে মিস কলেটের মূল রচনাটি যে … আকারে আমাদের হাতে পৌছেছে তাতে রামমোহনের একটি সম্পূর্ণ … ঐতিহাসিক চিত্র আমরা পাই। কিন্তু রামমোহন প্রসঙ্গের এই হল সূত্রপাত— শেষ নয়। আশা করি এরপর সম্পাদকদ্বয় হাত দেবেন রামমোহন প্রসঙ্গের পরবর্তী অধ্যায়ে—রামমোহনের ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টায়।

অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী

কণ্ঠরোধে অসম্মতি

সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' দেখে সত্যি চমকে উঠলাম। চিরকাল বলে এসেছি অ্যারিওপ্যাজিটিকা সুতরাং অ্যারিওপ্যাগিটিকা নামটা পড়ে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল। এতদিন তবে ভুলই বলে এসেছি। লজ্জার কথা। পড়া খানিকটা এগোবার পর বুঝলাম লজ্জিত হবার কারণ নেই। অ্যারিওপ্যাজিটিকাই সঠিক উচ্চারণ। কথাটার গ্রীসীয় জন্মরহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করবার জন্যেই সুপণ্ডিত অনুবাদক প্রচলিত উচ্চারণকে রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু জন্মরহস্য ভূমিকাতে উল্লেখ করা যেত। ললাটিকা করা ভালো হয়েছে কি ? অচলিত নামের অবতারণায় কারুরই লাভ হয়নি—না অনুবাদকের, না পাঠক-পাঠিকার।

বইখানা যখন হাতে এল তখনও পশ্চিম বঙ্গ নাটক নিয়ন্ত্রণ বিল সাময়িক ভাবে প্রত্যাহৃত হয়নি। বরং প্রতিবাদের প্রবল ঝড় বইছে। মনে হল ভালোই হল। অ্যারিওপ্যাজিটিকা পড়ার পক্ষে এই তো উপযুক্ত পরিবেশ।

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে সপ্তদশ শতাব্দীর মহাবিপ্লবের পদধ্বনি কয়েক দশক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। চতুর্থ দশকে ১৬৪৪-এর নভেম্বর মাসে মিল্টনের অ্যারিওপ্যাজিটিকা প্রকাশিত হল।

বিপ্লবের পশ্চাদ্‌পট আঁকতে গিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ক্রিস্টফার হিল দেখিয়েছেন বিপ্লব যখন বেশ খানিকটা দূরে তখন থেকেই সাহিত্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আমরা সাহিত্যের কথাই শুধু বলব। ঝড় আসন্ন দেখে জর্জ হার্বার্ট এবং নিকোলাস ফেরার সাহিত্যক্ষেত্র থেকে ফেরার হলেন। মুখ ফুটে কিছু না বলাই নিরাপদ মনে করলেন। বার্টন তাঁর 'অ্যানাটমি অব্ মেলাংকলি' গ্রন্থে সমকালীন সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মেলাংকলি বা বিষাদের বিশ্লেষণ উপস্থিত করলেন। পুরোহিত-তন্ত্রের বিদ্বেষ-

* সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক বাংলায় অনূদিত মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' প্রসঙ্গে।

বিভূষিত মিল্টন তাঁর 'লিসিডাস' কবিতায় এবং 'কোমাস' নাটকে তাঁর মনের দ্বন্দ্বের আভাস দিলেন। এর অনেক পরে ১৬৪১-এ স্পষ্ট করে তাঁর মনের কথা তিনি প্রকাশ করলেন যখন পুরোহিততন্ত্রের অপমানজনক জোয়ালের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে বললেন যে এদের ঘাতকসুলভ মনোভাব এবং চরম মূর্খতার জন্যে কোনও স্বাধীন ও ঐশ্বর্যবান্ মনের বিকাশ সম্ভব নয়। কবি জর্জ উইদার সেন্সরশিপ বা চিন্তা-নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার নিন্দা করে বললেন যে এই ব্যবস্থা সমস্ত লেখককে, এমনকি রাষ্ট্রের সমস্ত অধিবাসীকে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার প্রকাশকে শৃঙ্খলিত করেছে। এই উইদারই জন টেলরকে বলেছিলেন বইএর কাট্তি যদি চান তবে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লিখুন আর জেলে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। যাঁরা সেন্সরশিপের দরুণ দুর্ভোগ ভুগেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন চ্যাপম্যান, ড্রেটন, বেন জনসন, ডান, রলি, ফ্লেচার, ম্যাসিঞ্জার, মিডলটন, বার্টন প্রমুখ প্রখ্যাত লেখকেরা। মহাবিপ্লব যতই এগিয়ে আসতে লাগল সেন্সরশিপও তত কঠোর হতে লাগল। আমাদের এখানে যেমন ব্রিটিশ আমলে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ হয়েছিল আবার এখন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে তেমনি তখনকার ইংল্যাণ্ডেও নাট্য নিয়ন্ত্রণের আয়োজন হয়েছিল। ধর্ম এবং রাষ্ট্র বিপন্ন হতে পারে বলে চিত্তবিনোদন বিভাগের অধিকর্তা পুরনো নাটকের পুনরভিনয়ের ওপরও সেন্সরশিপ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। সব নাটককেই দু-বার লাইসেন্স নিতে হত। একবার অভিনয়ের জন্যে, আরেকবার ছেপে বার হবার জন্যে। আমাদের সাম্প্রতিক নাটক-নিয়ন্ত্রণ বিলেও দু-বার করে লাইসেন্স নেবার নির্দেশ ছিল। একবার অভিনয়-গৃহ বা অভিনয় স্থানের জন্য, আরেকবার অভিনয় আর অভিনীত হবে যে-নাটক তার জন্যে। ইংল্যাণ্ডে ১৬৪১ পর্যন্ত দেশের মধ্যেকার কোনও রকম খবর ছেপে বার করা আইনত দণ্ডনীয় ছিল। ছাপানো খবরের কাগজ একেবারেই ছিল না, ছিল শুধু ঘরোয়া ভাবে প্রচারিত নিউজ-লেটার—আমাদের 'সংবাদ-পত্র' কথাটি যার সঠিক অনুবাদ হতে পারত। কিন্তু এই নিউজ-লেটার বা সংবাদ-লিপি সর্ব-সাধারণের আয়ত্তের বাইরে ছিল—অত দাম দিয়ে অসাধারণরাই শুধু ওগুলো রাখতে পারতেন। বে-আইনী ভাবে কিছু ছাপালে দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। যে-সব বই বিদেশ থেকে আমদানী করা হত, গির্জার বড়ো কর্তারা নির্দোষ বলে ছাড়পত্র না দিলে সেগুলোকে বাজারে ছাড়া যেত না। এই নিয়ম-ভঙ্গের জন্য জন লিবার্ণকে চাবুক মারতে মারতে লণ্ডনের বড়ো বড়ো রাস্তা দিয়ে ঘুরি

আনা হয়েছিল। লাইসেন্স-প্রাপ্ত বইয়ের পুনর্মুদ্রণের সময় আরেকবার লাইসেন্স নিতে হত।

অভিজাততন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেন্সরশিপের ব্যবস্থাও ধসে পড়ে। ১৬৪১-এর পরের বছরগুলো রাজনৈতিক ইতিহাসে অনন্যতা লাভ করেছে কারণ তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের মুখপত্র হিসেবে শস্তা খবরের কাগজ প্রকাশিত হতে লাগল। ১৬৪৫-এ দেখা গেল ৭২২ খানা খবরের কাগজ বার হচ্ছে। যত রকমের বিষয় কল্পনা করা যায় সব রকম বিষয়েই পুস্তিকা প্রকাশের জোয়ার বইল। ত্রিশ বছর ধরে গড়ে দৈনিক তিন খানা করে পুস্তিকা বার হতে লাগল যদিও ১৬৪২ থেকে ১৬৪৯ এ ক-বছর পুস্তিকা-প্রকাশের দৈনিক হার আরও বেড়ে গিয়েছিল। এই আত্মপ্রকাশের প্রবলতাকে জাতির পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ বলে মিল্টন অভিনন্দন জানালেন। ভাবলেন চিন্তা-নিয়ন্ত্রণের পাষাণ-ভার থেকে মুক্তি পেয়ে মানব-মন মননের অবারিত স্রোতে এগিয়ে যাবে দূরে দূরান্তরে স্বাধীন চিন্তার নিত্য নব দিগন্তে। অ্যারিওপ্যাজিটিকার একটি বহুব্যবহৃত উদ্ধৃতি এই ভাবটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করছে: "Methinks I see in my mind a noble and prissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks."

১৬৪৩-এর জুন মাসে পার্লামেন্ট সেন্সরশিপের পুনঃপ্রবর্তন করাতে মিল্টন অত্যন্ত বিচলিত হলেন। তাঁর মনে হল প্রবহমান মুক্ত জীবনস্রোতের গতিপথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করা হল। সেন্সরশিপের যে-হুকুমনামা পার্লামেন্ট জারি করেছিল তাতে ছিল যে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমোদনে এবং বিনা লাইসেন্সে যেন কোনও গ্রন্থ ছাপানো না হয়। একেই বলে প্রি-সেন্সরশিপ অর্থাৎ প্রকাশের পূর্বে নিয়ন্ত্রণ—ভ্রূণ অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণও বলা যেতে পারে। আমাদের পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নাটক-নিয়ন্ত্রণ বিলেও এই প্রি-সেন্সরশিপের ব্যবস্থা ছিল। মিল্টন তাঁর সময়কার ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে এ ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে এবং কোনও লেখা প্রকাশ হওয়ার পর যদি তার মধ্যে দণ্ডনীয় কিছু থাকে তাহলে যথারীতি বিচারের পর আদালত শাস্তির ব্যবস্থা করুক। আমাদের নাটক-নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরুদ্ধে সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিকেরা প্রতিবাদ করবার সময় প্রায় একই কথা বলেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে অভিনয়ের পর দোষ বার হলে তখন নাটক-নাট্যকার-

নাট্যপ্রযোজক ইত্যাদি সকলকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী আদালতে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। প্রকাশের আগে নয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় পেনাল কোড বা দণ্ডবিধি আইনে বিবিধ অপরাধের মধ্যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সেই অনুযায়ী দোষদুষ্ট নাটক পরিবেশনের অপরাধের শাস্তি অনায়াসে হতে পারে। যাক সে অন্য কথা।

সুতরাং মুদ্রণ-যন্ত্রের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ সহ্য করতে না পেরে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাবার জন্যেই অ্যারিওপ্যাজিটিকার জন্ম। একজন অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ঐতিহাসিক অবশ্য বলেছেন যে বইখানির উৎপত্তির মূলে প্রায় বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা গোছের একটা ব্যাপার আছে। মিল্টন তাঁর চেয়ে অর্ধেক বয়স কম এমন একটি কন্যাকে গৃহিণী করেন কিন্তু কন্যাটি এক মাস যেতে না যেতেই রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যান। এই ঘটনা মিল্টনকে বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষে পুস্তিকা প্রকাশে উত্তেজিত করে। বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত এই পুস্তিকাগুলির প্রচার কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করাতে মিল্টন মুদ্রণ-যন্ত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে অ্যারিওপ্যাজিটিকা লেখেন। যে-মিল্টন বরাবর রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে লেখনী চালনা করেছেন এবং লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তাঁকে এভাবে খাটো করবার চেষ্টা করা মানে নিজেই খাটো হওয়া।

পার্লামেন্টের মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণের অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে গিয়ে মিল্টন অ্যারিওপ্যাজিটিকায় বলেছেন যে এই নিয়ন্ত্রণ-প্রথা বা কু-প্রথা প্রথম মধ্যযুগে উদ্ভাবিত হয় রোমান-ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপদের প্রাধান্যের সময়, যখন অন্ধ ধর্মোন্মত্ততা চরমে উঠেছে এবং ইন্‌কুইজিশান নামক ধর্মীয় আদালত বিচারের নাম করে নির্বিচারে ধর্মের তথাকথিত বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে চলেছে বীভৎস নির্মমতার সঙ্গে—বিচার হয়ে উঠেছে নিপুণ মারণ-শিল্প কারণ ঐ আদালত হত্যার নানারকম কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। ধর্মকে রক্ষা করতে হবে তো—সুতরাং "মারি অরি পারি যে কৌশলে"। মধ্যযুগের আঁস্তাকুড়ে জন্মেছে যে ঘৃণ্য কু-প্রথা মিল্টন তাকে বর্জন করবার আহ্বান জানালেন।

বাংলা অনুবাদে নতুন করে অ্যারিওপ্যাজিটিকা পড়বার সময় এসব কথা পড়তে পড়তে স্বভাবতই আজকের দিনের কথা মনের মধ্যে ভিড় করে আসছিল। মনে পড়ছিল যে আজকে স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতাসংগ্রামের অপূর্ব ঐতিহ্যবাহী

বাংলা দেশে যে নাটক-নিয়ন্ত্রণ বিল আমাদের সামনে এসেছিল এবং হয়তো আবার নতুন আকারে অদূর ভবিষ্যতে আসবে তা এমন একটি কু-প্রথার অনুকরণ ও অনুসরণ করছে যার জন্ম আমাদের পরাধীনতার কলঙ্কিত যুগে, বৃটিশ আমলের আঁস্তাকুড়ে।

যে আইনের বিরুদ্ধে মিল্টনের প্রতিবাদ সেই আইনের এক জায়গায় এই কথাগুলো আছে :

The Stationers' Company and the officers of the two Houses are authorised to search for unlicensed Presses, and to break them up ; to search for unlicensed books, etc. ; and confiscate them ; and to "apprehend all authors, printers and others" concerned in publishing unlicensed books and to bring them before the Houses "or the Committee of Examination" for "further punishments", such persons not to be released till they have given satisfaction and also "sufficient caution not to offend in like sort for the future."

"All Justices of the Peace, Captains, constables and other officers" are ordered to give aid in the execution of the above.

আমাদের ১৯৬২-র নাটক-নিয়ন্ত্রণ বিলে ছিল :

The authority for granting licenses under this Act (herein after referred to as the licensing authority) shall be—

(a) in Calcutta, the Commissioner of Police, Calcutta, and

(b) elsewhere, the District Magistrate,

If any person

(a) holds any performance, or causes or permits any performance to be held, or

(b) organises, conducts or takes part in, any performance held, or

(c) being the owner or occupier or having the use of any place, opens, keeps or uses such place, or causes or permits the same to be opened, kept or used, for any performance held,

in contravention of any of the Provisions of this Act or of any rule or order made thereunder, he shall, on conviction, be punishable.......

যাঁরা লাইসেন্স দেবেন তাঁদের সম্বন্ধে মিল্টনের বক্তব্য বিশেষ অনুধাবনযোগ্য :

"এই প্রসঙ্গে অনুজ্ঞা-পত্র দানকারিগণের যে সমস্ত গুণ থাকার প্রয়োজন তাহার কথা একবার বিবেচনা করুন। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, বইগুলি জগতে আলগোছে ভাসিয়া আসুক আর না আসুক, যে লোককে এই সব বইয়ের জীবনমৃত্যুর বিচারক হইয়া বসিতে হইবে তাঁহাকে সাধারণ পর্যায়ের মানুষ হইতে উর্ধ্বে অবস্থিত হইতে হইবে। তাহা না হইলে কোন্‌টা অনুমোদনযোগ্য,—কোন্‌টা নয় এ বিষয়ে দোষগুণ বিচারে প্রকাণ্ড ভুল হইবার সম্ভাবনা।...নিতান্ত অপদার্থ লোক, অথবা যে লোক নিজের সময় সম্বন্ধে একেবারে খোলাখুলি ভাবে অমিতব্যয়ী নয় এমন কোনও লোক যে বর্তমান অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণের স্থলাভিষিক্ত হইতে চাহিবেন তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অবশ্য যদি কেহ নিজেকে একজন বেতনভুক্ মুদ্রণ-পরীক্ষকের পর্যায়ে পাতিত করিতে না চান! এই সব পর্যালোচনা করিয়া ইহার পর আমরা কি জাতীয় অনুজ্ঞাপত্র-দানকারী আশা করিতে পারি সে-বিষয়ে অতি সহজেই ভবিষ্যদ্-দৃষ্টি লাভ করিতে পারি। তাঁহারা হয় হইবেন অজ্ঞ, না হয় স্বেচ্ছাচারী, না হয় শিথিল অমনোযোগী—আর না হয় হইবেন আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত হীনচেতা।" (সাহিত্য অকাদেমীর ডঃ দাশগুপ্ত কৃত অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত)

অনুজ্ঞাপত্রদানকারীদের সম্পর্কে মিল্টনের ধারণার সঙ্গে আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার মিল আছে।

"ক্ষমতা হস্তান্তরের এক বছর পরেই 'শহীদের স্বপ্ন', 'বাপুনে কাহা', 'জাগ্রত-ভারত' ও 'বিষের ধোঁয়া' প্রভৃতি ছবিতে পুলিসি অত্যাচারের দৃশ্য ও 'ভারত ছাড়' শ্লোগান বাদ দিতে বাধ্য করা হয়। বিখ্যাত ছবি 'ভুলি নাই'কে সতর্ক করা হয় এবং '৪২ সাল' ছবিকে...সাজা দেওয়া হয়।...এই ঘটনা আমাদের দেশের প্রযোজকদের বুঝিয়ে দেয় যে, ব্রিটিশের পুরাতন অত্যাচারের কথা অর্থাৎ গত ২০০ বছরের সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের প্রকৃত ইতিহাস বলা চলবে না। এই আমলের শুরুতেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজমোহনের

বউ' যে-ভাবে সেন্সার করা হয় তা উল্লেখযোগ্য। এই ছবিতে জমিদার এক জায়গায় কর্মচারীদের বলেছেন, পুলিশকে ঘুষ দিয়ে এজাহার বদলে দিতে। সেন্সারএ জায়গাটা বাদ দেয়।...'আবর্ত', 'দিগ্‌ভ্রান্ত' ও 'ছিন্নমূল' প্রভৃতি ছবিও সেন্সারের পাল্লায় পড়ে। তার মধ্যে 'দিগ্‌ভ্রান্ত'তে বলা হয়েছিল দেশের সংবাদপত্র ধনী লোকদের হাতে এবং তারা অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনা ছাপে না...শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে'তে "তোর মুখে ঝাড়ু" মারবো' সংলাপ এবং 'বিন্দুর ছেলে'তে মা সন্তানকে চুমো খাচ্ছে—সেন্সার বাদ দেয়। অথচ বিলাতী ও বোম্বাই-মার্কা অশ্লীল ছবি সম্পর্কে সেন্সর কিছু বলে না। এই সব কারণে ১৯৫০ সালে ফিল্ম তদন্ত কমিটির সামনে বাংলা ছবির খ্যাতনামা ডিস্ট্রিবিউটার শ্রী কে. এল. চ্যাটার্জি বলেন : "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখাতে পারি না সরকারী সেন্সারের ভয়ে—ইতিহাস দেখাতে পারি না হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ভয়ে।" (দর্পণ শুক্রবার, ২৮ জুন ১৯৬৩—"আনন্দবাজারের বিভ্রান্তি চেষ্টার অপচেষ্টা" লেখক : সুধী প্রধান)।

সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত অ্যারিওপ্যাজিটিকার অনুবাদের মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে সি. ভি. ওয়েজউড আলোচ্য গ্রন্থটির কালাতীত সর্বজনীনতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে বিপ্লবী মিরাবো এই মহৎ গ্রন্থখানি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করেছিলেন। ওয়েজউড আরও বলেছেন যে মিল্টন যে-যুদ্ধের কথা জানতেন তার চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক যুদ্ধের সময় ১৯৪৪-এর লণ্ডনে বসে যথোপযুক্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে অ্যারিওপ্যাজিটিকার তৃতীয় শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই শতবার্ষিক শ্রদ্ধা নিবেদনে যোগ দিয়েছিলেন দেশ-বিদেশের মনীষীরা এবং তাঁরা মিল্টনকে স্বাধীন মনের উৎসাহী সমর্থক বলে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন।

পড়তে পড়তে ভাবছিলাম মিল্টনের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ইংরেজরা এদেশে কোন্ ঐতিহ্য বহন করে এনেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ জাতির জাতীয় ঐতিহ্য ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করলে বোধ করি এই শাসক-শ্রেণীর ওপর অবিচার করা হয়। ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকার তাঁদের সমালোচনা শুনলে বরাবর অধৈর্য হয়ে উঠতেন এবং জনমতের বাহন ও পরিবেশকদের নিষ্ঠুর আক্রমণে বিপর্যস্ত করতেন। এদেশের প্রেস আইনের ইতিহাস তার অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ বুকে করে রয়েছে। মহাকবি মিল্টনের

অ্যারিওপ্যাজিটিকা ব্রিটিশ আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে প্রচলিত থেকেও শাসকশ্রেণীর মেজাজের কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি, যেমন পারে নি আরেক মহাকবির সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ সম্পর্কে সুতীব্র ধিক্কার ধ্বনি। সিডিশান বা রাজদ্রোহ বিল পাশ হবার ঠিক আগের দিন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ টাউন হলের প্রতিবাদ সভায় মনের আগুনে ভরা যে-প্রবন্ধ পড়েছিলেন তাতে বলেছিলেন : "…দেখিলাম গবর্মেণ্ট অত্যন্ত সচকিত ভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না—আমরা অত্যন্ত ভয়ংকর!" তিনি আরও বলেছিলেন : "অন্তর্দাহ বাক্যে প্রকাশ করা না হইলে অন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থায় রাজাপ্রজার সম্বন্ধ যে কিরূপ বিকৃত হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইতেছি।"

সমস্যা হচ্ছে মিল্টনের মহান্ আদর্শ যেমন ইংরেজ শাসকদের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি তেমনি রবীন্দ্রনাথের মহান্ আদর্শও ইংরেজ-মুক্ত ভারতবর্ষে সম্মানিত হচ্ছে না। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর প্রতি বছর নভেম্বর মাসে আমরা অ্যারিওপ্যাজিটিকার জন্মদিবস পালন করতে পারতাম আর সকলের সামনে তুলে ধরতে পারতাম স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বজার মতো মিল্টনের অ্যারিওপ্যাজিটিকার এই বাণী : "Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely, according to conscience above all liberties." To know, to utter, and to argue freely—জানবার, প্রকাশ করবার এবং অবাধে তর্ক করবার অধিকার ঘোষণা করেছিলেন মিল্টন ভিক্ষার ভঙ্গীতে হাত পেতে নয়, উদ্ধতভাবে উত্তোলিত মুষ্টিবদ্ধ হাতে। সেই জন্যে তিনি স্মরণীয়।

কেউ কেউ দুঃখ করে বলেছেন মিল্টনের একমাত্র বহুল-প্রচারিত গদ্য রচনা যে অ্যারিওপ্যাজিটিকা তার বিষয়বস্তু হচ্ছে কি না আধুনিককালে সর্বত্র স্বীকৃত পরমতসহিষ্ণুতার নীতি। কিন্তু "সর্বত্র স্বীকৃত" কথাটা অত চট করে বলে ফেলা কি ঠিক হল? অপর একজন সমালোচক প্রত্যুত্তরে বলেছেন যে আমরা আজকাল কারুর সঙ্গে মতবাদের ব্যাপারে বিরোধ হলে তাকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করি না বা আগুনে পুড়িয়ে মারি না বটে—কিন্তু

এই সহিষ্ণুতাটুকুই যথেষ্ট নয়। প্রত্যুত্তরের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি সেটুকু সহিষ্ণুতাই কি সর্ব দেশে সর্বক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে? ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবার নানা কৌশল কি আমরা জানি না? চিতার আগুনে জ্যান্ত নাই বা পোড়ালাম, কিন্তু ধিকি ধিকি তুষের আগুনে পুড়বে অথচ চট করে মরবে না এরকম ব্যবস্থা কি আমরা জানি না? সুতরাং জনমত প্রকাশের স্বাধীনতার সংগ্রামে অ্যারিওপ্যাজিটিকায় বিধৃত মিল্টনের প্রগতিশীল মতবাদ আজও আমাদের প্রবল সহায়ক। সেই জন্যে অ্যারিওপ্যাজিটিকার বাংলা অনুবাদকে আমরা অভিনন্দন জানাই এবং তার বহুল প্রচার কামনা করি।

মিল্টনের প্রগতিশীল মতবাদের কথা বিস্তারিতভাবে বলবার ক্ষেত্র এটা নয়। একখানি বইকে পূর্ণ মূল্যায়নের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করাও মূঢ়তা। তবে একথা নিশ্চিত যে মিল্টনের উদারপন্থী মত ও আদর্শ, "সবকিছুই প্রমাণ করবার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য" তাঁর এই দাবি এবং মানবসমাজের অগ্রগমনের শক্তির ওপর তাঁর অবিচল আস্থা আজকের দিনের পথ-চলায় আমাদের অমূল্য পাথেয়। ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত মিল্টনও ছিলেন না, আমাদের রবীন্দ্রনাথও ছিলেন না। কিন্তু "একলা চল রে" সবসময় আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদের জপমন্ত্র নয়, বিশেষ পরিবেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসক সম্প্রদায়ের সকলকে ছাঁচে ঢালার অপচেষ্টার প্রতিরোধের বৈপ্লবিক আহ্বানও বটে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আর মুদ্রণ-যন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ সমাজের হয়েই বিদ্রোহ। তাই ক্ষুব্ধ মিল্টনের আক্ষেপ : "the iron yoke of outward conformity hath yet left a slavish print upon our necks" আজও বহু দেশে বহু মানুষের মর্মান্তিক আর্তনাদ।

সাহিত্য অকাদেমীর অ্যারিওপ্যাজিটিকার অনুবাদক ও সম্পাদক হচ্ছেন প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ইতিপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থের সি. ভি. ওয়েজউড লিখিত মুখবন্ধটির উল্লেখ করেছি। ওয়েজউডের মুখবন্ধের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তা মিল্টনের গ্রন্থখানির সর্বজনীনতার দিকটা তুলে ধরেছে এবং মিল্টনকে আমাদের আজকের দিনের দ্বন্দ্ব-মুখর জীবনের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে যুক্ত করেছে। এই মুখবন্ধের পরেই হচ্ছে ডক্টর দাশগুপ্তের অতি মূল্যবান্ ভূমিকা। সুবিস্তীর্ণ এই পটভূমিকায় ডক্টর দাশগুপ্ত পাঠক-পাঠিকাকে সাহায্য করবার জন্যে প্রচুর প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তথ্য সংগ্রহে তাঁর পাণ্ডিত্য সুপ্রমাণিত।

পরিবেশনের সরস প্রাঞ্জলতা তাঁর সংসাহিত্যের দুর্গে সাধারণ-পাঠকের প্রবেশকে সুগম করবার আন্তরিক আগ্রহের পরিচায়ক। অ্যারিওপ্যাজিটিকা নামের উৎপত্তি, ইংল্যাণ্ডে মুদ্রণালয়-নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, গ্রন্থখানির সার সংকলন এবং মিল্টনের রচনাশৈলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ভূমিকাটিকে প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার প্রিয় করে তুলবে। আমাদের মাতৃভাষায় কোনও গ্রন্থে এরকম উচ্চমানের ভূমিকা বিরল। ওয়েজউড যেমন মিল্টনের অ্যারিওপ্যাজিটিকাকে আমাদের আজকের দিনের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন ডক্টর দাশগুপ্ত অবশ্য তা করেন নি কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মুদ্রণালয়-নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে তাঁর দুয়েকটা উক্তি যেন আজকের দিনের জগৎ ও জীবনের ওপর তির্যকভাবে আলোকপাত করছে বলে ভাবতে ভালো লাগে। যেমন: "...পুরোহিত-তন্ত্রের পক্ষ হইতে প্রেসের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বিন্দুমাত্র চেষ্টা হইলে প্রেসবিটারগণ এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টগণ সমভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ইহার প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু পুরোহিত-তন্ত্রকে পরাভূত করিয়া নাকচ করিয়া দিতে পারিবার পরে প্রেসবিটারগণ যখন শাসনক্ষমতা হাতে পাইলেন তখন তাঁহারা আবার বিরুদ্ধবাদিগণের সমালোচনায় এবং আক্রমণে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিলেন এবং মুদ্রাযন্ত্র-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীতা বোধ করিতে লাগিলেন।" আবার: "আপাতদৃষ্টিতে মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসঙ্গে লেখক-নিয়ন্ত্রণের যে সরকারী অভিসন্ধি তাহা রোধ করাই হইল মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাজিটিকা' গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য।" খবরের কাগজের সব খবর সব সময় লক্ষ্য করতে পারি না কিন্তু আমার বিশ্বাস ডক্টর দাশগুপ্ত নাটক-নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। ধৃষ্টতা যদি মার্জনীয় হয় তবে আরেকটা বিশ্বাসও এখানে উত্থাপন করি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে ডক্টর দাশগুপ্ত কলাকৈবল্যবাদীদের মতবাদে বিশ্বাসী নন তবে সোজাসুজি সেই মতবাদটাকে খণ্ডন করতে একটু দ্বিধা বোধ করেন, বোধ হয় তাঁর অনন্যসুলভ অমায়িকতায় বাধে—এই অমায়িকতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে বলেই একথা বলছি। উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটা স্পষ্টতর করা দরকার। ভূমিকায় যেখানে ডক্টর দাশগুপ্ত মিল্টনের কবি-জীবনের ইতিহাস দিয়েছেন সেখানে দেখিয়েছেন যে কবি সুদীর্ঘ উনিশ বছরের জন্যে "বহির্জীবনের উত্তেজনাময় এবং আবিলতাময় আন্দোলন সমূহের" সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। এ বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন: "ইহা স্বাভাবিকভাবে আমাদের কাছে অভিপ্রেত বলিয়া মনে

হয় না। মিল্টনের অনুরাগী সমঝদারগণ তাই অধিকাংশেই এই মত প্রকাশ করিবেন যে মিল্টন তৎকালীন সর্বপ্রকার আন্দোলন মতবিরোধ এবং দলাদলির মধ্যে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়া ভাল করেন নাই..." পরমুহূর্তেই তিনি বলেছেন: "...মিল্টনের জীবন-দেবতা তাঁহাকে অন্য পথে পরিচালিত করিয়াছেন। একেবারে বিপথে ঠেলিয়া দিয়াছেন কি-না সে-কথা আজ নিশ্চিত করিয়া কে বলিবে?" একটু পরেই কিন্তু দ্বিধার ভাব কাটিয়ে উঠে ডক্টর দাশগুপ্ত জীবন-দেবতার চেয়ে জীবনের আহ্বানকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে আশ্চর্য সুন্দর ভাষায় বলেছেন: "মিল্টন এই জীবন-সংগ্রামের ধূলিক্লিন্ন দিকটিকে সযত্নে পরিহারপূর্বক নিজেকে যদি বৃহত্তর সমাজ-জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেন, শুধু মননহীন কর্মহীন প্রথাবদ্ধ বাণী-আরাধনাতেই নিজেকে একনিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিতেন তবে হয়তো অলস-কল্পনার বিলাস-ব্যসনে রচিত কতকগুলি স্বাদগন্ধহীন ছন্দমিলযুক্ত জিনিস পাইতে পারিতাম·· মানুষের জীবনে তাহা কোনও সত্য মূল্য লাভ করিত না। ...যে কাব্য...তীব্র ঘনীভূত চেতনাকে মুক্তি দেয় নিখিল শূন্যের সীমাহীন প্রসারে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কাল-পরিধিতে, সে-জাতীয় কাব্য রচনার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তাহার জন্য মিল্টনের জীবন-দেবতা হয়ত এই দীর্ঘ উনিশ বৎসরের রূঢ় জীবন-চর্চাকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।" দ্বিধা কাটিয়ে উঠে পণ্ডিতেরা যদি জীবনধর্মী সাহিত্যের পক্ষে এভাবে পৌরুষময় প্রত্যয়পূর্ণ ঘোষণায় মুখর হয়ে ওঠেন তবে নপুংস সাহিত্যিকদের কোমল কলকাকলির মধ্যেও আমরা কিছুটা ভরসা পাই।

ভূমিকা থেকে অনুবাদে পৌঁছতে অনেক দেরী হয়ে গেল। অনুবাদ থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি সম্ভব নয়। অতি সুপরিচিত কয়েকটি উদ্ধৃতি অবশ্য দেব। নইলে বিচার কি করে হবে? মূল ও অনুবাদ পর পর দিয়ে যাচ্ছি।

ভালো বই সম্বন্ধে মিল্টন বলছেন:

"...as good almost kill a man as kill a good book. Who kills a man kills a reasonable creature, God's image; but he who destroys a good book, kills reason itself, kills the image of God, as it were in the eye. Many a man lives a burden to the earth; but a good book is the precious life-blood of a

master spirit, embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life." অনুবাদ :

"একখানি ভাল বই নষ্ট করা প্রায় একটি ভাল মানুষকে মারিয়া ফেলি সামিল, যে ব্যক্তি একটি মানুষকে মারিয়া ফেলে সে একটি বুদ্ধিজীবী প্রাণী মারিয়া ফেলে—ভগবানের প্রতিমূর্তিকে মারিয়া ফেলে; কিন্তু যে ব্যক্তি একখা ভাল বইকে নষ্ট করিয়া ফেলে সে বুদ্ধিকেই ধ্বংস করিয়া ফেলে—সে যে ভগবদ্-বিগ্রহকে চোখে আঘাত করিয়াই বিনষ্ট করে। অনেক মানু পৃথিবীতে একটা ভারস্বরূপ হইয়া বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু একখানি ভাল ব হইল একটি মহান্ আত্মার প্রাণ-শোণিত-স্বরূপ—ইহাকে মুদ্রাঙ্কিত করি বহুমূল্য রত্নের ন্যায় সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে এই জীবনের পরে অপ একটি জীবনের উদ্দেশ্যে।"

সম্ভবত embalmed-এর অনুবাদ "মুদ্রাঙ্কিত"—অনুবাদকের গুরু অমনোযোগিতার প্রমাণ। বাদবাকী সবটুকু অনুবাদ হিসেবে মন্দ নয়।

গুণীর গুণাবলীর প্রয়োগ সম্পর্কে মিল্টন বলছেন :

"I cannot praise a fugitive and cloistered virtue, unexercise and unbreathed, that never sallies out and sees her adversar but slinks out of the race, where that immortal garland is t be run for not without dust and heat."

অনুবাদ : "যে গুণের কোনও অনুশীলন নাই, জীবনের স্পর্শে যা প্রাণবন্ত নয়, এমন পলায়নপর মঠপ্রাচীর-বেষ্টিত গুণসমূহের আমি প্রশ করিতে পারি না। যে গুণ স্বতঃ-উৎসারণের দ্বারা বাহিরে ছড়াইয়া পড়ি তাহার প্রতিপক্ষের অনুসন্ধান করে না, পরন্তু জীবনের ক্ষেত্রে যেখানে অম মাল্য লাভের জন্য ধূলি-ক্লিষ্ট তাপ-দগ্ধ ধাবন-প্রতিযোগিতা সেখানে যে গু চোরের মত লঘুপদে পিছাইয়া চলে, আমি সেই গুণের প্রশংসা কিছুতে করিতে পারি না।"

Cloistered virtue-র অনুবাদ "মঠপ্রাচীর বেষ্টিত গুণ"। এটা অনু হিসেবে বেশ দুর্বল। Unexercised, unbreathed, sallies out এবং se her adversary-র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুবাদে ফুটে ওঠে নি। slinks ou of the race-এর ভাবান্তরও যথাযথ হয় নি। লেখক হয়তো লক্ষ্য করেন যে বাক্যটিতে অশ্বারোহণ-সংক্রান্ত metaphor অধিকাংশ কথার অর্থকে বৈশি

দান করেছে। অনুবাদ গ্রন্থটি পড়তে গিয়ে আমার অনেকবার মনে হয়েছে যে লেখক ভূমিকায় যতখানি মন দিতে পেরেছিলেন যে কোনও কারণেই হোক অনুবাদের বেলা ততখানি মনঃসংযোগ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

ইংরেজ জাতির নবজাগরণের লক্ষণ দেখে কবির আনন্দ তাঁর ভাষাকে নিয়ে গেছে মহাকাব্যের উচ্চগ্রামে। তিনি বলছেন :

"Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep, and shaking her invincible locks. Methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth, and kindling her undazzled eyes at the full midday beam; purging and unscaling her long-abused sight at the fountain itself of heavenly radiance; while the whole noise of timorous and flocking birds, with those also that love the twilight, flutter about, amazed at what she means, and in their envious gabble would prognosticate a year of sects and schisms."

অনুবাদ : "আমার মনে হইতেছে, আমি আমার মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেছি, একটি মহান্ প্রবলপরাক্রান্ত জাতি নিদ্রাভঙ্গের পরে একটি বলিষ্ঠ লোকের ন্যায় তাহার অধৃষ্য কেশগুচ্ছ কম্পিত করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। মনে হয় এই জাতিকে আমি একটি ঈগল পাখীর সদৃশ দেখিতে পাইতেছি। সেই ঈগল পাখীটি তাহার পুরাতন পালক ঝাড়িয়া ফেলিয়া প্রবল যৌবনে বিবর্ধিত হইতেছে; তাহার যে চক্ষু দুইটিকে কোনও আলোকই ধাঁধাইয়া দিতে পারে নাই সেই চক্ষু দুইটিকে পরিপূর্ণ মধ্যাহ্ন তেজের দিকে আরও প্রখরভাবে স্থাপন করিতেছে। এই ঈগলের দৃষ্টিশক্তি বহুদিন পর্যন্ত অপব্যবহার-দুষ্ট, দিব্যজ্যোতিতে সে আজ সেই দৃষ্টিকে পরিষ্কৃত এবং আঁশবিমুক্ত করিয়া তুলিতেছে। আর অন্যদিকে দলবদ্ধ ভীরু পাখীগুলির এবং গোধূলির আবছায়াপ্রিয় পাখীগুলির কলরব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঈগল যে কি করিতে চাহে তাহা ভাবিয়া এই পাখীগুলি বিস্মিত! তাহাদের ঈর্ষান্বিত বকবকানিতে তাহারা ভবিষ্যৎ বৎসরটির জন্য কেবল দল ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছে।"

"প্রখরভাবে স্থাপন করিতেছে" আর "আঁশবিমুক্ত" এই কথাদুটিকে বাদ

দিলে উপরের উদ্‌ধৃতিটি স্থন্দর অনুবাদের একটি উদাহরণ, অনুবাদকের ভাষান্তরণ-প্রতিভার পরিচায়ক। মূল ইংরেজী পড়বার সময় ভাবছিলাম invincible locks-এর কি প্রতিশব্দ দেন অনুবাদক দেখা যাক। "অধৃষ্য কেশগুচ্ছ" পড়ে মুগ্ধ হলাম। "অধৃষ্য" বিশেষণটির জন্য অনুবাদক অভিনন্দনযোগ্য। এই হল ঠিক ঠিক inspired অনুবাদ। এই জায়গাটা পড়তে পড়তে অনুবাদকের সব ত্রুটি ভুলে যেতে ইচ্ছে করে। একটু বাদেই পড়ি সর্বযুগের সর্বদেশের সর্বমানবের হয়ে মিল্টনের স্বাধীন চিন্তার অবারিত প্রকাশের অলঙ্ঘ্য দাবি : "Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely according to conscience, above all liberties." অনুবাদে পড়ি : "আমাকে জানিবার স্বাধীনতা দিন, আমাকে বলিবার স্বাধীনতা দিন —আমাকে বিবেক অনুসারে—সর্বোপরি স্বাধীনতার নীতি-অনুসারে—যুক্তি প্রদর্শনের স্থযোগ দিন।" Above all liberties-এর এই অনুবাদ একেবারেই সমর্থন করা যায় না। অথচ ওয়েজউড লিখিত মুখবন্ধে একই উদ্‌ধৃতির নির্ভুল অনুবাদ অনুবাদক নিজেই উপস্থিত করেছেন। (পৃঃ ৯)

আমি শ্রদ্ধেয় অনুবাদককে অনুরোধ করি তিনি অবিলম্বে নতুন সংস্করণের জন্য অনুবাদ-সংস্কারের কাজে হাত দিন। Unesco-প্রচারিত বাংলা বই সম্পর্কে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তাঁর অবিসম্বাদিত। নিশ্চয়ই ব্যস্ততাজনিত দ্রুততা অনুবাদের দুর্বলতার জন্যে দায়ী। মিণ্টনের ল্যাটিন-প্রভাবিত জটিল বাক্যগঠনরীতির জট ছাড়িয়ে অনুবাদের কাজ অত্যন্ত কঠিন। তবু এ কাজে অনুবাদক যথেষ্ট নিপুণতা দেখিয়েছেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণে আমরা আশা করব তিনি উন্নততর অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাকর-প্রমাদগুলো (যেমন 'স্বাগত সম্ভাষণ', 'পুড়িয়া ফেলান', 'ভাক্তামি', 'মাপজোক' ইত্যাদি) দূর করবেন। ইংরেজী উচ্চারণের বাংলা প্রতিলিপিগুলোও সব জায়গায় ঠিক হয় নি। সেগুলো পরিবর্তিত হওয়া খুবই দরকার।

যারা কণ্ঠরোধে আগ্রহী, গ্রন্থমেধযজ্ঞে উৎসাহী তাদের প্রতি মিল্টনের সর্বকালের ভর্ৎসনা-বাণী এই আলোচনার উপসংহার হোক :

"একখানি ভাল বই নষ্ট করা প্রায় একটি ভাল মানুষকে মারিয়া ফেলিবারই সামিল।"

পরিচয়

দ্বিতীয় সমালোচনা সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৭০

ভাদ্র সংখ্যা পরিচয় দ্বিতীয় সমালোচনা সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে। অনেক মূল্যবান গ্রন্থের সমালোচনা বিলম্বে পাওয়ায় এবং প্রস্তাবিত পৃষ্ঠা সংখ্যার মধ্যে তার স্থান সঙ্কুলান করতে অসমর্থ হওয়ায় বাধ্য হয়ে আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হল। অন্যথায় আরও মূল্য বৃদ্ধি অনিবার্য ছিল। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে, পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করে আরও মূল্যবৃদ্ধি করা অপেক্ষা দ্বিতীয় আর একটি সমালোচনা সংখ্যা প্রকাশ করাই আমরা শ্রেয় বিবেচনা করলাম। আশা করি পাঠকেরা এবং লেখকবৃন্দ আমাদের এ-সিদ্ধান্ত অনুমোদন করবেন।

এই সংখ্যাটিও মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ হবে। বিস্তারিত রচনা-সূচী অন্যত্র প্রকাশিত হল। আমরা আশা করি পাঠকরা এই সংখ্যাটিও পূর্বাহ্নে সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন।

এই সংখ্যার মূল্যবৃদ্ধি করা হবে না।

দাম : এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা



ভাদ্র • ১৩৭০

বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা—২